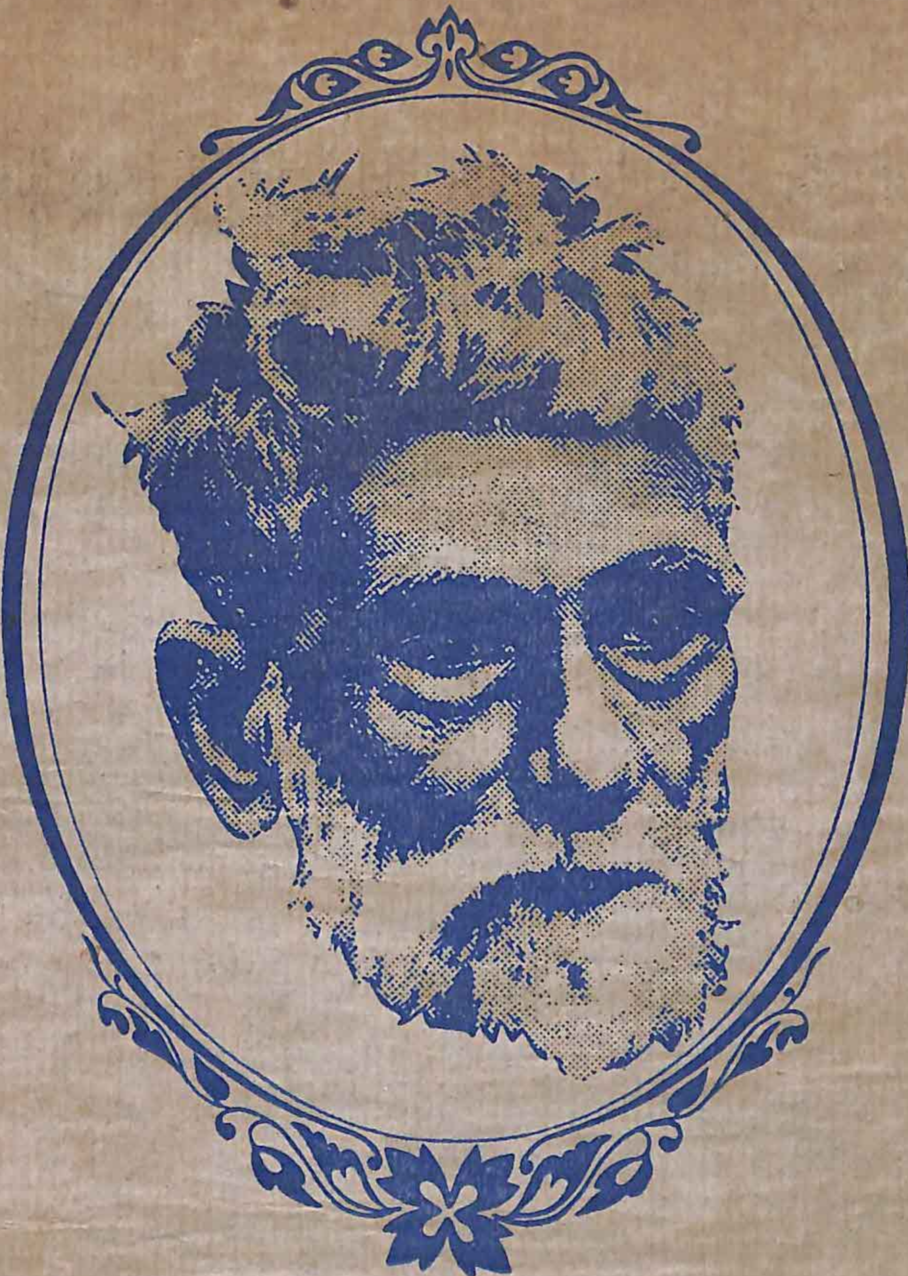


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

১২৫তম জন্ম-জয়ন্তী স্মারক-গ্রন্থ ঃ ১৯৮৬

সম্পাদনায়ঃ 'কপোতাক্ষ' সম্পাদকমণ্ডলী



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

১২৫তম স্মারক-গ্রন্থ

১৯৮৬

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

১২৫তম জন্ম-জয়ন্তী

স্মারক-গ্রন্থ

॥ ১৯৮৬ ॥

সম্পাদনায় 'কপোতাক্ষ' সম্পাদকমণ্ডলী

আর.কে.বি.কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী

পি-২২ সি.আই.টি. রোড ঃ স্কীম ৭/এম
কলিকাতা ৭০০০৫৪

পরিবেশক ঃ **নয়া প্রকাশ** ঃ ২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-ছয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আর.কে.বি.কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক খ্যাতনামা প্রকাশক শ্রীবারীন্দ্র মিত্র এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছেন। সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ কপোতাক্ষ

কপোতাক্ষ সম্পাদকমণ্ডলী

প্রধান সম্পাদক ঃ শ্রীরমেশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ সর্বশ্রী কুমার মিত্র, নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সুখেন্দু রায়চৌধুরী, জ্যোতিষ মণ্ডল,
নিমাই ঘোষ, সন্তোষকুমার বসু, কমল দে

প্রথম প্রকাশ

২রা আগষ্ট, ১৯৮৬

প্রকাশনায়

আর.কে.বি.কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনীর মুখপত্র **কপোতাক্ষ**-এর সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে শ্রীকুমার মিত্র, নিউ রায়পুর, কলিকাতা ৭০০০৮৪, কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে

নয়া প্রকাশ (মুদ্রণ বিভাগ)
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ঃ ছয়

শুভেচ্ছা

পনের টাকা

মুখবন্ধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ভারতের বিজ্ঞান-গবেষণা ও স্বদেশীশিল্প গড়ার পথপ্রদর্শক, মহান শিক্ষক এবং আর্তের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। সর্বোপরি তিনি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক, ভারতের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত। কুসংস্কার, আর শ্রমবিমুখ-তার বিরুদ্ধে, তিনি আজীবন আপোষহীন সংগ্রামী। তাঁর জীবন, কর্ম আর বাণী একই সূত্রে গ্রথিত। তিনি শুধু বাঙালীর নন, সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব।

দুঃখের বিষয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আজ প্রায় বিস্মৃত একটি নাম। তাই বাঙালীর অন্নসমস্যা সমাধানে এবং দেশের সার্বিক অগ্রগতির অন্যতম পথিকৃৎ এই সর্বত্যাগী ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষের প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমরা সীমিত প্রচেষ্টায় এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি।

১৯৮৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ১২৫তম জন্মবর্ষ। তাঁর মত কর্মযোগী মনীষীর সামগ্রিক পরিচিতি উপস্থাপনা দেশবাসীর কাছে একটি মহৎ জাতীয় কর্তব্য। স্বাধীন ভারতে শিল্পোন্নয়ন এবং জাতিগঠনের কাজে তাঁর ভূমিকা অপরিমেয়।

আমরা তাঁর জন্মভূমির মানুষ। তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা, তাঁর আদর্শ প্রচার করা, দুঃস্থদের সাধ্যমত সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি। কৃষ্ণনগরের ভারতখ্যাত ভাস্কর শ্রীকার্তিকচন্দ্র পালের নির্মিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবক্ষ মর্মরমূর্তি সম্মিলনীর সভ্যদের অর্থে আমরা সংগ্রহ করেছি। বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়মকে এই মূর্তি উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাছাড়া বিড়লা মিউজিয়ম, ইনস্যাক এবং আমাদের সম্মিলনী যুক্তভাবে আচার্যদেবের জীবনী ও বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। ২রা আগষ্ট বিড়লা মিউজিয়মে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন। আচার্যদেবের ১২৫তম জন্মপূর্ত্তি উৎসবও পালিত হবে। আশা করি এই উৎসবের সামগ্রিক আয়োজন দেশবাসীকে আচার্যদেব সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করবে। এই ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণে বিড়লা মিউজিয়মের ডিরেক্টর শ্রীসমর বাগচী এবং শ্রীমানবেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ সহকারী-দের ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের এই স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ এই উৎসবেরই অন্যতম অঙ্গ। এ কাজে শ্রীবারীন্দ্র মিত্রের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে বর্তমানে এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না। সময়ের অভাবে এই গ্রন্থ সম্পাদনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের ত্রুটি মার্জনা করবেন। যাঁরা তাঁদের লেখা ও নানাবিধ মূল্যবান উপদেশ দিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমরা সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নানা সমস্যা জর্জরিত সমাজে পাঠকদের তথা দেশ-বাসীকে এই গ্রন্থ সঠিক পথ-নির্দেশে সহায়ক হ'লে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করব।

২রা আগষ্ট ১৯৮৬ সম্পাদকমণ্ডলী

কপোতাক্ষ

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

আচার্যদেবের সত্তরতম জন্মবৎসরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা

ওঁ

"Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

সত্তর বছর বয়সের

জয়ন্তী উপলক্ষ্যে

কবির এই অভিনন্দন।

আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্ম্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, —কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচার শক্তি, বোধ শক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চারিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বল্‌লেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ-ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি। আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

২২ আগষ্ট

১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

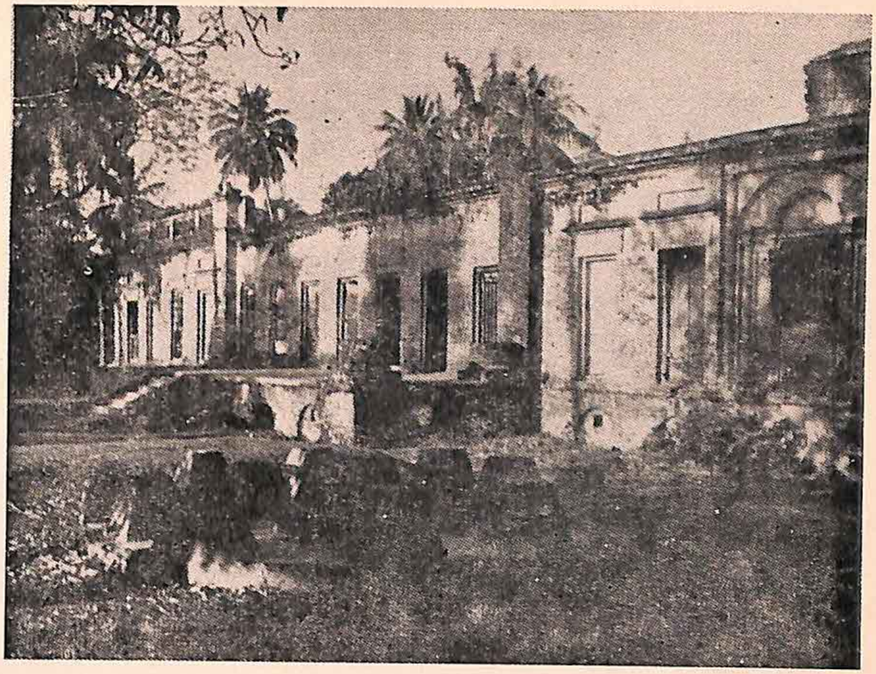
।। জন্মভূমি রাড়ুলীতে প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বর্ধনা ও তাঁর অভিভাষণ ।।

সন ১৩৫০। জ্যৈষ্ঠমাস। প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বর্ধনার জন্য তাঁর গ্রামে আন্তরিক আয়োজন চলছে। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে এসেছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বিজ্ঞানী। ডঃ মেঘনাদ সাহা সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁর একটি কথা এখনও মনের মণিকোঠায় আবেগের দোলা দেয়,—'খাঁটি মানুষ গড়িয়া তোলাই আচার্যদেবের একমাত্র কাম্য ছিল'। এই সম্বর্ধনা সভায় তাঁর অভিভাষণটি হয়েছিল বড় মর্মস্পর্শী ও জীবনান্তক করুণ ইঙ্গিতবহ। অভিভাষণটি উদ্ধৃত করি,—

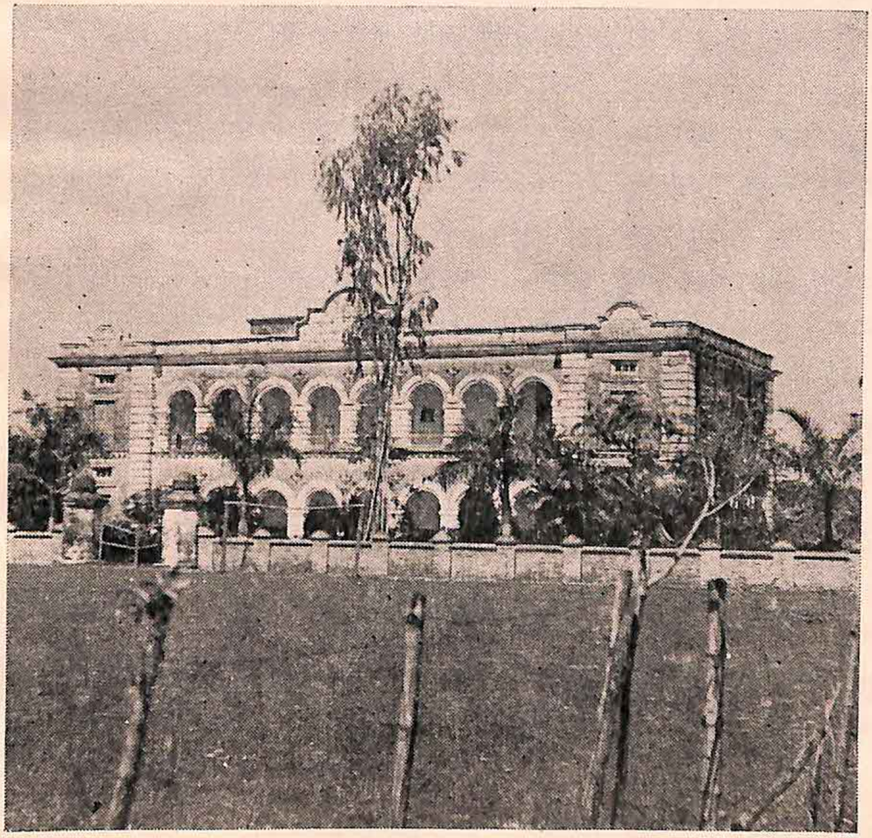
'আজ জীবনসন্ধ্যার উপকূলে এসে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছা হ'ল, সেই কোন্ সুদূরে ফেলে-আসা শৈশবের সোনার দিনগুলির কথা, আজ আমার একান্ত নিভৃত নির্জন চিন্তার মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে আমাকে চকিত আহ্বানে জানিয়ে দিয়ে যায়, —ঐ দূর নীলিমার অস্ফুট বারতা।

আজ আমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেছি, পৃথিবীর বন্ধন ও মমতা, হাসি ও গান, —সব কিছু আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমার সুদীর্ঘ জীবনে এইটুকু বুঝেছি যে —আমি এই ধরণীকে ভালোবেসেছি, ভালোবেসেছি আমার দেশকে ও জাতিকে, ভালোবেসেছি আমার প্রিয় জন্মভূমিকে। তোমরা হয়তো জানো না, কিসের মায়া আমাকে এই বঙ্গের নিম্নভূমির জল-জঙ্গলে টেনে এনেছে। ঘাটে ঘাটে তরী বেঁধে বর্ষা বসন্তের দিনমান কাটিয়েছি তোমাদের সুখ-দুঃখের সহিত, আমি সুদীর্ঘ দিন জড়িত আছি, —তোমাদের ব্যথা ও বেদনা আমার বিগত কর্মবহুল জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অশান্তি এনেছে, —তোমাদের উৎসব ও আনন্দ আমাকে আশান্বিত করেছে। জানি, এই বন্ধন একদিন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সেদিন আর বেশী সুদূরে নয়।' (প্রবাসী ১৩৫০)

সর্বত্যাগী বিজ্ঞান-তাপসের মধ্যে নিম্নবঙ্গের 'জল-জঙ্গল' নদী মাটি আর মানুষগুলোর জন্য যে কত মায়া-মমতা নিথর হয়েছিল তাঁর জীবনের শেষ-প্রান্তের এই অভিভাষণটির মধ্যে তা মূর্ত হয়ে আছে। আমাদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত যে মানুষটি জড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে স্মরণ করে আজকের এই কলুষ-ক্লিন্ন দিনে আমাদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হোক!



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাটীর বহির্ভাগ



পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে আচার্যদেব
প্রতিষ্ঠিত আর. কে. বি. কে.
হরিশচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশন
(আর. কে. বি. কে.=
রাড়ুলি-কাটিপাড়া-বাঁকা-খেশরা)

স্যার পি. সি. রায়ঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

স্যার পি. সি. রায়—কর্মক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন ও উদ্ভাবনা—তাঁর এই বিবিধ ক্ষমতার জন্যে বৃহত্তর সার্থকতার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। জীবনের প্রথম দিনগুলি থেকেই তিনি মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। বর্তমান কালে একথা অন্যের পক্ষে বোঝা অসাধ্য যে কত অসংখ্য অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এসব কখনোই তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। অপরপক্ষে, ঐসব অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করতে আরো অধিকতর প্রেরণা ও উৎসাহদানের কাজ করেছিল।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী হিসেবে তাঁর দীর্ঘ এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনে আনন্দের কথা যে জীবন এখনো শেষ হয়নি—তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদানই রাখেননি, অধিকন্তু তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে গবেষণার প্রকৃত চেতনা /ভাবধারা জাগ্রত করেছেন—তাঁদের অনেকেই এখন বৈজ্ঞানিক জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। কোনো মানুষের জীবিত-কালে এমন সার্থকতা লাভ প্রকৃতপক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিন্তু স্যার পি. সি. রায় তাঁর চেয়েও অনেক বেশী লাভ করেছেন।

যাঁরা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যে ভারতীয় শিল্পের কথা উপলব্ধি করেছিলেন স্যার পি. সি. রায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রেখেই তিনি তাঁর স্বল্প সঞ্চয় সম্বল করেই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এবং অতি সাধারণভাবে যে পদক্ষেপ তিনি শুরু করেছিলেন এখন তা বিকশিত হয়ে উঠেছে—সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতের সর্বাধিক সফল রসায়ন শিল্প হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও উৎসাহ / উদ্দীপনার সাহায্যে তিনি তাঁর সহযোগী সহকর্মীদের কাছ থেকেও এই কাজে সর্বান্তকরণে সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর দ্বিবিধ সাফল্য লাভ—একাধারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী হিসেবে এবং দেশের গুরুত্ব-পূর্ণ (হালফিল ওয়াকিবহাল একটি) শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে—খ্যাতির ফলে তাঁকে সঠিক-ভাবেই এদেশের কল্যাণকামী হিসেবে আখ্যায় ভূষিত করেছে।

এইসব কার্যকলাপ তাঁর জীবনযাপনের চরম সরলতায় ও আত্মত্যাগের মধ্যে কতখানি লক্ষণীয়, সেকথা আমার জানা আছে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সূত্রে। যে আত্ম-সংযম তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রথম দিককার দিনগুলিতে, তা ছিল তাঁর

জীবনের মহৎ সম্পদ। এবং তাই তাঁকে দৃঢ়চিত্তে একাগ্রমনে সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও অক্লান্ত কাজ করতে সামর্থ্য দান করেছিল। এই শক্তি হল ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর প্রকৃতিগত বিশ্বাস থেকে জাত। যে শক্তি তাঁর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই সঞ্চিত ছিল—অর্থাৎ দীর্ঘ ৭০ বছর বয়সের ভার সত্বেও যৌবনের সেই প্রাণশক্তি ও আশাবাদ।

অন্যেরাও তাঁর আত্মত্যাগময় জীবন থেকে লাভবান হয়েছেন। তাঁর চাহিদা ছিল সামান্য এবং নিজের জন্যে রাখতেন নিতান্তই যৎসামান্য, অবশিষ্ট সবকিছুই বিলিয়ে দিতেন গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের মধ্যে এবং অন্যান্যভাবে দানধ্যান করে। এমন সরল জীবনযাপন এবং উচ্চচিন্তার ভাবাদর্শ সর্বদাই অত্যন্ত দুর্লভ। এসব ছাড়াও অধিকন্তু স্যার পি. সি. রায়ের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড কর্মশক্তির উপাদান—যা কোনো বিশ্রাম বলে কিছু জানে না। যে কোনো দেশেই একক মানুষের মধ্যে এ হেন গুণাবলীর সমন্বয় সত্যিই দুর্লভ এবং সেক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের কাছে এই মহৎ শিক্ষকের জীবনের অনুসরণ করার চেয়ে উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই হতে পারে না।

জে. সি. বোস (স্বাঃ)

Acharyya Ray Commemoration Volume,
Calcutta, 1932 p.5

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ রচিত স্মরণীয় দুই ছত্রের কবিতা। কবি কর্তৃক আপন হাতে আচার্যদেবকে উপহার প্রদান ঃ

প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়,
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।

—রবীন্দ্রনাথ

॥ মৌলিক গবেষণা ও রসায়নের ছাত্রগোষ্ঠী ॥

১৯০০ সাল হইতে আমার বিভাগে একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র সর্বদাই থাকিত। শিক্ষানবিশীর প্রথম অবস্থায় সে আমার গবেষণা কার্যে সহায়তা করিত। আমার নিকট প্রথম গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেন। তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। 'মার্কিউরাস নাইট্রাইটের' গবেষণায় তিনি আমার সহযোগিতা করেন। তিনি ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে স্থান পান। ১৯০৫ সালে পঞ্চানন নিয়োগী আমার নিকটে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তারপর অতুলচন্দ্র ঘোষ নামে একজন যুবক রিসার্চ স্কলার রূপে আমার কাজে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি পরে লাহোর দয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ 'ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রী'-তে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে অতুলচন্দ্র ঘোষের নিকট তিনি রসায়ন শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। সুতরাং তিনি আমার প্রশিষ্য বলিয়া দাবী করেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাসায়নিক গবেষণার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল; ঐ বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাণিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং পুলিনবিহারী সরকার আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হন, রসিকলাল দত্ত এবং নীলরতন ধর বি. এস-সি. উপাধির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ হইতে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে ঘোষ, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে বি. এস-সি.-তে যোগদান করেন। রসিকলাল দত্ত, মাণিকলাল দে এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতাতেই পৈতৃক গৃহে লালিত পালিত। ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সরকার, সাহা এবং ধর মফঃস্বল হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল, যাহা সচরাচর দুর্লভ। তাঁহাদের চরিত্রে এমনই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে আমি তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার সঙ্গে তাঁহাদের একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র স্থাপিত হইল। আমি তাঁহাদের হোষ্টেলে প্রায়ই যাইতাম এবং বিকালে তাঁহারা প্রায়ই আমার সঙ্গে ময়দানে বেড়াইতেন।

ইঁহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ রসিকলাল রসায়ন বিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলেন এবং যে-সময়ে এম.এস-সি. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন 'নাইট্রাইট্‌স্' সম্বন্ধে গবেষণায় আমার সহায়তা

করিয়াছিলেন। তিনি শেষ উপাধি পরীক্ষার জন্য মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করিলেন। ঐ প্রবন্ধ যথাসময়ে লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১০ সাল হইতে পরপর কতকগুলি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনিই সর্বপ্রথম ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন।

১৯১০ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এবং আমি একটি রত্ন লাভ করি। জীতেন্দ্রনাথ রক্ষিত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হন। তিনি প্রচলিত পরীক্ষা প্রণালী এবং উপাধি লাভের অস্বাভাবিক স্পৃহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট কোন কলেজে ছাত্ররূপে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সুতরাং 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' রাসায়নিক লেবরেটরিতে কিছুদিন কাজ করিতে লাগিলেন। ব্যবহারিক রসায়ন বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। কয়েক খণ্ড পরিত্যক্ত কাচের নল হইতে তিনি এমন সব যন্ত্র তৈরী করিতে পারিতেন যাহা এতদিন জার্মানি বা ইংলণ্ডের কোনো ফার্ম হইতে আনাইতে হইত। আমি তাঁহাকে শীঘ্রই ডাকিয়া পাঠাইলাম এবং শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম তিনি একজন দুর্লভ গুণসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মী। 'অ্যামাইন নাইট্রাইট্সের' সংশ্লেষণ কার্যে তিনি আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিলেন এবং তাহার ফলে সরকারী আফিম বিভাগের বিশ্লেষক রূপে প্রবেশ করিলেন।** এই সময় আর একজন যুবক আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. পড়তে লাগলেন। তাঁহার একটি বিশেষ যোগ্যতা ছিল যাহা আমাদের বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার দখল ছিল এবং টেষ্ট টিউবের মত লেখনী ধারণেও তিনি সুপটু ছিলেন। এই কারণে আমার সাহিত্য চর্চায় তিনি অনেক সময়ে সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি হেমেন্দ্রকুমার সেন। Tetramethylammonium hyponitrite সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন এবং বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিও পান। ইহার ফলে তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ঐ কলেজেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং অধ্যাপকেরা তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধির জন্য তিনি যে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দাখিল করেন, তাহা খুব উচ্চাঙ্গের। পরে উহা 'কেমিক্যাল সোসাইটি'র জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হেমেন্দ্রকুমারের আর একজন সহপাঠীও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি এম. এস-সি. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং সেনের সঙ্গে একযোগে কিছু গবেষণাও করেন। ইহার নাম বিমানবিহারী দে। দে সেনের দুই বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড গমন করেন এবং 'ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে' জৈব রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যথাসময়ে 'ডক্টর' উপাধি পান।

এই সময়ে নীলরতন ধর 'ফিজিক্যাল কেমেষ্ট্রী' সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া এম. এস-সি. ডিগ্রী পান। তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। যদিও অজৈব রসায়ন শাস্ত্রেই আমি অধ্যাপনা করিতাম, তথাপি এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিবার পর হইতেই, আমি জৈব রসায়নে যে সব নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছিল, সেগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ১৯১০ সালের পর হইতে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের আমি অধ্যাপনা করিতাম। বিশেষভাবে ইহার ঐতিহাসিক বিকাশই আমার আলোচ্য বিষয় ছিল।

আমি যখন এডিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, তখন 'ফিজিক্যাল কেমেষ্ট্রী' কেবল গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সময় এই বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা আরেনিয়াস ষ্টকহলম সহরে গবেষণা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে এই সুইডিশ বৈজ্ঞানিককে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী বৈজ্ঞানিকরা কিভাবে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন। যথাসময়ে আরেনিয়াসের বৈজ্ঞানিক তথ্য জগতে স্বীকৃত ও গৃহীত হইল। তাঁহার বিদ্রূপকারীরাই তাঁহার প্রধান অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। আমি তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে ২৫ বৎসর পরে আমারই প্রিয় ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই বিজ্ঞানের বহুল উন্নতি করিবেন, এমন কি আরেনিয়াসের আবিষ্কৃত নিয়মও কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত করিবেন।

১৯১০ সালে 'ফিজিক্যাল কেমেষ্ট্রী' বৈজ্ঞানিক জগতে স্থায়ী আসন লাভ করিল। কিন্তু ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডেও এই বিজ্ঞানের জন্য কোনো স্বতন্ত্র অধ্যাপক ছিল না। ভারতে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অধ্যাপনার প্রবর্তক হিসাবে নীলরতন ধরই গৌরবের অধিকারী। তিনি কেবল নিজেই এই বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন নাই, জে. সি. ঘোষ, জে. এন. মুখার্জী এবং আরও কয়েকজনকে তিনি ইহার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। নীলরতন সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ইউরোপে যান এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে ও সোরবোনে শিক্ষালাভ করেন। তিনি উচ্চাঙ্গের মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া লণ্ডন ও পারি এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। ...১৯২০ সালের ৪ঠা নভেম্বরের 'নেচার' লিখিয়াছেন,—'ফ্যারাডে এবং ফিজিক্যাল সোসাইটির যুক্ত অধিবেশনে কোলয়েড সম্বন্ধে যে-সব প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিঃ জে. এন. মুখার্জীর প্রবন্ধই প্রধান, কেননা ইহাতে বহু নূতন তত্ত্বের উল্লেখ ছিল।'

লণ্ডনে থাকিবার সময় আমি অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তাহাতে রসায়ন জগতে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডে আসিবার পূর্বে কলকাতায় থাকিতেই এবিষয়ে গবেষণা করিয়া আমি সাফল্য লাভ করি। সৌভাগ্যক্রমে নীলরতন ধর আমার সহযোগিতা করেন এবং তিনকড়ি দে নামক আর একটি যুবকও আমার সঙ্গে ছিলেন। এই গবেষণায় প্রায় দুই মাস সময় লাগিয়াছিল, কোন কোন সময়ে একাদিক্রমে ১০।১২ ঘণ্টা পরীক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কিন্তু বিষয়টি এমনই কৌতূহলপ্রদ যে কাজ করিতে করিতে আমাদের সময়ের জ্ঞান থাকিত না। প্রত্যহ পরীক্ষাকার্যের পর

নীলরতন ধর যখন ফলাফল হিসাব করিতেন, তখন আমি অধীর আনন্দে প্রতীক্ষা করিতাম।

লণ্ডনে আমি কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় এই প্রবন্ধ পাঠ করি। সভায় বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধটি রাসয়নিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে আমাকে সানন্দে অভিনন্দন করেন। ডা. ভেলী তাঁহার বক্তৃতায় উচ্চপ্রশংসা করেন। আমার ছাত্রগণকে এজন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র গুহ নামে একজন মেধাবী ছাত্র আমার অধীনে গবেষণার্থ আমার লেবরেটরিতে কাজ আরম্ভ করিলেন। রাসায়নিক গবেষণায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। যথাসময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন। এম. এস-সি. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেন এবং তিন বৎসর পর ডক্টর উপাধি লাভ করিলেন। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও পাইলেন।** এই সময় প্রচার হইতে লাগিল, যে একটি স্কুল অব কেমেষ্ট্রী বা রসায়ন গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতেছে। দত্ত, রক্ষিত এবং ধরের মৌলিক গবেষণা ইংলণ্ড, জার্মানী ও আমেরিকায় রাসায়নিক পত্রসমূহে ঐ সব দেশের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উল্লিখিত হইতেছিল। ইহাতে মনে মনে আমি বেশ আনন্দ অনুভব করিতাম।

বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র 'নেচার' ২৩ মার্চ, ১৯১৬ সংখ্যায় লিখিয়াছিল—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইতেছে। গত ১০ই জানুয়ারি তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের 'ডীন' যে বক্তৃতা করেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গত ২০ বৎসরে বাংলাদেশে রসায়ন সম্বন্ধে যে-সব মৌলিক গবেষণা করা হইয়াছে, এই বক্তৃতায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। পরিশিষ্টে ১২৬টি গবেষণার নাম দেওয়া হইয়াছে; কেমিক্যাল সোসাইটি, জার্নাল অব দি আমেরিকান সোসাইটি প্রভৃতিতে এই সকল মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে অনেকগুলি খুবই মূল্যবান এবং নবপ্রতিষ্ঠিত রসায়ন বিদ্যাগোষ্ঠীর কার্যাবলীর পরিচয় এইগুলিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক রায়ের কার্য এবং দৃষ্টান্তের ফলেই এই বিদ্যাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।'

(প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিদায়কালীন সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা বড় হৃদয়গ্রাহী।)

আমার বন্ধু ও সহকর্মী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও আমি গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। আমরা প্রত্যেকে আমাদের স্বতন্ত্র বিভাগে কাজ করিয়াছি, পরস্পরকে উৎসাহ দান করিয়াছি, এবং আশা করি যে আমরা যে অগ্নি মৃদুভাবে প্রজ্বলিত করিয়াছি, তাহা ছাত্র পরম্পরা-ক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আলোকিত করিবে। আপনাদের কেহ কেহ হয়তো জানেন যে যাহাকে পার্থিব বিষয় সম্পত্তি বলে, তাহার প্রতি আমি কোনদিন বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কার্যকাল শেষ হইবার সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছি; তাহা হইলে প্রাচীন কালের কর্ণেলিয়ার কথায় আমি উত্তর দিব।

আপনারা সকলেই সেই আভিজাত্য গৌরব-শালিনী রোমক মহিলার কাহিনী শুনিয়াছেন। জনৈক ধনী গৃহিণী একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নিজের রত্ন অলঙ্কার প্রভৃতি সগর্বে দেখাইলেন এবং কর্ণেলিয়াকে তাঁহার নিজের রত্নালঙ্কার দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কর্ণেলিয়া বলিলেন—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার মণি-মাণিক্য আমি দেখাইব।' কিছুক্ষণ পরে কর্ণেলিয়ার দুই পুত্র বিদ্যালয় হইতে ফিরিলে তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া সগর্বে বলিলেন, 'এরাই আমার রত্নালঙ্কার।' আমিও কর্ণেলিয়ার মত, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিতে পারি, 'এরাই আমার রত্ন'।

আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করিলাম। এই সময়ে রসায়নের নূতন ও পূর্বতন কৃতী ছাত্র আসিয়া বিজ্ঞান কলেজে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রিয়দারঞ্জন রায়, পুলিনবিহারী সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন, প্রফুল্লকুমার বসু, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মনোমোহন সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জনের কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। 'Complexes and Valency' এবং মাইক্রো-কেমেষ্ট্রী সম্বন্ধে তিনি একজন প্রামাণিক বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য। রসায়ন সমিতিসমূহের সম্মুখে আমার নিজের কোন মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করিবার পূর্বে আমি উহা প্রিয়দারঞ্জনকে দেখিতে দেই এবং তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করি। ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে ভারতীয় রসায়ন সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করি, তাহা প্রধানতঃ তাঁহার ভাব ও সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মত শান্ত এবং নীরব কর্মী বিরল। ইউরোপে গিয়া অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য অতিকষ্টে তাঁহাকে সম্মত করান হয়। 'রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ বৃত্তি' তাঁহার উপর একরকম জোর করিয়াই চাপাইয়া দেওয়া হয়। বার্ন সহরে অধ্যাপক ইফ্রেমের গবেষণাগারে তিনি ৪ মাস কাল গবেষণা করেন। তাঁহার খ্যাতি পূর্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল, সুতরাং বার্নে তিনি একজন অভিজ্ঞ সহকর্মী হিসাবেই সম্মান ও অভিনন্দন লাভ করেন। তিনি বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার যে-কোন একটির জন্য পৃথিবীর যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর উপাধি দিতে পারেন। কিন্তু এখনও তিনি এ বিষয়ে মনস্থির করেন নাই।

ঘটনা দুই রকমের—নীরব ও বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ। প্রিয়দারঞ্জনের কার্যাবলী প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার অন্য সমস্ত গবেষণার কথা ছাড়িয়া দিলেও, সম্প্রতি তিনি 'থায়োসালফিউরিক অ্যাসিড' সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশ যে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কলিকাতায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল মানচেষ্টারে অধ্যাপক রবিন্‌সনের গবেষণাগারে কাজ করেন। তিনি যুক্ত ও স্বতন্ত্রভাবে যে-সমস্ত মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, 'অ্যালকালয়েড' ঘটিত রসায়ন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান

কত গভীর। পুলিনবিহারী সরকার এদেশে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পারিতে যান এবং সোরবোনে অধ্যাপক উরবেনের গবেষণাগারে তিন বৎসর কাল 'Rare Earths' সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 'কেমিক্যাল হোমলজি' সম্বন্ধে তাঁহার নূতনতম গবেষণা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

রাজেন্দ্রলাল দে ১৯১৩-১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার শিক্ষাধীনে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। আমার সঙ্গে একযোগে 'নাইট্রাইট' ও 'হাইপো-নাইট্রাইট' সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। তিনি নিজে স্বাধীনভাবে 'ভ্যালেন্সি' সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আর একজন কৃতী ছাত্র প্রফুল্লকুমার বসু। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি ও বিকাশ সম্বন্ধে যে বার্ষিক বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে বসুর মৌলিক গবেষণার যথেষ্ট সুখ্যাতি করা হইয়াছে।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯২২-২৪ সাল পর্যন্ত আমার নিকট রিসার্চ স্কলার ছিলেন এবং 'সালফার কম্পাউণ্ড' ও 'সিনথেটিক ডাই' সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। গোপালচন্দ্র ১৯২৮ সালে ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। তিনি বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে যোগদান করেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন জৈব রসায়ন সম্বন্ধে অক্লান্তকর্মী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিবার পর তাঁহাকে 'পালিত বৈদেশিক বৃত্তি' দেওয়া হয়। ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্সে অধ্যাপক থর্পের নিকট তিনি তিন বৎসর গবেষণা করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। 'Balbiano's Acid' সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা অতি মূল্যবান।

বীরেশচন্দ্র গুহ সায়েন্স কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং আমার লেবরেটরিতে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তিনি লণ্ডন ইউনিভারসিটি-কলেজে অধ্যাপক ড্রামণ্ডের শিক্ষাধীনে বাইও-কেমেষ্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। পরে কেম্ব্রিজে অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌সের নিকটও তিনি ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। লণ্ডনে পি-এইচ. ডি. ও ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করিয়া তিনি বাইওকেমেষ্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের নিকট শিক্ষা-লাভ করিবার জন্য ভিয়েনায় যান। তিনি ইউরোপে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। বাইওকেমিষ্টী সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।···

*　　*　　*

এ পর্যন্ত ভারতীয় রসায়নবিদেরা সাধারণতঃ ইংলণ্ড, জার্মানী এবং আমেরিকার পত্রিকাসমূহেই তাঁহাদের মৌলিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেন। আমাদের এখন মনে হইল যে ভারতেই আমাদের একটি রাসায়নিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং তাহার একখানি মুখপত্রও থাকা প্রয়োজন। (এই মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করিয়া অধ্যাপক উইনের টেলিগ্রামের উত্তরের কিয়দংশ এইরূপ) মৎকৃত 'ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে আমি দেখাইয়াছি, প্রাচীন ভারতে কিরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন করা হইত। বর্তমানে আমি সানন্দে লক্ষ্য করিতেছি যে, ভারতের

অধিকাংশ বিশ্ববিত্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের তাঁহারা সকলেই কেমিক্যাল সোসাইটির নিয়মিত পদ, আমার ছাত্রেরাই অধিকার করিয়াছেন। লেখক।

[নিবন্ধটি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত "আত্মকথা" প্রথমখণ্ড হতে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত। এই লেখায় মোটামুটি ১৯১০ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরমপ্রিয় ছাত্রবৃন্দ রসায়ন শাস্ত্রের নানা বিভাগে গবেষণাত্মক কার্য এবং নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা সমগ্র বিশ্বে ভারতকে যে-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার বৃত্তান্ত আহৃত হয়েছে।]

● ● ●

এই আমরা

"যে আবহাওয়ায় আমাদের যুবকবৃন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তদপেক্ষা মনোবল-হানিকর আর কিছুই হইতে পারে না। তাহারা দেখে যে প্রতারণা, ভণ্ডামি ও অসততায় এই সমাজ পরিকীর্ণ। রেলওয়ে, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা বা আবগারী বিভাগের নিম্নতর স্তরে যাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ করেন না তাঁহারা সম্মানিত ব্যতিক্রম মাত্র। হাসপাতালের দরিদ্র রোগীদের পথ্য, কিংবা কারারুদ্ধ অসহায় কয়েদীদের খাদ্য প্রায়শঃই ব্যক্তিগত গৃধ্নুতার প্রয়োজন সিদ্ধ করে। মোটা বেতনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও প্রায়শঃই ইত্যাকার গোপন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন।... সারস্বত শিক্ষার ধ্বজাবাহী আমাদের তরুণবৃন্দ অনর্গল মিল্, স্পেন্সার, বার্নার্ড্ শ আবৃত্তি করিয়া থাকেন ; রাসেলের 'সমাজ-পুনর্গঠন' কিম্বা' সিণ্ডিক্যালিজম' 'সমাজতন্ত্র' প্রভৃতি তত্ত্বের খই ফুটিতে থাকে তাহাদের মুখে। অথচ স্বজাতির বাহিরে বিবাহ করিবার সাহসটুকু তাঁহাদের নাই।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এই আমরা

"আমাদের 'শিক্ষিত' ব্যক্তিরাও ঐতিহ্য ও সংস্কারের দাস। বাঁধা পথ ত্যাগ করিয়া এক ইঞ্চিও নড়িতে তাঁহারা সম্মত নহেন। সম্প্রতি (২ অক্টোবর ১৯৩৪) লখ্নউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আর. পি. পরাঞ্জপে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 'ইহা যৎপরোনাস্তি আশ্চর্যের বিষয় যে অধিকাংশ লোকই তাঁহাদের কাজে-কর্মে যুক্তির দ্বারা চালিত হয়েন না। শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও তাঁহারা পল্লী-গ্রামের অজ্ঞ লোকের মতোই সরল বিশ্বাসী। রাজনীতি, ধর্ম ও অন্যান্য ব্যাপারে তাঁহারা সেই সকল স্ব-নিয়োজিত নেতাদেরই অনুসরণ করিতে ভালবাসেন যাঁহারা দাবি করেন যে তাঁহাদের প্রেরণার মূলে আছে কোনো রহস্যময় শক্তি।' "

আচার্য রায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতিকথা

অধ্যাপক সত্যেন বোস

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী বাংলার লোক নানাভাবে পালন করছে। খুলনাবাসীরা প্রকাশ করেছেন স্মারক-গ্রন্থ—তা ছাড়া নানা শহরে-গ্রামে স্কুলে-কলেজে, সমিতি ও সেবা-প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছাত্ররা, অনুরাগী ও সহকর্মীরা তাঁর অনুধ্যানে নানা কথা বলেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক ছবির সঙ্গে প্রকাশ করেছেন স্মারক-পুস্তিকা, তাতে অনেক খবর দিয়ে অনেক লোকে লিখেছেন—বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়। বেঙ্গল কেমিক্যালও প্রতিবৎসর জন্মতিথি পালন করে আস্‌ছে। এবারও ২রা আগস্ট নানা জায়গায় তাঁকে স্মরণ করতে সভা বসবে আশা করা যাচ্ছে।

তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির খবর এখন সুস্পষ্ট। যখন যশোহর ও খুলনা ভিন্ন ভিন্ন জেলা হয়নি, তখন তিনি জন্মেছিলেন রাড়ুলী গ্রামে এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে—শুনেছি, সেই বংশের সঙ্গে শোভাবাজার দেববংশের সম্পর্ক বিশেষ দূর নয়। প্রফুল্লচন্দ্র যখন জন্মালেন তখন রাড়ুলী পরিবারের অর্থাগম অনেক কমে এসেছে। পিতা হরিশ্চন্দ্র নিজে ছিলেন সাহিত্য-অনুরাগী। গ্রামের বাড়ীতেও ইংরাজী বাংলা সাহিত্যের বই, নানা সংবাদপত্র নিয়ে একটা ছোট লাইব্রেরী ছিল। ছেলেবেলায় প্রফুল্লচন্দ্র সেখানে অনেক রকমের বই পড়তেন—এই খবর নিজেই লিখে গেছেন। বিদেশী সভ্যতার আলো কলকাতা থেকে অনেক সুদূরের গ্রামেও তখন পৌঁছে গেছে। কবি মধুসূদনের জন্মস্থান রাড়ুলী থেকে বেশী দূরে নয়। দেশের নব জাগরণের বিদ্রোহী আন্দোলন তখন খুলনা জেলায় নানাভাবে পৌঁছেচে। পিতা হরিশ্চন্দ্র সাবেকী আচার-সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজে অনেকটা মুক্ত ছিলেন, তবে বাহিরের ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখতো না কাছাকাছি গ্রামের লোকেরা।

প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় এলেন ও ভর্তি হলেন প্রথমে হেয়ার স্কুলে। তবে কিছুদিন বাদে হজমের গোলমাল নিয়ে অসুখে পড়লেন দারুণভাবে—সেজন্য কিছুদিন পড়াশুনা বন্ধ করে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হল। ওই সেই থেকে তাঁর স্বাস্থ্য যেভাবে ভেঙ্গে গেল, পরে সেই অসুবিধা তাঁকে বহন করতে হয়েছিল সারা জীবন। কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে তাঁর আশানুরূপ সাফল্য হয় নি। তবে নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিলেন—সম্পূর্ণ নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে Gilchrist Scholarship পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে—নিজেই বিদেশ যাবার পাথেয় ও পড়ার খরচ জোগাড় করে

নিলেন। তাঁর সহপাঠী ও মাস্টারমশায়েরা সকলেই বিস্মিত হলেন এই পরিণতিতে।

ছাত্রমহলে ও দেশে তখন কেশবচন্দ্র সেনের যুগ। তাঁর মনও সহজে সেদিকে ঝুঁকলো—প্রফুল্লচন্দ্র ব্রাহ্ম হ'লেন। জাতিভেদ, অন্ধসংস্কার, পৌত্তলিকতার উপর তাঁর বিরাগ ছিল আন্তরিক। নানা জায়গায় নানা ভাষণে তিনি খোলাখুলি সে মত ব্যক্ত করতেন। তাঁর চিরন্তন আদর্শ ছিল—

একজাতি, এক ভগবান
এক দেশ এক মন-প্রাণ ॥

স্বাবলম্বী প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশে অধ্যয়ন করলেন রসায়ন-শাস্ত্র। কৃতবিদ্য হয়ে নিঃসম্বল তিনি যখন দেশে ফিরলেন বিদেশী সরকার তাঁর উপযুক্ত শিক্ষাপদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে সম্মানিত করলো না। কিন্তু কাজের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল—তাই প্রাদেশিক শিক্ষকের বরাদ্দ মাহিনা সরকারী কলেজে প্রায় সারাজীবন পেয়ে এসেও তিনি নিরুদ্যম হননি। কাজের জন্য যে সুযোগ পেয়েছিলেন তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে রয়ে গেলেন নিজের সাধনা নিয়ে। বাংলায় লিখ্‌লেন সর্বসাধারণের উপযোগী তথ্যবহুল বিজ্ঞান পুস্তিকা—আবার কলেজে নতুন আগন্তুকদের জন্য অজৈব রসায়নের প্রবেশিকা। সহকর্মীদের সঙ্গে সালফুরিক এসিডের কারখানা খোলা হলো। মিতব্যয়ী অধ্যাপকের যথাসর্বস্ব প্রায় ব্যয় হত তখন এই কাজে। তখন তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন অধ্যাপক ৺চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, ডাক্তার কার্তিক বসু ও আরও অনেকে। এঁরা তাঁরই মত বিশ্বাস করতেন বাঙ্গালীকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হতে হ'লে শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে তাকে নামতেই হবে।

গবেষণার রাজ্যে মারকুরস-নাইট্রাইট $[Hg_2(NO_2)_2]$ হলো তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। সেজন্য এই যৌগিক উপকরণটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল ও পরে নানা গবেষণার কাজে তিনি এটি ব্যবহার করতেন। অবশ্য প্রাচীন হিন্দুদের রসায়নবিদ্যার ইতিহাস লিখে তিনি প্রথমে বিদ্বান সমাজে দেশ-বিদেশে যশ অর্জন করেছিলেন। এর জন্য কয়েক বৎসর ধরে সংগ্রহ করেছিলেন অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরানো পুঁথি—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্যে তাদের পাঠোদ্ধার করলেন। প্রাচীন হিন্দুদের গবেষণার খবর প্রকাশ করলেন—ভারতীয়েরা চিরকৃতজ্ঞ রইলো তাঁর কাছে। তাঁরা বুঝলেন, প্রাচীন হিন্দুদের মননশীলতা শুধু দর্শন ও ধর্মচর্চায় পর্যবসিত হয়নি, ফলিত-বিজ্ঞানে, আয়ুর্বেদে তাদের অবদানও যথেষ্ট। পরে আচার্য ৺ব্রজেন্দ্র শীল, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তী অনেক গবেষকরা আচার্য রায়ের মতকে পুরাপুরি সমর্থন করলেন—এই প্রাচীন জাতির নানা ফলিত-বিজ্ঞানে কৃতিত্বের ইতিহাস লিখে।

সারাজীবন পরিশ্রম করে আচার্য রায় বেঙ্গল কেমিক্যালকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অবনত ভারতমাতাকে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে স্থাপিত করতে জীবনের সমস্ত সময় নিয়োগ করতেন আচার্য রায়। তাঁর অনেক সর্বত্যাগী ছাত্ররা যখন দেশ সেবার বিপদসঙ্কুল পথে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়ত, তখন তারা তাঁর কাছে সব সময় পেত আন্তরিক সহানুভূতি ও অনেক সময় নানাভাবে সাহায্য। বন্যার মধ্যে সঙ্কটত্রাণের উদ্যোগ তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। আবার এদেশে স্বাধীনতা

সংগ্রামে নীতির যখন পরিবর্তন হলো তখন তিনি গান্ধীজীর একজন প্রধান সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন। দেশ-বিদেশে প্রচার করে বেড়ালেন গান্ধীনীতি—নিজে খদ্দর পরলেন ও চরকা কাটা শুরু করলেন। এইখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তফাৎ অনেকের চোখে ঠেক্‌বে।

বাঙ্গালী অবশ্য খদ্দরনীতি মনে-প্রাণে নিতে পারেনি। তাঁদের কাছে আচার্য রায় ছিলেন শিল্পে সংগ্রামী-অগ্রণীদের প্রতীক। স্বদেশী যুগে তাই তাঁর পাশে অনেক উচ্চাভিলাষী গবেষক ছাত্র এসে দাঁড়াল ও শেষ বয়সে তাঁর গবেষণার যথেষ্ট প্রসার হ'লো। তিনি অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ও পালিত রাসায়নিক প্রেক্ষাগারে। ৺শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর একবার রহস্য-ছলে তাঁকে কিমিয়া-বিজ্ঞানীদের পিতামহ এই আখ্যা দিয়েছিলেন। বস্তুত আজকাল ভারতবর্ষে কিমিয়া-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা করে যশস্বী হয়েছেন যে-সব বিজ্ঞানীরা তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র, আবার অন্যদের অনেকেরও হয়ত তাঁরই কোন শিষ্যের কাছে বিজ্ঞানে প্রথম হাতেখড়ি হয়েছে। ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়ে ও চিরকাল রোগ ভোগ করে কি করে তিনি এত কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠা স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, সব সময়ে একাগ্র নিয়মানুবর্তিতাই হলো এর মূল কথা। যে সময় যেটি করা তিনি সিদ্ধান্ত করতেন তার ব্যতিক্রম তিনি কিছুতেই করতে চাইতেন না। সভাসমিতি করা, নিজের আহার-বিহার সবই একছন্দে বাঁধা থাকত। এর জন্য অনেকের যে সময় সময় অপ্রতিভ বা লজ্জিত হতে হতো তার কথা তাঁর আত্মজীবনীতেই লেখা আছে—প্রত্যক্ষ-দর্শীরাও নানা জায়গায় বলেছেন তাঁদের ভাষণে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উচ্চসম্মান লাভ করার দাম তাঁর কাছে বেশী মিলত না। অনেক সময় তিনি বলতেন, এটি বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার। এই প্রবন্ধ লেখককে সেইজন্য ছাত্রজীবনে ও প্রথম বয়সে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। তিনি ছিলেন বিশেষভাবে ছাত্রবৎসল—তবে গুণেরই কদর ছিল তাঁর কাছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও ছাত্ররা তাঁর কাছে গবেষণা করার সুযোগ পেত এবং যদি তিনি দেখতেন, তারা তাতে অসুলভ কৃতিত্ব দেখাচ্ছে তবে অনেক সময় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন তাদের ও নানাভাবে তাদের সাহায্য করে যেতেন। সন্ধানী পাঠক এর অনেক উদাহরণ জোগাড় করতে পারবেন।

সারাজীবন এইভাবে দেশসেবায় নিজেকে ক্ষয় করে নিজের উপার্জিত প্রায় সব অর্থই বিজ্ঞান-সেবা ও দরিদ্র ছাত্রের সাহায্যের জন্য দিয়ে গিয়েছেন। ত্যাগই প্রকৃত কষ্টি-পাথর—সত্যযোগী পুরুষের সোনালী আভা সেইখানেই বিচ্ছুরিত হয়।

আচার্য ছিলেন নিজে অকৃতদার। ছাত্ররাই ছিল তাঁর যথাসর্বস্ব ও নিকটতম আত্মীয়-স্বরূপ। তারাও তাদের যথাসাধ্য তাঁকে সেবা করে সব সময় আচার্যের ঋণ-শোধের চেষ্টা করেছে। শতবার্ষিকীর নানা-বৈঠকে অনুরাগী বাঙ্গালী বলে এসেছেন, আচার্যের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের আহূত স্মৃতিসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকবীর বলেছিলেন ১ লক্ষ টাকা আসবে

সরকারী তহবিল থেকে ও বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হ'লে সহজেই তাঁর স্মৃতিদ্যোতক অধ্যাপক-পদ প্রতিষ্ঠা ক'রে কায়েমী করতে অর্থের অভাব হবে না। এটি কিন্তু এখন পর্যন্ত রূপায়িত হয়নি। বসুবিজ্ঞান মন্দিরে এক স্মৃতিসভায় বন্ধুবর বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ মশায় বলেছিলেন, উপযুক্ত চেষ্টা হ'লে আচার্যদেবের নামে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা সহজ। আমরা অবশ্য এখনও সেই উচ্চাঙ্কে উপনীত হতে পারিনি। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি—সেই জন্য কোন এক বিষয়ে তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেশী দিন টিকে থাকে না। তাছাড়া এই দেশে এই ধরনের কল্যাণময় স্মৃতিরক্ষার সূচনা ও খসড়া নিয়তই হ'চ্ছে। মহাপুরুষরা এদেশে মহাপ্রয়াণ করছেন—তাঁদের জায়গা খালি থেকে যাচ্ছে। তাঁদের সকলেরই উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও আমাদের কর্তব্য। তাই নানাভাবের টানা-পোড়েন ও আকর্ষণের হিড়িকে শেষ অবধি আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারব কিনা কে বলবে? এ কৃত্যের শেষ পরিণতি এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে।

● ● ●

গুরুর কথা, সুতরাং তর্ক নয়!!

"অতিলৌকিকের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আকর্ষণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। থিয়জফি, বেদান্তবাদ এবং শ্রেষ্ঠতর কোনো নামের অভাবে যাহাকে 'বিবেকানন্দবাদ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহার প্রতি লোকে বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে। এ সকল ক্ষেত্রে তবু মানুষের বুদ্ধির নিকট সামান্য একটা আবেদন অন্ততঃ রাখা হয়; কিন্তু সম্প্রতি বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবণতাটি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আরও মারাত্মক—বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিয়া ধর্মীয় 'গুরু' বরণের ঝোঁক সেখানে অত্যধিক বাড়িতেছে। 'গুরু'র মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ শিষ্যের কাছে অলংঘ্যনীয় নিয়ম, তাঁহার প্রতিটি আদেশ বিনা প্রশ্নে পালনীয়—যতই উদ্ভট হউক, তাহা লইয়া কখনোই তর্ক করা চলিবেনা।" পশ্চিম ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ডঃ পরাঞ্জপে যাহা বলিয়াছেন তাহা সারা ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

আচার্য রায়

[Life and Experiences of a Bengali Chemist, Vol II থেকে]

গুরু প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি দিলীপ রায়ের 'স্মৃতিচারণ'

বৃহস্পতি

১৯১৪/১৫ সালের কথা। দিলীপকুমার রায় আই. এস-সি. ক্লাশে ভর্তি হতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তখন তাঁর সতীর্থ সুশীল তাঁকে স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে নিয়ে চললেন। বললেন, 'তাঁর ছোঁয়ায় তোমার মনে জাগবে রসায়নের প্রতি প্রেম হে! যেমন সাধুর ছোঁয়ায় জাগে সাধুর প্রতি ভক্তি।' তাঁর বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী আধাআধি সফল হয়েছিল। স্যর-এর মধুর স্নেহ পেয়ে ব্যবহারিক রসায়নে না হোক পুঁথিগত রসায়নে তিনি রস আহরণ করেছিলেন। দিলীপ রায়ের কথায়ঃ 'স্যর ছাত্র-অন্ত প্রাণ—পূর্বজন্মের বহু সুকৃতি থাকলে তবেই সে ধন্য ছাত্র তাঁকে শিক্ষক-রূপে পায়—তিনি ছাত্রকে তাঁর সরল প্রেমে ভুলিয়ে দিতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অগুন্তি দুর্ভোগ।' তিনি বলেছেনঃ "ভাগবতে গোপীরা চোখে দেখার আগেই কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর বাঁশী শুনে। লোক মুখে স্যর-এর গুণকীর্তন শুনেই তাঁর কানে বাঁশির সুর হয়ে বেজে উঠেছিল —তাঁকে দেখার আগেই পূর্বরাগের মত তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত পূর্বরাগে।"

দুরু দুরু বক্ষে সায়েন্স কলেজে সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের সাক্ষাৎ আশায় প্রবেশ করলেন দিলীপ-কুমার। সুশীল পরিচয় করে দিতেই স্যর দিলীপকে কোলে টেনে নিলেনঃ "অ্যাঁ! বলো কি? ডি. এল্. রায়ের কুলতিলক—তার উপর শিব রাত্রির সলতে—হা হা হা! ......তুমি নাকি চমৎকার গাইতে পার! আর, কথাটি নয়, ধরে দাও তাঁর গান।" ডি. এল. রায় প্রসঙ্গে দিলীপকে বল্লেন, "তাঁর স্বদেশী গান আমাদের দেশে সবাইকে কি ভাবে ভাবিয়ে তুল্‌ত দিলীপ উঃ! এমন ওজস্—force যত্রতত্র মেলে না হে! গাও তাঁর ঐ গানটি, না, আর দেরী নয়—আমার কি যে ভাল লাগে ঐ—

'কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন
আমার দেশ!'

কিম্বা তাঁর ঐ—

'সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির।
উঠ বীরজায়া বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর॥

শুনলে আমার বৃদ্ধ রক্তও গরম হয়ে ওঠে, কি বল সুশীল, উঁম্?'

দিলীপ রায় মুগ্ধ হয়ে শুধালেন, 'কোন্ গানটি গাইব?'

আচার্য বললেন, "অধিকন্তু ন দোষায়—দুটোই গাও! না, তিনটে—'আবার তোরা মানুষ হ'

গানটি শুনবই শুনব। জানো, দিলীপ, আমি প্রায়ই বলি, ঐ গানটিই হল ডি. এল. রায়-এর প্রধান বাণী—message, কি বল সুশীল? কারণ মানুষই দেশকে গড়ে—আমাদের দেশের আর এ দুরবস্থা কেন? সত্যিকার মানুষ এত কম বলে, নয় কি?"

দিলীপ আনন্দে গান গেয়েছিলেন।

দিলীপ রায়ের স্মৃতিতে ফুটে ওঠে আচার্যের তিনটি ভিন্নরূপ—তিনি সহজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন,—দেশ ভক্তিতে, কারুণ্যে ও নাটকীয় ভাবাবেগে। দিলীপ রায় লিখেছেন,—"ধর্ম তিনি মানতেন কি না তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না, তবে আচার আদৌ মানতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, আচার, ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদ এই ত্রিশূলেই আমাদের বিঁধে মেরেছে। বিশেষ করে শুচিবাই-বর্গীয় কুসংস্কারকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা ছিল তাঁর একটা প্রধান আমোদ।"

এই প্রসঙ্গে দিলীপ রায় আচার্যকে নিয়ে একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। দিলীপ রায়ের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা ছেলে পড়ত। তার মাথায় ছিল মস্ত টিকি। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল দীর্ঘশিখা। স্যর তাকে লক্ষ্য করে প্রায়ই ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতেন। একবার তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। ছেলেরা ক্লাশে এসে বসতেই তিনি বাঁ হাতে একখানি হাড় ও ডান হাতে একটা পাত্রে কিছু ভস্ম নিয়ে দীর্ঘশিখাকে ডেকে বললেন, "তুমি সায়েন্সে বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই, নইলে বি. এস-সি. পড়ছ কেনই বা? তাই শোনো বলি—এই যে হাড়, এ হোল শ্রীরামপক্ষীর ঠ্যাং। আর এই যে ভস্ম এ হল ঐ পক্ষীরই হাড়-পুড়িয়ে পাওয়া ভস্ম। এই দেখ, এই ভস্ম মুখে দিলাম। আমার জাত গেল, না রইল? উঁম্।"

দীর্ঘশিখার মুখখানি লাল হয়ে উঠল—"এ কি রকম ঠাট্টা স্যর?" স্যর হো হো করে হেসে উঠে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "রাগই পুরুষের লক্ষণ, আমার জাত যায়নি বোঝাতেই এ ডিমনস্ট্রেশন। অর্থাৎ হাড় পোড়ালে যে oxidized হয়ে একেবারে একটি আলাদা জিনিস হয়ে যায়, কি না—calcium carbonate." স্যর তাকে আরও বললেন, "সায়েন্স যদি পড়তেই চাও তবে সায়েন্স থেকে যা শিখবার আছে তা শিখতে আপত্তি করলে চলবে কেন? সায়েন্সের একটা মস্ত কাজ হল বস্তুবিচার ক'রে মনকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা—অন্তত খানিকটা।"

দিলীপ রায়ের রসায়নে খুবই বীতরাগ ছিল। আই. এস-সি.তে সাইন্স পড়তে তাঁর কান্না পেত। কিন্তু স্যরের কাছে রসায়ন পড়তে যেয়ে তিনি রস পেলেন। ফলে তৃতীয় বার্ষিক কলেজ পরীক্ষায় তিনি একশ'র মধ্যে ৭৭ পেয়ে প্রথম হলেন। তখন স্যরের আনন্দ দেখে কে? ক্লাশে বইখাতা রেখে তিনি দু' হাতে দিলীপের গলা জড়িয়ে ধরে চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে উঠে দু'পা লতিয়ে তাঁর কটিদেশ জড়িয়ে বৃদ্ধ শিশু "ঝোঝুল্যমান" তাঁর বুকে।

দিলীপ গান গেয়েছেন, "তোমার তুলনা তুমি", সত্যই ছাত্রদের এত স্নেহ বিলাতে পারেন ক'জন? স্যর কথায় কথায় বলতেন, "সর্বত্রং জয়মন্বিষ্যেৎ পুত্রাৎ-শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"—সর্বত্রই জয় চাইবে, কেবল পুত্র ও শিষ্যের হাতে পরাজয়।

একবার দিলীপ শরৎচন্দ্রকে স্যরের কাছে নিয়ে

গেলেন। বিরাট হলঘর, একটা খাটিয়া, একটা টেবিল, আর দু'চারটি ছোটখাটো আসবাব'—যেন বাসগৃহ নয়, পান্থশালা। দিলীপ শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন,—"জানেন শরৎদা, স্যরের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক যে এমনভাবে কৃচ্ছ্রসাধন করে সন্ন্যাসীর মতো দীনবেশে, রিক্তঘরে দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটাতে পারেন, এ আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।" বেঙ্গল কেমিক্যাল, বই বিক্রী, মোটা মাইনে সব মিলে তিন/চার হাজারের কম নয়—এখনকার দিনে বিরাট অঙ্ক। এই বিপুল আয়ে রাজার হালে থাকতে পারতেন। কিন্তু স্বভাবে দাতাকর্ণ তথা সন্ন্যাসী পারবেন না দান ছেড়ে আত্মসুখ সর্বস্বতাকে বরণ করে বিলাসে গা ঢেলে দিতে। শরৎচন্দ্র প্রায়ই বলতেন,—"স্যরকে দেখে সব আগে মনে হয় বিদ্যাসাগরের কথা—দয়া সংযমের অবতার—আর দেখ, জ্ঞানের উদয়ে সরলতার আলো ছড়িয়ে পড়ে কেমন সহজে।"

শরৎবাবুকে স্যর বলেছিলেন, "শরৎবাবু আপনার লেখার আমি এত ভক্ত কেন জানেন? কারণ, আপনার সৃষ্ট চরিত্র প্রত্যেকটি রক্তমাংসে গড়া মানুষ—পড়ে আর ওঠে। প্রলোভনে যারা কোনোদিন টলেনি তারা ত পাথর; পাথর, পাথর —উঁম্।"

শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "বাস্তববাদের রিয়্যালিজমের এটাই তো প্রাণের কথা।" শরৎবাবু হেসে তাঁকে আর একটা কথা বলেছিলেন,—"দিলীপ বলেছে আমাকে তার সতীর্থ দীর্ঘশিখার দুরবস্থার কথা। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, ওর বাবা টিকি নিয়ে কী ঠাট্টা তামাসাই করতেন—গাও না মণ্টু, স্যরকে শুনিয়ে দাও সেই 'হয়েছি হিন্দু' গানের টিকি মাহাত্ম্য।"

দিলীপ বলেছেন, শরৎচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী নানা বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল,—কেবল এক জায়গায় তাঁদের গভীর মিল ছিল। হিন্দুধর্মের আচারপন্থী শুচিবাইয়ের বিরোধী ছিলেন দু'জনেই। "শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে'তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাঁর মন্তব্য গল্পে। প্রফুল্লচন্দ্র আচারের বিরুদ্ধে অভিযান করতেন আমাদের শাস্ত্র ঘেঁটে দেখিয়ে যে, আমাদের মুনি-ঋষিরা ধর্ম ও আচারকে গুলিয়ে ফেলতেন না—তাঁরা যথার্থ জ্ঞানী ছিলেন বলেই।" স্যর দিলীপকেই প্রথম বলেন, সত্যকাম ও জাবালীর কথা। বলতে বলতে স্যর সেদিন 'উজিয়ে' উঠেছিলেন। বলেছিলেন, "এই জন্যেই মহাভারত রামায়ণ উপনিষদ পড়তে আমার মন এত খুশী হয়ে ওঠে, দিলীপ! আমরা প্রায়ই বলি, 'We are proud of our ancestors', আমার মনে প্রশ্ন জাগে, 'But are they proud of us, their worthy successors?'—ফেরার পথে শরৎচন্দ্র বিমুগ্ধ চিত্তে দিলীপকে বলেছিলেন, "না দেখলে বিশ্বাস হয় না মণ্টু! ঠিক যেন ষাট বছরের শিশু! কি বল তুমি? কিন্তু শুধু শিশু-সারল্যই বা বলি কেন? তাঁর গুণ কি একটা? গুণাকর উপাধি দিতে হয় তাঁকে?"

সেবার খদ্দর কনফারেন্স হচ্ছে কটকে। সঙ্গে দিলীপও আছেন। স্যর তখন গান্ধীজির চরকা নিয়ে মেতে উঠেছেন। কটকে 'খদ্দর প্রচারিণী সভা'র প্রেসিডেণ্ট তিনি। মস্ত বড় বাড়ীতে হাসিঠাট্টায় সকলের দিন কাটত। সে সময়কার স্যরের কথায় দিলীপ রায় লিখেছেন, "এমন সদানন্দ বৃদ্ধ

ক'জনই বা দেখেছি! শীর্ণকায় খেতে পারেন না কিছুই, কিন্তু কি উৎসাহ, প্রাণশক্তি, উচ্ছলতা! এই সূত্রে আরও চোখে পড়েছিল, সাধারণ মানুষকে তিনি কত সহজেই কাছে টানতে পারতেন! তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি ছিল গভীর, কিন্তু তিনি ভুলেও চাইতেন না তাদের ভক্তিভাজন হয়ে তাদের দূরে রাখতে। Standing on one's dignity বলতে যে মনোবৃত্তি বুঝায় স্যরের স্বভাব নিত্যই চলত তার উল্টো মুখে।" অতি দীনহীন বেশে বিনা প্রসাধনে যে আসত তার সঙ্গেই তিনি আলাপ জুড়ে দিতেন, যেন কতকালের চেনা। দিলীপ বলেছেন, "স্যর জগদীশচন্দ্র ছিলেন যেমন গভীরাত্মা, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তেমনি প্রফুল্লাত্মা। নামটি তাঁকে মানিয়েছিল বৈকি।"

দিলীপ কুমার প্রধানতঃ তাঁর দুটি স্ববিরোধী রূপ দেখে অবাক হয়ে যেতেন,—একদিকে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রবীণ জ্ঞান—যা ধরেন, আঁকড়ে ধরেন তাঁর চির তরুণ উৎসাহের প্রতি তন্তু দিয়ে; অন্যদিকে আত্মভোলা ভোলা-মহেশ্বর, দিল-খোলা, অনাসক্ত—সত্যই ষাট বছরের শিশু! প্রসঙ্গক্রমে দিলীপ কুমার গল্পচ্ছলে তাঁর স্যর-এর আত্মভোলা সদানন্দ চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরই ভাষায় তা উদ্ধৃত করছি। "মনে পড়ে ২০ না ২১ সনে স্যরের সঙ্গে লণ্ডনে হল্যাণ্ড রোডে একটি বাসায় একসঙ্গে থাকা। স্নু নামে তাঁর একটি ছাত্র তাঁর তদারক করত। সে প্রায়ই স্যরের 'নানা কাণ্ড-কারখানা'র কথা বলতে বলতে হেসে কুটি কুটি হ'ত। এখানে কেবল একটি কাণ্ডের কথা বলি। স্নু বলল—জানেন দিলীপবাবু, আজ সকালে এক টুপির দোকানে টুপি কিনতে গিয়ে স্যরের সে কি কাণ্ড! স্যর তো জানেনই, প্রায়ই ছাতাটি বগলে করে পথ চলেন, তাই টুপির দোকানে উনিও চলেছেন, বগলদাবায় ছাতাও চলেছে Parallel to the floor! কাজেই আশ্চর্য কি যে ওঁর ছাতার সামনের বাঁটের দিকটার ধাক্কায় হঠাৎ দমাস্ শব্দে এক গঙ্গা টুপি মাটিতে লুটাবে ছত্রাকার হয়ে? ওরা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতেই স্যর চমকে লাফিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াতেই এবার ছাতার তলার দিককার গোড়ালির ধাক্কায় আর একটি আলনা তুমুল শব্দে ছড়িয়ে পড়ল। মেজেটা হয়ে দাঁড়াল একেবারে টুপির সমুদ্র! হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড! দোকানীরা, খদ্দেররা, রাস্তার পথিকেরা—সবাই এল ছুটে। আমি তাদের ঠাণ্ডা করি—স্যর পি, সি, রায়, এফ, আর, এস ইত্যাদি বলে। একটার জায়গায় দুটি টুপি কিনতে হল—একটি আমার জন্যে—আমার দরকার না থাকলেও। তখন একটা স্থূলকায়া দিদিমা বললেন গভীর স্নেহে: 'Funny old child! Why does he carry his umbrella like that—inside a shop?' থেমে স্নু আর্দ্র কণ্ঠে বলেঃ সত্যি দিলীপবাবু, স্যরের সে ত্রস্ত মুখ-চোখ যদি দেখতেন মায়া হত আপনারও, মতে পড়ত মা যশোদার ভয়ে কৃষ্ণের সেই ভয়ে কাঁপা—চোখের জলে সেই বুক ভেসে যাওয়া আর কাজলের কালিতে সারা মুখে কালো ছাপ—আপনিই সে দিন স্যরের কাছে বর্ণনা করেছিলেন না?"

মেম দিদিমার 'funny old child' কথাটি স্যরের নানা কাণ্ডকারখানা দেখে প্রায়ই দিলীপের মনে পড়ত। তার একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত, "লণ্ডনে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, সেখানে ফি রবিবার

কয়েকজন ধার্মিক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী গিয়ে বসেন, উপাসনা ও গান হয়। একবার কি একটা উৎসবে লণ্ডনের ক্রমওয়েল ছাত্রাবাসের তদানীন্তন পরিদর্শক তথা হাই কমিশনার এন. সি. সেন মহোদয় আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন গান গাইতে। আমি তখন স্যর-এর সঙ্গে হল্যাণ্ড রোড-এর বাসায় ঘরকন্না করি। আমার ওপর ভার ছিল তাঁকে নিয়ে যাওয়ার। স্যর পারতপক্ষে কখনও ট্যাক্সি ডাকতেন না, কেউ ডাকতে সাহস করত না। কারণ, তিনি প্রায়ই আমাদের লেকচার দিতেন, লণ্ডনে এসে বিলাসে বাপের টাকা না উড়াতে। বলতেন প্রায়ই 'A penny saved is a penny gained,' কি বলো হে? অগত্যা আমি তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গুটি গুটি একটি ফুটপাতে দাঁড়িয়েছি—একটি বাস সেখানে এসে থামতেই আমি ঈষৎ উচ্চস্বরে বলে উঠেছিঃ 'সাবধান স্যর!' আর যাব কোথা? স্যর আমায় চাপা সুরে ভর্ৎসনা করলেন 'শ-শ'! এদিকে অত জোরে কথা বলে? স্যরকে নিয়ে বাসে উঠে বসেছি সবেমাত্র—এমন সময়ে এক ইংরেজ মহিলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে টুপি খুলে তাঁকে আমার জায়গা ছেড়ে দিতেই স্যর শিশুর মতনই আহ্লাদে আটখানা, বললেন তার-স্বরে, 'Thats right my boy, chivalry, chivalry!' সঙ্গে সঙ্গে বাসসুদ্ধ লোকের চোখ পড়ল তাঁর দিকে—দু'একটি মহিলা তো মুখে রুমাল দিয়ে হেসে কুটি কুটি! কিন্তু স্যর-এর ভ্রূক্ষেপও নেই—সবাই চেয়ে থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার-স্বরেই সমানে গল্প করে চললেন—তিনি বসে আর আমি দাঁড়িয়ে।...আজও চোখের সামনে ভাসে তাঁর সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ গলাবন্ধ কোট, খাঁজহীন ধূসর রঙের ঝোলা পেণ্টুলুন—আর মাঝে মাঝে টুপি খুলে উস্কো-খুস্কো চুলের মধ্যে অন্যমনস্ক হাত চালানো। মায়া হয় সত্যই! সে কি ভুলবার!"

সু-র কাছে আরো কয়েকটি এই জাতীয় হাসির কীর্তি-কলাপ শুনেছিলেন দিলীপ কুমার। একবার লণ্ডনে একটা বড় হোটেলে বৈজ্ঞানিকেরা আচার্য রায়কে একটা ডিনার দিয়ে সম্মান দেখাবার জন্য জুটেছিলেন। ডিনারের টেবিলে সবাই বসে, কিন্তু যাঁর জন্য ডিনার সেই মাননীয় অতিথিটি অদৃশ্য! তবু সু তার স্যরকে ভাল করেই চিনত। সে নক্ষত্রবেগে বাথরুমের দিকে ছুটতেই শুনতে পেল তাঁর কণ্ঠঃ "আঃ কি জ্বালায়ই পড়েছি—দোর বন্ধ হয় কিন্তু আর খোলে না ছাই!" ঐ হোটেলের স্নানাগারে ঢুকে আর বেরুতে পারছিলেন না। এ গল্প শুনে কার না হাসি পায়। দিলীপ রায়-এর জের টেনে বলেছেন, "কিন্তু এমন ছাত্র কেউ ছিল না লণ্ডনে, এসব কাহিনী শুনে যার মন ভিজে না উঠত,—এ অসামান্য কর্ম-জ্ঞান-দানবীরের একান্ত নিঃসঙ্গতা তথা নাবালক নিঃসহায়তার কথা ভেবে। মহৎ মানুষ প্রায় সবাই নিঃসঙ্গ নিসাথী। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে অকারণ লেখেননি : 'He who is too great must lonely live.' প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন না কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্টের মতন বাণীবহ অতিমানব, ছিলেন না সক্রেটিশ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতন লোকোত্তর প্রতিভাধর, ছিলেন না নিউটন গ্যালিলিও আইনস্টাইনের মত যুগপ্রবর্তক বৈজ্ঞানিক। কিন্তু মানুষ কী হয়ে ওঠেনি বা দিতে পারেনি তার বিচারে তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না—সেকি হয়ে উঠেছে বা দিতে পেরেছে সেই নিকষেই

তাকে কষতে হবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শুধু শিক্ষকের, আচার্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়—সব জড়িয়ে তিনি এমন একটি আশ্চর্য আদর্শবাদী রূপে ফুটেছিলেন, এত গুণের সমাবেশে তাঁর মহান চরিত্র মঞ্জুল তথা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়—ইংরেজ কবির ভাষায়—'to be loved he needs only to be seen !' তাইত তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র ভারতে একটি বরেণ্য মনীষী, প্রেমিক, দানবীর তথা সংসারী-সন্ন্যাসী বলে গণ্য হয়েছিলেন।"

অপূর্ব প্রেমের সন্ন্যাসী ! "জ্ঞানের সঙ্গে দানের রাজযোটক তথা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—Make of thy way a daily pilgrimage তোমার জীবন হোক প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রাব্রত।"

অপূর্ব আত্মভোলা এই ভোলানাথকে ভুলব কি করে !

প্রবন্ধটি দিলীপকুমার রায় রচিত "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র" (স্মৃতিচারণ) লেখাটি অবলম্বনে রচিত। লেখাটি 'প্রবাসী'-তে (১৩৬৮, ভাদ্র) প্রকাশিত হয়।

"স্বর্গ নেই, মোক্ষ নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই, জাতিধর্ম নেই, কর্মফল নেই। ত্রিবেদ, ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপন—এসব বুদ্ধি ও পৌরুষহীন কিছু মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র।...ত্রিবেদের রচয়িতা ছিলেন ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর। পুরোহিতদের সমস্ত হাজর-বাজর সম্পূর্ণ অর্থহীন শব্দমাত্র।"

[মাধবাচার্যকৃত **সর্বদর্শন সংগ্রহ** গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে সংগৃহীত]

"চতুর লোকের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে আছে—যজ্ঞ কর, দান কর, ত্যাগ কর, তপস্যা কর ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য কেবল জনসাধারণকে বশীভূত করা। অতএব রাম, তোমার এই বুদ্ধি হোক যে পরলোক নেই। যা প্রত্যক্ষ তার জন্যই উদ্‌যোগী হও, যা পরোক্ষ তা পরিহার কর। তুমি সর্বসম্মত সদ্‌যুক্তি অনুসারে ভরতের সমর্পিত রাজ্য গ্রহণ কর।"

[ভরতের অনুরোধ সত্ত্বেও অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক রামচন্দ্রকে প্রদত্ত জাবালির উপদেশ]

জন্মভূমির মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র

অমূল্য মুখোপাধ্যায়

আচার্যদেবের বাল্য শিক্ষক ছিলেন আমার মাতামহ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহত্তর জীবনে পদার্পণ করেও প্রফুল্লচন্দ্র যখনই গিয়েছেন আপন পল্লীতে তখন আমার বিধবা মাতামহীকে প্রণাম করতে আসতেন আমাদের বাড়ীতে। তাই, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাদের অন্তর্লোকের এক সমুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

আপন জন্মভূমি পল্লীটির সঙ্গে ছিল তাঁর এক নিবিড় সৌহার্দ্য। আপন আত্মজীবনীতে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। তাই মৃত্যুর বৎসরটি ভিন্ন তিনি বছরের অন্ততঃ একটি মাস বৃহত্তর কর্মজীবন, মহত্তর সাধনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আপন পল্লীর সহজ সাধারণ মানুষ, শ্যামল প্রকৃতি আর বাল্যের সুমধুর স্মৃতির প্রীতিরসে নিজেকে নিমগ্ন করে দিতেন।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালাভের কালেই আমরা তাঁর কাছ থেকে উপহার পেতাম 'মুকুল' নামক তাৎকালিক মাসিক পত্রিকা। পল্লীবাসের সময় তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন বহু সংখ্যক 'মুকুল'। তারপর আরো বড় হয়ে আমরা যখন মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র তখন গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁর আপন বাস ভবনের বৈঠকখানায় আমাদের যেতে হত দুপুর বেলায়। স্কুল মাষ্টারের মত তিনি ইংরাজী তর্জমা, সারাংশ-লিখন ইত্যাদির পাঠ দিতেন। সেখানে বসে সেগুলির উত্তর লিখে দেখাতে হত তাঁকে। তিনি নিজে সযত্নে প্রতিটি পাঠ দিতেন সংশোধন ক'রে। আমাদের পাঠ দিয়ে তিনি নিজের পড়াশুনা করতেন। আর মাঝে মাঝে নিজের ঘরের দরজা সন্তর্পণে খুলে দেখতেন আমরা গল্প করছি, কিংবা ঘুমুচ্ছি কি-না। এমনিভাবে দেশচিন্তা কিংবা বিজ্ঞান-গবেষণার অত্যুচ্চলোক থেকে নীচে নেমে এসে তিনি ব্যক্তিগত উৎসাহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিক্ষাপ্রসারে সদা নিরত ছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে এরই মাঝ থেকে তিনি তাঁর গবেষক-ছাত্রদের সাহায্য ও নির্দেশ নিয়মিত পাঠিয়ে দিতেন। এই দুই কোটি মানুষের মধ্যে তিনি এক সহজ সামঞ্জস্য গড়ে তুলেছিলেন।

পল্লীবাস কালে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়েরা তাঁদের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন তাঁর কাছে। তিনি ছাত্রদের পরীক্ষা নিতেন। নিকটবর্তী বড় বড় প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে তিনি নিজেই যেতেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর পল্লীবাসকালের প্রায় Private Secretary শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয়। পণ্ডিত মশাইরা সকলেই তাঁর কাছ

থেকে সাময়িক বৃত্তি পেতেন। এরূপ অধিকাংশ বিদ্যালয়কে তিনি নিয়মিত মাসিক সাহায্য দিতেন।

১৯০৩ সালে যখন গ্রামের 'মাইনর' বিদ্যালয়টি তাঁরই পিতৃ-নাম-লাঞ্ছিত হয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় তখন থেকে ১৯২১ সালে বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরই বহির্বাটির ঘরগুলিতে বিদ্যালয় বসত। প্রতি বছর ১৫ই জুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসবে তিনি প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। সারাদিনের উৎসব, পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদির পর বিকালে তাঁরই বাসভবনের দোতলার ছাদে বসত সমস্ত ছাত্র ও বহু অভিভাবকের সম্মিলিত পঙ্‌ক্তি ভোজন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁরই খরচে এই পঙ্‌ক্তি ভোজনের আয়োজন। তিনি নিজে ঘুরে ঘুরে দেখতেন এই খাওয়া। এসম্বন্ধে ছোটবেলায় মনে তেমন কোন রেখাপাত করেনি। পরে বড় হয়ে বুঝেছিলাম সমাজের দুষ্টক্ষত 'জাতিভেদের বিষ' যাতে ছেলেবেলা থেকে লোকের মন হ'তে দূর হয়ে যায় এবং এরূপ একটা কুসংস্কার যাতে মনের মধ্যে বাসা না বাঁধে সেইজন্যই তিনি বহুদিন থেকে নিজের গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবর্তন করেছিলেন। বাস্তবিক পরবর্তীকালে গান্ধীজীর জাতি-ভেদবিরোধী আন্দোলনের সময়ে অন্যান্য স্থানের চেয়ে তাঁর জন্মভূমির লোকের মধ্যে অনেক বেশী সংস্কারমুক্ত মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আপন জন্ম-পল্লী অঞ্চলের শিক্ষাপ্রসার, দুঃস্থ সেবা ইত্যাদিতে তাঁর এই অনলস প্রয়াসই ১৯১৮ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালের তাঁর ১০,০০০ টাকা অংশে (বর্তমানে ২০,০০০ টাকা গঠিত Joint Stock Company আইনে রেজেষ্ট্রীকৃত) রাড়ুলি-কাটীপাড়া-বাঁকা-খেঁশরা শিক্ষা পরিষদ এ রূপ লাভ করে। বাৎসরিক লভ্যাংশ প্রায় তিন হাজারের মত টাকা আজও দুঃস্থ ছাত্র, বিধবা, অসহায় লোক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করা হয়।

রাড়ুলি বাসকালের এই মাসটি এ অঞ্চলে আনন্দ-উৎসবে ভরপুর হয়ে থাকত। তিনি যেন আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিটি মানুষেরই আপনার জন ও বন্ধু। পল্লীবাসী মানুষের জন্য তিনি প্রথমদিকে নিয়ে যেতেন ছোটদের জন্য লজেন্স আর বড়দের জন্যে ছোট ছোট শিশিতে এসেন্স। পরের দিকে তাঁর সাথে যেত বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরী প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সিরাপ। শত শত পল্লীবাসী তাঁর প্রীতির অর্ঘস্বরূপ বোতলভরা সিরাপ উপহার পেত। এমনিভাবে 'মে' থেকে 'জুন' একটি মাস কাটিয়ে তিনি পান্‌সি নৌকোয় (পরে ষ্টীমারে) বাসকের পাতা, কালমেঘের পাতা, জামের বীচি, আর গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর দেওয়া কাসুন্দি সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিতেন কলকাতায়। এই জামের বীচিগুলি তিনি সংগ্রহ করতেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে যারা সকালে বিকেলে দলে দলে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ত। তাদের খুব উৎসাহিত করতেন জাম খেতে আর বীচিগুলি তাঁর ছাদে উপস্থিত করতে। কপোতাক্ষ তীরবর্তী তাঁর এই জন্ম-পল্লীর প্রতি তাঁর হৃদয়ের যে কি নিবিড় অনুরাগ ছিল তা বার বার আমরা উপলব্ধি করেছি। প্রতিবারই পল্লীবাসের দিনগুলি কাটিয়ে যেদিন কলকাতায় ফিরতেন সেদিন বিদায় বেলায় তিনি এক গভীর বিষাদে মগ্ন হয়ে যেতেন। বাক্ রুদ্ধ হয়ে যেত। চক্ষু হয়ে উঠত সজল।

বাইরের দিক থেকে যে মানুষটিকে বিজ্ঞানী-সুলভ নৈর্ব্যক্তিক কঠোর বলে অনেকের ধারণা হ'ত তাঁরই মাতৃকল্প স্নেহের উৎসাহ আমাকে বারে বারে অভিভূত করে ফেলেছে। ১৯২০ সালের কথা। গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে সত্ত-প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল কলেজে আমি পড়ে আছি। বাঁচবার আশা প্রায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একদিন বিকেলে দেখি ছু'তিনটি ছাত্র সঙ্গে নিয়ে আচার্যদেব আমার কেবিনে উপস্থিত। তিনি তখন ঐ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য। আমার সমস্ত অবস্থা তিনি খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন এবং অনেকগুলি উপদেশ দিলেন। ছু'দিন পরে এক ছাত্রকে দিয়ে তিনি তাঁর নিজের Primus Stoveটি এবং একটি Aluminium এর কড়াই পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন আমি যেন ছুধটা গরম করে খাই। সংসারী না হয়েও অভাবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এমনি সাংসারিক খুঁটিনাটির প্রতি অতন্দ্র-দৃষ্টি তাঁর বিরাট হৃদয়বত্তারই পরিচায়ক।

দেশের প্রতিটি মানুষকে তিনি আপন পরিবার-ভুক্ত মানুষের মতো ভালবাসতেন। তাদের ছুঃখ-ছুর্দশা মোচনে সাহায্য করতেন। আবার আমাদের অহেতুক আবদারও রক্ষা করতেন।

তাঁর সংস্পর্শে আসার বিশেষ সুযোগ ঘটেছিল আমার খুলনা ছুর্ভিক্ষের সময়। সে সময়ে তাঁর নেতৃত্বে আর্তত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমরা। সে সময় তাঁর যে মূর্তি দেখেছি তা জীবনে ভুলবার নয়। মানুষের ছুর্দশা দেখে মানুষ যে নিজেকে ভুলে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারে তাঁকে দেখে এই সময় তা বুঝতে পেরেছি। আমাদের তিনি বলতেন, আজ সাময়িকভাবে তারা ছুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে বলে কখনও এভাবে সাহায্য করবে না যাতে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অনেক সময় খুব গোপনে গ্রহীতাও যেন জানতে না পারে কারা দিচ্ছে। এমনভাবে সাহায্য বিতরণ করতে হয়েছে। একবারের কথা মনে পড়ে। সেবার আমাদের বললেন, রাড়ুলি-ভাটপাড়া-বুরহানপুর অঞ্চলের ছুর্দশাগ্রস্তদের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে। তালিকা করে আমরা তাঁকে দিলাম। ঐ তালিকার মধ্যে প্রত্যেকের পোষ্যের সংখ্যাও সঠিকভাবে লিখে দিতে হয়েছিল। এক রাত্রিতে খেতে যাবার সময় একটা কাপড়ের গাঁট দেখিয়ে বললেন যে, এই কাপড়ের গাঁট খুলে কাপড়গুলি নিয়ে রাত ১২টা থেকে তালিকাভুক্ত প্রতিটি বাড়ীতে কাপড় দিয়ে আসতে হবে। জানালা খোলা থাকলে তার মধ্য দিয়েই ঘরে ফেলে দিতে হবে। নইলে ঘরের চালের সঙ্গে ঐ সব কাপড় বেঁধে রেখে আসতে হবে। গৃহস্থ যেন জানতে না পারে যে, তাকে দান গ্রহণ করতে হচ্ছে; তাহলে সে তা কিছুতেই নেবে না। আমরা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে সেই বর্ষার কাদার মধ্যে রাত চারটে পর্যন্ত সেই কাপড় বিলি করি, যা পরদিন সকালের পূর্ব পর্যন্ত কোন গৃহস্থ জানতে পারেনি।

দেশবাসীর ছুর্দশা মোচনে তাঁর ছিল যেমন অতন্দ্র সাধনা, তেমনিভাবে দেশকে পরাধীনতা মুক্ত করার জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল নিরবচ্ছিন্ন। অবশ্য কোন কোন সময় তা প্রকাশ্য হলেও, অধিকাংশ

ক্ষেত্রে তা ছিল অন্তরালবর্তী। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে যাঁরা সামান্যতম অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন— উৎসাহিত করতেন সব সময়। প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন 'রাউলাট এ্যাক্ট' পাশ হওয়ার পর। সেদিন টাউন হলে ঐ পীড়নমূলক আইনের প্রতিবাদ সভা ছিল। হঠাৎ শোনা গেল, পশ্চিম দিককার সিঁড়ির ওপরের ধাপ থেকে এক শীর্ণকায় শ্মশ্রুগুম্ফধারী ব্যক্তি বলছেন, "আজ ভারতমাতাকে যে নূতন শৃংখলে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে আর তাঁর সন্তানদের উপর যে নূতন জুলুমবাজী এসেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমার মত একজন বৈজ্ঞানিককেও গবেষণাগারের Test tube ছেড়ে আসবার প্রয়োজন হয়েছে।" ইনিই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার রাজনৈতিক নেতারা যখন কারারুদ্ধ তখন বেলগাঁও কংগ্রেসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তীদেবীর অনুরোধে তিনিই বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৬ সালে রাড়ুলিতে অনুষ্ঠিত খুলনা জেলা সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন তিনি। ১৯২৮ সালে খুলনা শহরে জেলা সম্মেলনের ও অভ্যর্থনা সমিতির তিনিই সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৪ সালে খুলনা সম্মিলনীর কুমিরা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তিনি। আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন নিত্য প্রবাহিত ছিল। জানা যায় হিংসাত্মক বিপ্লববাদী-দেরও তিনি বহু অর্থ সাহায্য অতি গোপনে করতেন। সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ অংশগ্রহণ না করলেও তদানীন্তন কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সমাজ সেবামূলক কাজে তিনি নিজেকে জড়িত করেছিলেন। তারই পরিণতিতে তাঁরই Trust Fund-এর টাকায় খাদি প্রতিষ্ঠানের জন্ম।

১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমাকে গ্রেপ্তার করে জেলের মধ্যেই বিচারের সময় S.D.O. আমাকে জানালেন যে, আমার নামে ২০০ টাকার একটি মণি অর্ডার এসেছে। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে শুনলাম, খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশ দাসগুপ্তের ভাই শ্রীক্ষিতীশ দাসগুপ্ত ঐ টাকা পাঠিয়েছিলেন। পরে জেনেছি, আচার্যদেবই তাঁকে দিয়ে সত্যাগ্রহীদের খরচের জন্য ঐ টাকা পাঠিয়েছেন। জেল থেকে বেরোবার পর খুলনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে বিদেশী বয়কটের ভার পড়ে আমার ওপর। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে নৌকায় করে ঘুরে বেড়াতে হ'ত বড় বড় হাটে। এ ব্যাপারে বহু টাকার দরকার হ'ত। এ কাজের জন্য যে টাকা ঘাটতি হ'ত তা তিনি গোপনে আমাকে দিতেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে ঘর থেকে সবাইকে চলে যেতে বলতেন ও ঘরে খিল দিয়ে কাপড়ের খুঁট খুলে টাকা বের করে দিতেন। সেই সঙ্গে বহু নির্দেশ দিতেন। নাম প্রকাশ করার দরকার নেই। বিজ্ঞান কলেজেও আমার পরিচিত অনেক কর্মীকে টাকা দিতে ও গোপনে পরামর্শ করতে দেখেছি।

এমনিভাবে দিনে দিনে বহুতর সূত্রে আমাদের সমগ্র সত্তা জড়িত হয়ে গিয়েছিল তাঁকে কেন্দ্র করে। আমাদের হৃদয় ভরে উঠেছিল তাঁর প্রীতির স্পর্শে। আমাদের চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়েছিল তাঁর

প্রেরণায়। জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর পূর্ব বৎসরটিতে আমরা শেষবারের মত তাঁকে বরণ করেছিলাম তাঁর জন্মভূমিতে তাঁর বাড়ীতে। তাঁর ব্যাকুলতায় আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমরা আয়োজন করেছিলাম আচার্য বরণের। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডাঃ বি. সি. গুহ প্রভৃতি অসংখ্য ছাত্র ও গুণমুগ্ধ পরিবৃত হয়ে সেই শেষবারের মত বহু স্মৃতি পুষ্ট আপন জন্মভূমির বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

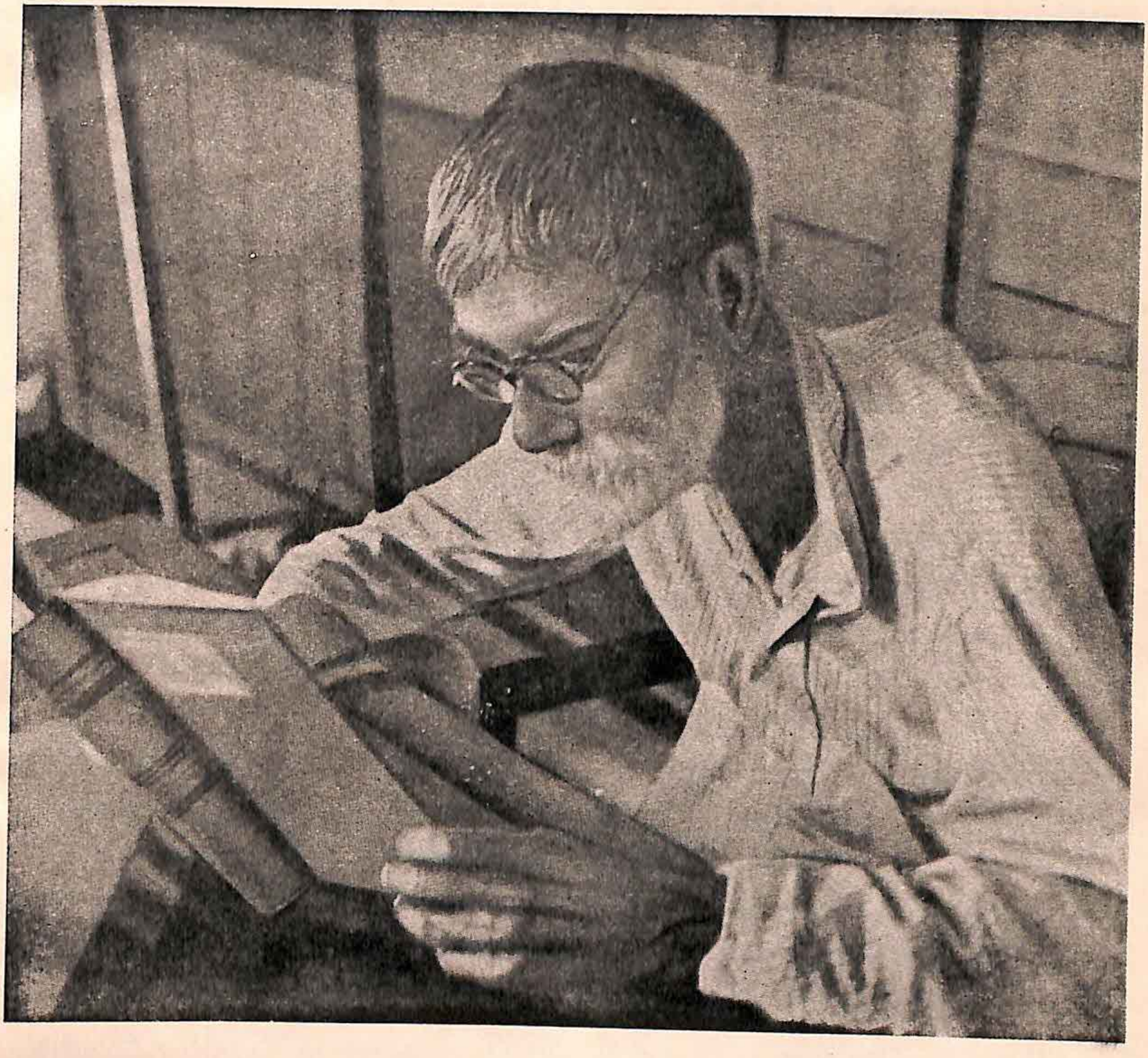
[প্রবন্ধটি খুলনা সম্মিলনীর উদ্যোগে শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন সমিতির সৌজন্যে 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম-শতপূর্তি স্মারক গ্রন্থ' হইতে সংকলিত]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিন্তার আলোকে

একটি উপলব্ধি

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিবাহে যৌতুক প্রদান, অনুষ্ঠানে বস্তু-উপহার গ্রহণ, সাম্প্রদায়িকতা, পর্দাপ্রথা, অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অলৌকিক শক্তিতে মিথ্যা আস্থা, জ্যোতিষ নির্ভরতা, যাবতীয় প্রথাগত, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার আমাদের বোধশক্তিকে পঙ্গু করে, বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ করে, কল্পনাশক্তিকে ক্ষীণ করে, আত্মবিশ্বাসকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে, সর্বোপরি বিজ্ঞান মানসিকতা রুখে দিয়ে ধর্মের আফিমে নেশাগ্রস্ত করে ফেলে।

মজা এই যে, এসবের ধারাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছেলে-মেয়েরা পেয়ে থাকে। শিক্ষিত ও সচেতন পিতা-মাতার উচিত বিজ্ঞানের আলো ফেলে কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের এই কালো মেঘ সরিয়ে ফেলা তাঁদের সন্তানের মন থেকে। একটি মানব শিশু জন্মানর সময় দেব-দেবী, দেবদূত, ফেরেস্তায় কিংবা ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোয় বিশ্বাস নিয়ে জন্মায় না। পরবর্তীকালে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কথাবার্তা ও গল্প, শিশুপাঠ্য বই, স্কুলপাঠ্য বইতে এইসব মিথ্যে ধারণা সম্পর্কে পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ নানা চিন্তা শিশুর মনে ঢোকান হয়। সন্তানের ওপর নিজের ধর্মবিশ্বাস আর সংস্কার না চাপিয়ে পুরোপুরি মুক্তচিন্তা আর মুক্তমনের মানুষ হিসেবে তাদের গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া উচিত। সন্তানের হাত ধরে ধর্মস্থানে নয়, পাঠাগারে নিয়ে যাওয়া দরকার। [জনৈক অনুরাগী]



॥ সেক্সপীয়রের রচনা পাঠরত অবস্থায় আচার্যদেব (১৯১৬) ॥

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মরণে

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। বৈশাখ মাসে আচার্যদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য হয়। পূজনীয় শিক্ষক বিপিনবিহারী চক্রবর্তী আমাকে আচার্যদেবের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন জমিদার। প্রতি বৎসর ধুমধামের সহিত তুর্গোৎসব ও দানধ্যান করিতেন। ঐ সময় চার পাঁচ দিন ধরিয়া যাত্রা গানের আসর বসিত। প্রকৃতপক্ষে ঐ কদিন স্থানটি মেলার আকার ধারণ করিত। প্রফুল্লচন্দ্র তখন কিশোর। তিনি ঐ বয়সেই গ্রামের গরীব লোকজনদের মূলধন দিয়া সেই মেলায় পানবিড়ির দোকান দেওয়াইতেন। এই মূলধনের বিনিময়ে তিনি লভ্যাংশ আদায় করিতেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না তথাপি এই লভ্যাংশ আদায়ের মধ্যে যে বিশেষ রূপটি আমরা পাই তাহাই পরবর্তী জীবনে তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ীর সংলগ্ন নদীতীরে প্রচুর জমি ছিল। ছেলেবেলা হইতে চাষ আবাদে তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। একটি মাত্র লোককে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বীয় শ্রমে ঐ জমিতে একটি সুন্দর নারিকেল বাগান করেন। প্রফুল্লচন্দ্র যখন কলিকাতায় পড়াশুনা করিতেন তখন বন্ধের সময় বাড়ীতেই যাইতেন। প্রতি বন্ধেই তিনি বাড়ীতে ঋতুপযোগী কিছু কিছু কৃষিকার্য করিতেন। হলুদ চাষ তিনি প্রতি বছরই করিতেন। কেবল চাষ! সেই হলুদ নিজেই তুলিয়া সিদ্ধ করাইয়া শুকাইয়া নিজেই নিকটবর্তী বিখ্যাত গঞ্জ বড়দলের হাটে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেন। বিজ্ঞান কলেজ ভবনে বসবাসকালে একবার তিনি আমাকে ও রাসবিহারী দাসকে একদিন তু'খানা কোদাল আনিয়া দিয়া কলেজের খোলা জমি কোপাইতে বলিলেন। তিনি ওখানে আমাদের দিয়া অনেক কপি, বেগুন প্রভৃতি উৎপন্ন করেন। এই ক্ষেতে তিনি স্বহস্তে কাজ করিতেন। তখনকার উৎপন্ন তরিতরকারি আমরা তো খাইতামই, কত যে প্রতিবেশী ও বন্ধুজনদের বিতরণ করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এফ. এ. পাশ করিবার পর প্রফুল্লচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়াশুনা কিছুকাল বন্ধ রাখেন। এই সময় তিনি গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া জার্মান, লাটিন, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময়ে তিনি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ পান।

প্রফুল্লচন্দ্র জাতিভেদকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন। বাল্যকাল হইতেই আমরা তাহা

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। পরবর্তীকালে যখন তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন স্বগ্রামে যাইবার সময় প্রচুর পরিমাণে সিরাপ সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং সে-সমস্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। গ্রামের প্রায় সকল বাড়ীতেই তাঁর যাতায়াত ছিল। ছেলে মেয়ে কর্তা গিন্নী সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। এমনও দেখিয়াছি যে গরীব গৃহস্থের দাওয়ায় তালপাতা বা খেজুর পাতার পাটিতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে সকলের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন সমাজ খুবই গোঁড়া ছিল অথচ ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদের একদিন তিনি তাঁহাদের ছাদের উপর বসাইয়া পংক্তি ভোজন করাইলেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকেই সেখানে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

আচার্যদেবের নিয়মিত নৌকা ভ্রমণের বাতিক ছিল। প্রতিদিন অপরাহ্নে কপোতাক্ষ নদীতে নৌকা ভ্রমণে বাহির হইতেন। একদিন ত শালকিয়া নামক স্থানে কালবৈশাখীর ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া যায়। অনাথ নাথ রায় নামক একজন বলিষ্ঠ যুবক তাঁহার পা ধরিয়া কোনক্রমে টানিয়া তোলেন। নৌকা ভ্রমণের পর ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কাটাইতেন। গ্রামের ছেলেদের গান শুনিতে ভালবাসিতেন। বিমলচন্দ্র ঘোষের গাওয়া রজনীকান্ত সেনের গান তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।

ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য তাঁহার দানের কথা সুবিদিত। কিন্তু সে দান কি বিপুল এবং কি অপরিসীম আত্মত্যাগের পর প্রতিষ্ঠিত তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই এই সময়ে। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক। এখানে যে বেতন পাইতেন তাহা হইতে নিজের ও আশ্রিত ছাত্রদের জন্য যৎসামান্য রাখিয়া বাকী সমস্তই দান করিতেন। কলেজের সেসন আরম্ভ হইবার পর ছাত্রদের নিকট খোঁজখবর লইয়া কাহার কি প্রয়োজন জানিয়া লইতেন। সারা বৎসর আর কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করিতেন না অথচ সাহায্য নিয়মিতভাবে দিয়া যাইতেন।

মেহেরকাহার নামে একজন সজ্জন মুসলমান ছিলেন আমাদের গ্রামে। কাঁধে পাল্কী বহন করিয়া তিনি প্রায় পাঁচ হাজার টাকা জমাইয়াছিলেন। আচার্যদেবের আচার, আচরণ ও বেশ-ভূষা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বহুকালের সঞ্চিত ঐ টাকা গরীব ছাত্রদের পড়াশুনার সাহায্যের জন্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দেন। ঐ টাকায় তিনি মেহের ফাণ্ড নামে একটি সাহায্য ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিলেন।

এই সময় খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে নূতন নূতন স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতে থাকে। বাগেরহাট কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আচার্যদেবের গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ-তালিকাও বাড়িয়া যায়। দৌলতপুর কলেজ খুলনা শহর রূপসা পার হইয়া কর্ণপুর, বাহিরদিয়া, কাড়াপাড়া, গোয়ালমাঠ ও অন্যান্য স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া বাগেরহাট কলেজে যাইতেন। বাগেরহাটে তিনি দশানীর চন্দ্রকান্ত দাসের বাড়ীতে থাকিতেন। ১৫ই জুন আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে যোগদান করিয়া তাহার পরই আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রত্যহ বৈকালে আমাকে কিংবা অন্য আর একজন কাহাকেও সঙ্গে লইয়া আচার্যদেব ময়দানে ভ্রমণে যাইতেন। ময়দানের ক্লাবে জমিদার সত্যানন্দ বসু, জবাকুসুম তৈলের মালিক কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু প্রমুখ আরো কয়েকজন নিয়মিত যাইতেন। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত যুদ্ধের সান্ধ্য খবর হুবহু সেখানে বলিতেন। আচার্যদেব তাহাকে দেখা মাত্রই বলিয়া উঠিতেন "এই যে গেজেট আসিয়াছে এখন-খবর কি বল।" এখানে হাসি ঠাট্টা ছাড়া বহু গুরুতর বিষয়েও আলোচনা হইত।

১৯১৬ সালে আমরা বিজ্ঞান কলেজে বাস করিতে আসি। বন্ধুবর শ্রীরাসবিহারী দাস এই সময় কলেজে পড়িতে আসেন। তিনিও আচার্যদেবের কাছে থাকিয়া যান। আমরা কয়েকজন একসঙ্গে থাকিতাম। আমাদের পাশের ঘরে ছিলেন ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরবর্তীকালের জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ। ইহারা সকলেই তখন আচার্যদেবের ছাত্র।

এই সময় তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেরূপ দেখিয়াছি সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলি।

প্রত্যহ ভোরে পাঁচটায় তিনি ঘুম হইতে উঠিতেন। প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বিজ্ঞান কলেজের ছাদের উপর একটু বেড়াইতেন। হাতে একখানি মামুলি লাঠি থাকিত। ঠিক সাতটায় কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাখন দেওয়া চারিখানা টোষ্ট, একপোয়া দুধ, সামান্য চায়ের সহিত একটি ডিম। এই ছিল সকালের আহার। ইহার পরই পড়িতে বসিতেন। নয় ঘটিকায় নীচে ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে যাইতেন। একটায় ফিরিয়া আসিয়া ইকমিক কুকারে সিদ্ধ দুই চামচ ভাত, দুই চামচ ডাল, সামান্য তরকারী, একটি বাটা মাছ বা মোরলা মাছের ঝোল ও একটু ঘরপাতা দই খাইতেন। কোন কোন দিন নিজ হাতে তৈরী সরবৎ (পুরাতন তেঁতুল মেশানো জলে চিনি মিশাইয়া) খাইতেন। পাঁচটায় ভ্রমণে বাহির হইতেন। রাত্রি দশটায় ফিরিয়া আহার ছিল তরকারী, ডালের জল ও সামান্য মিষ্টি। মিষ্টির মধ্যে আবার প্রিয় ছিল—বুঁদে। যতদিন পর্যন্ত সামর্থ্য ছিল ততদিন নিজের কাজ অন্যকে করিতে দিতেন না। একদিকে যেমন প্রচুর পরিমাণে দান করিতেন অন্যদিকে অমিতব্যয়ের উপর কড়া নজর ছিল। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি কখনও ধোপার বাড়ী দেওয়া পছন্দ করিতেন না। একটি দেশলাই-এর কাঠি যদি কখনও কেহ নষ্ট করিয়াছে দেখিয়াছেন অমনি বলিতেন "তোর মত ওয়ার্থলেস বাংলাদেশে নেই।" ছাত্রজীবনে আচার্যদেবের সহিত বহুস্থান দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে। বিজ্ঞান কলেজে যখন ছিলাম দেশের ও দেশের বাইরের অনেক বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ্‌কে আচার্যদেবের নিকট আসিতে দেখিয়াছি।

আচার্যদেব ছিলেন শিশুর মত সরল। সর্বদাই ছিল গালভরা হাসি। ছাত্রদের গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি পাপকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু পাপীকে নহে। ১৯১৫ সনে বেঙ্গল কেমিক্যাল থাকাকালে সুরেন নামে একজন চাকর

ছিল। সে আচার্যদেবের খুব প্রিয় ছিল। একদিন ময়দানে ভ্রমণের পর বাসায় ফিরিয়া দেখি সুরেন আচার্যদেবের ইংলণ্ড হইতে আনিত মূল্যবান পকেট ঘড়িটি লইয়া উধাও হইয়াছে। আচার্যদেব ভুলক্রমে ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া যান নাই। আমরা যখন পুলিশে খবর দিবার জন্য বলিলাম তখন তিনি বলিলেন—আমারই দোষ হইয়াছে, ঘড়িটি ওভাবে রাখাতেই সুরেন প্রলুব্ধ হইয়া ঐ কাজ করিয়াছে। সুতরাং পুলিশে আর খবর দেওয়া হইল না। বলিলেন, ওয়েষ্ট এণ্ড কোং হইতে অল্প দামের একটি পকেট ঘড়ি কিনিয়া আনিলেই কাজ চলিয়া যাইবে।

একবার বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ও শিক্ষামন্ত্রী স্যার এম. ডি. সফি সায়ান্স কলেজ পরিদর্শনে আসেন। আচার্যদেব সম্বর্ধনা সভায় বলেন—"Viceroy is the greatest man in India no doubt but in one respect I am superior to him. Because he is attended upon by men in liveries but I am attended upon by D. Sc's and Ph. D's of London, Paris and Berlin, etc."

সায়ান্স কলেজ ল্যাবরেটরীতে ছাত্রদের শিক্ষাদান ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার কথা সকলেই জানেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল পটারিজ, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস প্রভৃতি বহু ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেন। একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমবিমুখ বাঙালীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বাঙালীর ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব এবং অবাঙালী সম্প্রদায়ের অন্যায় আর্থনীতিক আধিপত্য দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং হর্মিলার কোং-কে হটাইয়া দিয়া ঝিকরগাছা-কপিলমুনি ষ্টীমার চলাচল পথ দখল করিয়া লইয়াছিল।

১৯২১ সালে খুলনার তুর্ভিক্ষে এবং পর বৎসর উত্তরবঙ্গে বন্যার সময়ে তিনি রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া তুঃস্থ জনগণকে যেভাবে সেবা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সংগঠন নৈপুণ্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৯৪৪ সনেও তিনি যশোহর খুলনা সেবাসমিতি পুনর্গঠন করেন। তিনি যশোহর খুলনাবাসী তুঃস্থদের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি দিয়া যথোচিত সাহায্য করেন।

[প্রবন্ধটি খুলনা সম্মিলনীর উদ্যোগে শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন সমিতির সৌজন্যে 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্মশতপূর্তি স্মারক' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্তী

খুলনা জেলার ইতিহাস লিখিতে যাইয়া ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন ঃ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তোমার সন্তান।
দানবীর, জ্ঞানবীর, কে তাঁর সমান॥
উজ্জ্বল তোমার অঙ্ক তাঁহার প্রভায়।
বিজ্ঞান সাধনা তাঁর ধরাতলে গায়॥
দয়ার সাগর সেই বাঁচাইল প্রাণ।
দুর্ভিক্ষ পীড়িত তব ক্ষুধিত সন্তান॥

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আচার্যদেব রাড়ুলী মধ্য ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া পর বৎসর কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। এই সময় কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। এক বছর নষ্ট হয়। ১৮৭৬ সালে জুলাই মাসে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত এ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হ'ন। কেশবচন্দ্রের অনুজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী সেন তখন এই স্কুলের অধিনায়ক ছিলেন। এখান হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া ১৮০০ সালে মেট্রো-পলিটন ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ. এ. পাশ করেন। সেখানে বি. এ. পড়িবার সময় গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৭০০০ টাকা বৃত্তি পান (১৮৮২)। বাড়ীর কেহ জানিতেন না যে তিনি এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত সমাজের সভ্য ছিলেন। গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া তিনি বিলাতে যান। প্রথমে বি. এস-সি. এবং পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন। এদেশে আসিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করিবার পর তিনি সি. আই. ই. এবং নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। তবু তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। আড়ম্বর বা বিলাসিতা ছিল না। সামান্য একখানি ধুতি বা লুঙ্গি, ছোট একটা জামা এবং তাঁহার সমান লম্বা একগাছা ছড়ি লইয়া তিনি এখানে ওখানে ভ্রমণ করিতেন।

লোকে আদর্শের অনুকরণ করে। আমাদের সম্মুখে তিনি বিরাট জীবিত আদর্শ ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার জীবনের কৃতকার্যতার সম্পর্কে বলিয়াছেন—"এক সময় একটি মাত্র কাজ করিবে এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবে—এই একনিষ্ঠা সফলতার কারণ।"

বিলাত হইতে আসিয়া প্রফুল্লচন্দ্র যখন কর্মপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছিলেন তখন ক্রফ্‌ট সাহেব শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। তিনি এই সময় দার্জিলিংএ ছিলেন। দুইশত পঞ্চাশ টাকা

বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র মনের দুঃখে দার্জিলিংএ ডিরেক্টর সাহেবের নিকট গেলেন। কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার আবেদন সমবেদনার সহিত গ্রহণ না করিয়া বরঞ্চ একটু তীব্রভাবই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ডাঃ রায়কে বিলাত পাঠান প্রধান প্রধান রসায়নাগার পরিদর্শনের জন্য।

আচার্যদেবের প্রিয় ছাত্র ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ সত্যেন বসু, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ডাঃ প্রফুল্লকুমার মিত্র, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ সেন, জীতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ বিমানবিহারী দে প্রভৃতি নানা মৌলিক প্রবন্ধে আপন আপন কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র দেন—"আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বিজ্ঞান মন্দিরের পরীক্ষাগারে কাটাইয়া দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে আর পারিশ্রমিক লইতে আমি অক্ষম। সেইজন্য আমার নিবেদন যে, পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান মন্দিরের রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।"

তিনি দেখিয়াছিলেন সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির তিরোধানে কত সংসার ভাঙ্গিয়া যায়, কত বিধবা ও অনাথ শিশু অসীম দুর্দশায় নিপাতিত হয়। আর শুধু তাই বা কেন, দেশের বেশীর ভাগই কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া দেখে যে তাহাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে কিছুই নাই। অনশনের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। অথচ এই দুর্দিনে সমস্যার সমাধান হইতে পারে জীবনবীমার সাহায্যে। তাই তিনি নিজে অগ্রণী হইয়া দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া আর্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী গঠন করেন।

বাঙ্গালী তথা ভারতকে যাঁহারা বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়াছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন—১৩৫১ সালের ২রা আষাঢ় এই মহাপুরুষ সাধনোচিত ধামে গমন করেন। আমাদের সান্ত্বনা এই যে, মানবজীবনে সৎকার্য সম্পাদন দ্বারা যতদূর যশোলাভ হইতে পারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পূর্ণমাত্রায় তাহার অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। যদি 'কীর্তির্যস্য স জীবতি' এই মহাজন বাক্য অণুমাত্র সত্য থাকে তাহা হইলে তিনি মরিয়াও জীবিত আছেন।

[Calcutta University প্রকাশিত (1962) Acharya Prafulla Chandra Roy Birth Centenary Souvenir থেকে সংকলিত]

আচার্য রায়ের ময়দান ক্লাব

অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ
(সংকলিত)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ময়দান ক্লাব কলিকাতার ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে এক সময়ে প্রায় সর্বজন-পরিচিত ছিল। আচার্য রায় বলিতেন, 'The maidan is the lungs of Calcutta'। আচার্য রায় প্রায় রোজই সন্ধ্যায় বেঙ্গল কেমিক্যালের ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া যখন ময়দানে গিয়া রেড রোড-এর উপর গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পদচারণা করিতেন, তখন ময়দানে গিয়া তাঁহার দলে ভিড়িলেই হইত।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভক্ত ও সহকর্মী সেই যুগের কংগ্রেসের বাঙালার একজন কর্ণধার—National Council of Education-এর অন্যতম সম্পাদক হিসাবে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহকর্মী বেঙ্গল কেমিক্যালের একজন Director বয়সে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষা বছর পাঁচেক ছোট কিন্তু বহু যুগ ধরিয়া উভয়ের সৌহার্দ্য। ময়দানে যাইবার পথে আচার্য রায় এই সত্যানন্দ বসুকে তাঁহার ধর্মতলার বাসা হইতে গাড়িতে তুলিয়া লইয়া যাইতেন। আর বাড়ীর গাড়ি চড়িয়া আসিতেন আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু—বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। আচার্য রায়ের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রায়ই ময়দানে গিয়া আচার্য রায়ের ময়দান ক্লাবে জুটিতেন, উত্তরজীবনে তন্মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন। কয়েকজনের নাম মনে পড়ে—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, হেমেন্দ্র কুমার সেন, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়। ইঁহারা সব আচার্য রায়ের নিজের favourite বিষয় অর্থাৎ Chemistry-রই ছাত্র; আর ছিলেন মেঘনাদ সাহা, নিখিলরঞ্জন সেন, জীবন রতন ধর প্রভৃতি। সত্যেন্দ্রনাথ বসুও দুই-একদিন আসিতেন। যাঁহারা ক্রমশঃ ক্লাবের একরকম অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রত্যহই আসিতেন, তন্মধ্যে সত্যানন্দ বাবু, গিরিশ বাবু ও পূর্বোল্লিখিত যুবকবৃন্দ ছাড়াও অনেকের নাম মনে পড়ে। বিখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য নারী শিক্ষা সমিতির কর্ণধার লেডী অবলা বসুর সহকর্মী কৃষ্ণচন্দ্র বসাক, নরেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র সোম (সুভাষ বসুর মাতুল বলিয়া পরিচয় দিতেন), একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক চুনীলাল আগরওয়ালা, খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ব্যারিষ্টার জে. এন. রায়, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন—কলুটোলার বিখ্যাত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের পুত্র; বিস্তৃত ছিল ইঁহাদের ব্যবসায় C. K. Sen and Co. বিশেষতঃ জবাকুসুম তৈলের জন্য বিখ্যাত। এমনি আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি।

১৯১২-১৩ সনের কথা বলিতে ছিলাম। নিন্দুক পরিহাস প্রিয় অনেকে এই সমাবেশকে ডাঃ রায়ের Night Club বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিশ্বব্যাপী মহাসমর—১৯১৪ সনের আগষ্ট মাসে First World War—আমরা যাহাকে কাইজারের যুদ্ধ বলিতাম। খবরের কাগজে সকাল-বেলাকার সংবাদে লোকের মন তৃপ্ত হয় না—আরও টাটকা খবর প্রত্যাশা করে। ফলে চৌরঙ্গীর মোড়ে হোয়াইটওয়ে লেডল এণ্ড কোম্পানীর গায়ে, ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসের দেওয়ালের গায়ে বোর্ড সন্ধ্যার সময়ে 'stop press' নাম দিয়া শেষ সংবাদ শ্লিপ আঁটিয়া দেওয়া হইত। আমি ময়দানে হাঁটিয়া আসিবার পথে ষ্টেটস্‌ম্যান অফিসের সামনে দাঁড়াইয়া 'ষ্টপ প্রেস' খবরগুলি পড়িতাম। সকাল-বেলাকার সংবাদপত্রের খবর তো পড়াই ছিল। আমি আচার্য রায় ও সমবেত বন্ধুদের নিকট গিয়া সেই সব সংবাদ বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করিতাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং আমাকে General Mackensen নামে অভিনন্দন করিলেন।

একবার মনে পড়ে সুভাষ বসু আসিয়া-ছিলেন। তখন ১৯১৭ সন; পূর্ব বৎসর অধ্যাপক ওটেন সাহেবের উপর হামলার ব্যাপারে সুভাষ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া রাষ্টিকে-টেড ছিলেন। ইহার বৎসরের পর বৎসর ময়দান ক্লাব চলিয়াছিল।

স্মৃতি-কথা

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য

১৯২৮ সাল। তখন আমরা স্কুলের ছাত্র। 'ক্যালকাটা একাডেমি'তে পড়ি। তখন থেকে পি. সি. রায়ের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। থাকতাম সাইন্স কলেজের কাছে আপার সার্কুলার রোডে, যেটা আজকাল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। সেখানে বিষ্টু ঘোষ পরিচালিত একটা ব্যায়াম সমিতি ছিল। আমরা ছোরা-খেলা, লাঠি-খেলা শিখতাম। মাঝে মাঝে পি. সি. রায় আমাদের ক্লাবে আসতেন এবং আমাদের উৎসাহ দান করতেন।

একদিন পি. সি. রায় এসে বললেন, বর্দ্ধমানের কোনও গ্রামে কোন অধিবেশন হবে, তাঁকে তাঁরা প্রধান অতিথির পদে বরণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে সেই সভার উদ্যোক্তারাও আমাদের ক্লাব পরিদর্শনে এসেছেন। তাঁরা আমাদের ক্লাবকেও আমন্ত্রণ জানালেন সেখানে গিয়ে ছোরা-খেলা, লাঠি-খেলা দেখাবার জন্য। আমরাও সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

পি সি রায়ের সঙ্গে চলেছি ট্রেনে। মাঝ পথে চা'য়ের জন্য ছেলেরা ষ্টেশনে নেমে—'এই চা'—'এই চা'—বলে চেঁচাতে লাগলো। একটী ছেলে প্ল্যাটফরমে পড়েই গেল এবং একটুর জন্য বেঁচে গেল। এতে পি. সি. রায় খুব রেগে গেলেন। বললেন—এমন নেশা না করলে নয়? আমরা নত মস্তকে তিরস্কার গ্রহণ করলাম। বর্দ্ধমানে নেমে গরুর গাড়ী করে সেখানে পৌঁছুলাম। তখন অপরাহ্ণ বেলা। গ্রামের জমিদারের দোতলা বাড়ীর সামনে এসে আমাদের গো-শকট থামলো। বাড়ীর সামনেই একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—টলমল করছে কাক চক্ষুর মত জল। বড় ভাল লাগলো। আমরা সকলেই সেই ঘাটে নেমে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নিলুম। বলা বাহুল্য পি. সি. রায়ও সেই পুষ্করিণীতে মুখ হাত ধুয়ে সেই ঘাটের শান-বাঁধানো চত্বরে বসে পড়লেন। বললেন, এইবার এক কাপ গরম চা চাই। আমরা হেসে মুখ চাওয়া-চায়ি করছি। আমাদের মধ্যে একজন ডেঁপো ছোঁড়া ছিল, সে সাহস করে প্রশ্ন করল, 'স্যার, আমরা চা খাই বলে গাড়ীতে অত তিরস্কার করলেন, এইবার আপনি নিজে চা চাইছেন স্যার?' পি. সি. রায় জবাব দিলেন—'ওরে আমি "চা" খাই, আর "চা" তোদের খায়।'

পরে গৃহস্বামী গরম চা ও বিস্কুট নিয়ে হাজির। পি. সি. রায় বললেন, উঁহুঁ, এ বিস্কুট চাই না—ইণ্ডিয়ান বিস্কিট আনো। তাঁরা ঠিক বুঝতে না পেরে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি বললেন, মুড়ি নিয়ে এস।

একদিন দেখলাম রামমোহন লাইব্রেরীর সামনে অনেক লোকের ভীড়। কি ব্যাপার? পি. সি. রায় এসেছেন—বক্তৃতা দেবেন। আমরা স্কুলের কয়েকটি ছাত্র দল বেঁধে হলে ঢুকে পড়লুম।

মঞ্চে সুন্দরীমোহন দাস, অমৃতলাল বোস, পি. সি. রায় প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ আসীন। বক্তৃতারত শ্রীজ্ঞানঞ্জন নিয়োগী। একে একে আরও অনেকে উঠলেন ও বক্তৃতা দিলেন। পরে পি. সি. রায় উঠলেন। তিনি বাঙালীদের ব্যবসা করতে পরামর্শ দিলেন। চাকুরী-পেশা তাঁর পছন্দ নয়।

তিনি বললেন—ম্যাট্রিক পাশ করে যে সব ছেলেরা কলেজে গিয়ে ছ বছর সময় নষ্ট করে এম. এ. পাশ করে, যদি ঐ ছ বছর বড় বাজারে ঘোরে তো মানুষ হয়ে যায়। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন,—'তোদের জীবন কি থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ ও থার্টি রুপিস মার্চেন্ট অফিসেই শেষ হবে? একবার ভেবে দেখ, ভারতের নানা প্রান্ত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে তোদের সহরের বুকের ওপর বসে ধনী হয়ে যাচ্ছে। তোরা কি করছিস্? ওরে তোরা জানিস না খালি ঝাঁটার কাঠি বেচে কত লোক ক্রোড়পতি হয়ে গেছে। ভারতের যে অঞ্চলে প্রকৃতি সব চেয়ে প্রতিকূল, সেই উষর মরুভূমির মানুষেরাই আজ দেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের শিখরে। তাদের পাশে পাশেই আছে গুজরাটী, পার্শি প্রভৃতি সম্প্রদায়। কেবল বাঙালী কোথাও নেই।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণে

ধ্রুব সন্ধানে

পরিতোষ বিশ্বাস

বিরহের পথ ধরে
মরুভূমির মত নিঃসঙ্গ একলা,
চলে গ্যাছো সদন্তে—
এক বিরহ থেকে
অন্য আর এক বিরহের বন্দরে
করোনি নোঙর।
সবুজ সুখের নীড় ছ্যাখোনি ফিরে,
স্নেহের মখমলে ঢাকা
এক একটি প্রভাতী হৃদয়
রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করে আরো সহনীয়
মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক
বিজ্ঞানীর আড়ালে
স্বাধীনতার পূজারী বিপ্লবী।
বারম্বার বন্ধুর পথ ডেকেছে ইশারায়—
ছিল না মাথার ওপর আকাশ সু-নীল
চান্দনিক স্বপ্নিল রাত
অথবা কুমারী মেয়ের সিঁথির মত
মেঠো পথের দু'ধারে
হৈমন্তী পোয়াতী ফসল ভেজা
শিশিরে ছোঁয়াওনি
অব্যক্ত ব্যথার পাথর কুচি।

গোবর নিকানো উঠোনের প্রান্তে তুলসী মণ্ডপে
এয়োস্ত্রীর সন্ধ্যা প্রদীপ আলোর
অনুরাগ—আলতা পায়ের ছোপ
রাঙায়নি যৌবনের সকাল,
বাসন্তীরঙা শাড়ীর আঁচল স্পর্শা
হেম নিকেষিত উদ্‌ভ্রান্ত সোহাগ
ফিরে গ্যাছে সম্পূর্ণ একা নিষ্ফলা।
অষ্টাদশী আদুরে নরম কোন হাত
রেখে হাতে বলেনি কেউ—কখনো—
'ভালো থেকো' !
অথবা
নিজস্ব মানুষের চোখের ক'ফোঁটা জলের ঠিকানা
অজ্ঞাত না জানাই থেকে গ্যাছে।
হয়তো বা হয়নি অবসর
নিছক ভাবনা এলোমেলো
সব কিছুর উর্দ্ধে তুমি—তোমার প্রয়োজন।
তপমগ্ন তপস্বী
মানব বেদনার সঙ্গী
শুধু চোখের জলে হাত ভিজিয়ে
পিচ্ছিল বন্ধুর পথে হেঁটে গ্যাছো
উৎসব উপেক্ষিত পশ্চাতে
সুখদুঃখ নামযশে নিষ্ঠুর উদাসীন
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে
এক বিরহ থেকে অন্য আর এক বিরহে
ফিরেছো—
বিচ্ছেদের অতলান্ত অসীম পারাবারে
ধ্রুব সন্ধানে—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণে

গীত

শৈলেন রায়

রাগিণী ঃ ভৈরবী — তাল ঃ কারফা

হে দেশদরদী চিরকুমার
তোমার তুলনা হয় না।
গুণের কথা বলব কত,
বলে ত শেষ করা যায় না।
সব আদর্শ তোমার নীতি ভরা
নিজে আচরি সবে শিখালে,
সব সঞ্চয় তোমার স্বার্থ ছাড়া
দেশ সেবায় দান করিলে,
তাই মরেও আজ অমর তুমি,
তোমায় কভু ভুলব না।
এই বাংলার মানুষ সুখে থাকুক
এই ত তুমি চেয়েছিলে,
তাই শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা
সব পথের দিশা দেখালে,
তবু বাঙালীর অন্নসমস্যা
আজ দূর হল না।
অজ্ঞান আঁধারে ভরা ছাত্র মহলে
জ্ঞানের আলো নেইকে,
বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করি
দিলে জ্ঞানালোক,
হে মহান আচার্য রায় লহ প্রণাম
তোমার আদর্শ চ্যুত হব না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শঙ্করপ্রসাদ রায়চৌধুরী

কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী রাড়ুলী গ্রামে ১৮৬১ সালে ২রা আগষ্ট প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই কপোতাক্ষ তীরে একদিন অমর কবি মধুসূদন ও শিশিরকুমারের জন্ম হয়।

—বক্ষে ধরি কপোতাক্ষ যৌবন চঞ্চল উন্মাদিনী
ছুটেছিল—
সিন্ধুপানে—বাজাইয়া উর্ম্মির নূপুর প্রফুল্ল,
শিশির, মধু—
তিন পুত্রে গর্ব্বে প্লাবি শ্যাম তৃণাঞ্চিত তট—

এই রাড়ুলী গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় পরিবারে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম। পিতা হরিশ্চন্দ্র মাতা ভুবন-মোহিনী দেবী। প্রফুল্লচন্দ্রের উর্ধ্বতন পুরুষ রামপ্রসাদ—মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের রাজ-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পতনের পর মর্মাহত হইয়া পরিজনসহ রাড়ুলী গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইনিই রায় বংশের আদি পুরুষ। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র সমাজ-সেবায়, শিক্ষাবিস্তারে, পাণ্ডিত্যে রায় পরিবারের শ্রেষ্ঠ ও স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কলিকাতার তৎকালীন জমিদার সভায় প্রধান সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিশিরকুমার ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র সেকালের বাঙ্গালী সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র যে বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভার গুণে বিশ্বের পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহার পিতা হরিশ্চন্দ্রের শিক্ষাদানের নৈপুণ্য।

১৮৭৯ সালে প্রফুল্লচন্দ্র অ্যালবার্ট স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে মাত্র প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন। বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারলেন না। এরপর বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ইতিমধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে উভয় বিষয়েই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। বি. এ. পড়বার সময় গোপনে তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হন। এর কয়েক মাস পর—এই পরীক্ষার ফল প্রথমে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এই বৃত্তি লাভ করেন। তাঁর এই কৃতিত্বে সারা কলিকাতায় সাড়া পড়ে যায়। এই বৃত্তির টাকার উপর নির্ভর করে সরাসরি বিলাত যাত্রা করেন। এখানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস-সি. ক্লাসে ভর্ত্তি হন। সাহিত্য অনুরাগী হয়েও বুঝেছিলেন, বিজ্ঞানে উন্নতি ছাড়া পথ নাই। ১৮৮৫ সালে বি. এস-সি.

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডি. এস-সি. লাভের জন্য গবেষণা শুরু করেন। বিষয় ছিল কপার ম্যাগ্নেসিয়াম। এই গবেষণায় প্রায় দুই বছর সময় লাগে।

রসায়নে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। এরপর দেশে ফিরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করে বিজ্ঞান জগতের নূতন নূতন তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে প্রফুল্লচন্দ্র একটি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন। পারদ ঘটিত যৌগিক পদার্থ 'মার্কিউরাস নাইট্রাইট'। তাঁর এই আবিষ্কারে একটি অজ্ঞাত তথ্য রসায়ন শাস্ত্রের অধিগত হলো। বিশ্বের রাসায়নিকগণ বার্থেলো, ভিক্টর মেয়ার, রস্কো প্রভৃতি কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। এই সম্মান লাভ করেন মাত্র ৩৪ বছর বয়সে। এর ৮ বছর পরে তৃতীয়বার বিলাত যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কংগ্রেস অধিবেশন হয় লণ্ডনে। উদ্বোধন করেন লর্ড রোজ রেরি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র যোগদান করেন। পঞ্চম জর্জ প্রফুল্লচন্দ্রকে নাইট (স্যার) উপাধি প্রদান করেন। তখন থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র স্যার পি. সি. রায় নামেই পরিচিত। এই বছরেই বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। স্যার আশুতোষ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণের আহ্বান জানান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল কর্ম্ম হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস রচনা। সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে। প্রফুল্লচন্দ্রের আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন। তখন তাঁহার সম্বল ছিল মাত্র আট শত টাকা এবং অদম্য সাহস। নিজহাতে ঔষধ তৈরী করে বাজারে বিক্রয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। এখন প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় পরিণত হয়েছে। ১৯২১ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের ষাট বছর পূর্ণ হয়। তাঁর মাসিক বেতন ছিল এক হাজার টাকা। তিনি এই সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর বেতনের অর্থ দান করেন। খুলনায় দুর্ভিক্ষ ও উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় প্রফুল্লচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যেই বঙ্গীয় যুবক সংঘের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্যের জন্য চলে যান। সেখান থেকে সেবাকার্যের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করেন। এই বিপর্যয়ের প্রতিকারে প্রফুল্লচন্দ্র কংগ্রেস, যুবসংঘ, সোস্যাল সার্ভিস লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন দলকে আহ্বান জানিয়ে বিরাট সভা করেন। এই সভায় আচার্য রায়ের সভাপতিত্বে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই আচার্য রায়ের আবেদনে তিন লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। বিজ্ঞান কলেজেই ছিল সেবাব্রতের কর্মকেন্দ্র। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বন্ধু নীলরতন সরকারের মাধ্যমে গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ত্যাগ ও দেশসেবায় সম আদর্শের টানে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। এখানে গান্ধীর সঙ্গে আচার্য রায়ের প্রথম পরিচয় হয়। উভয়ে উভয়ের আত্মত্যাগ, স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রীতি প্রভৃতিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে টাউন হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা হয়। আচার্য

রায় প্রধান অতিথি হন। চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে এই সভায় বক্তৃতা দেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে এই অনিষ্টকর আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। আচার্যদেবের কক্ষ ছিল ছাত্রদের তীর্থস্বরূপ। এই ঋষি প্রতিম ত্যাগী সরল লোকটি তার পাণ্ডিত্যে ও দানের মহিমার দেশ বিদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিদেরও আকর্ষণ করতেন। মহামতি গোখেল, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, জগদীশ-চন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। ১৯৩২ সালে ৭১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতায় টাউন হলে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। স্বহস্তে প্রফুল্লচন্দ্রের ললাটে চন্দন তিলক এঁকে দেন এবং মাল্যদান করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী বন্দেমাতরম্ ও শঙ্খধ্বনি দিয়ে আচার্যদেবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এর কিছুদিন পর পৌরসভার পক্ষ থেকে আচার্যদেবকে একটি মানপত্র ও রৌপ্য নির্মিত চরকা দেওয়া হয়। মানপত্রটি পাঠ করেন তৎকালীন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাতে এই কথাগুলি ছিল—"হে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আপনার নিষ্কাম জনসেবা এবং আজীবন দৈন্যবরণ এই মহিমোজ্জ্বল ভারতভূমির ঋষি ও তপস্বীদের অনবদ্য আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। দেশের আর্থিক দুর্গতি সমাজের নানা অবিচার ও পল্লীজীবনের দুঃখ-দুর্দশা মোচনকল্পে আপনার আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং খদ্দর ও চরকা শিল্প প্রচারে আপনার একান্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহ সমগ্র জাতির প্রাণে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে। হে কর্মযোগী, হে স্বাধীনতার অগ্রদূত! হে বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান আপনি আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। বন্দেমাতরম্।"

[বর্তমান লেখক রায় বংশের অধস্তন পুরুষ; তবুও আচার্যদেব বংশের গৌরব, তিনি মহীরুহ; দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সে গৌরব আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি প্রণম্য।]

Entrepreneurship and the Acharya

Dr. B. D. Nagchaudhuri
Ex-Vice Chancellor, Jawharlal Nehru University

Entrepreneurship requires (i) a foresight and understanding of social needs and projected demands (ii) knowledge of state of technology in some detail (iii) innovation ability about everything, small and big, useful and beautiful (iv) organisational skills and cooperative ability (v) knowledge of marketing and selling skills (vi) flexibility to adapt and adjust. It is rare to find these in one man and Bengalis' inability to cooperate often spoils worthwhile programmes because several who combine these qualities cannot work together for any length of time.

The Acharya held that Bengalees should be entrepreneurs—go into technology and start industry. His vision was clear in its distant focus—not as clear in the near vision. His distant focus was the growth of industry, particularly chemicals and drugs in India, to the stage of world level. Both his near vision and distant vision was due to an academic life—sheltered from the market and imbued with patriotism and modernity. The hurly-burly of the market place was unfamiliar to the Acharya. His capacity to inspire was great. His capacity for financial and industrial management was not equal to his ambitions. Some of those whom he inspired did very well. For example, the Bengal Water-proof of S. M. Bose and the Bengal Chemical in its early years. The emphasis, however, in these as well as in Bengal Immunity and Dhakeshwari Cotton were on a personalised management style rather than the building up of a corporate style of management. This problem is apparent in many industries in Bengal, the Indian Iron & Steel of R. N. Mookherjee & Biren Mookherjee, in the engineering and machine works, Ala Mohan Das and many others. Compare this to Tata's where a truly corporate style of management has evolved to a substantial degree. The lack of management in the corporate manner as well as structure has led many industries to become weak or

to fail when the pilot ages, leaves or dies.

Entrepreneurship has a lot to do with management styles, in a society. An entrepreneur who has developed or innovated a new product or process and wishes to produce and market it, is initially handicapped by a society which discourages risk-taking or is unwilling to provide venture capital. He is also handicapped by the possessiveness he has of the company and of whatever innovation he has contributed. Nobody else is allowed to feel possessive or share in the ownership except family and friends until it is too late. Capital in the first instance comes and is expected only from this inner circle. This also reduces the ambit of search for venture capital.

Acharya Prafulla Chandra had to depend, like others after him, not so much on the industrial or business community or even banks, which at that time were conservative, as on the charity of his friends and admirers. This situation has improved somewhat in recent years. However, we still remain a very conservative society with regard to encouragement of ordinary middle class entrepreneurs with a technological vision. In contrast Carlson who invented Xerography was funded and encouraged by his middle class friends. He worked in his garage at home to develop his invention. A company was formed, Xerox copiers were marketed. However, not long after, large companies like DowCorning and du Pont's bought out the Xerox company. Carlson retired on the money he made and developed other interests. Many people made money on Xerox besides the inventor. While the inventor and the entrepreneur made modest money, the big share of the income went to the large multinational companies which could invest large amounts in streamlined production, in marketing and in product improvement. The nature of innovation or invention is not that of a new discovery the establishment of a technique or a principle. It is a more modest but socially important function of changing or altering something or combining something with others so that a socially needed item can be produced and marketed. For example, the folding scissors provided an item which could be carried in a pocket without chance of injury and tear. Its popularity in the market has been ensured. More people travel, the greater will be the demand of such an item. Yet it involves no new principle or technique.

The problems in our nation are

severe. There is not enough surplus money in the hands of the middle classes to venture a fraction of it in support of entrepreneurship. There is also some times the dishonesty of the entrepreneur in safeguarding the interests of the investors who provided initial investments in development and venture capital. The unwillingness to take risks, and ability to recognise possible entrepreneurs are major social inhibitions with regard to encouragement of enterprise. There is however a synergy between the generation of surplus money for investment and venture capital and the success of industries in a society. This particularly applies to success of new enterprises on new products and the availability of venture capital.

Let me mention a man Dr. P. K. Kichlu whom I admired greatly, one of the really innovative optical engineers of our country. He developed techniques of prisms, ruled gratings, Fresnel lenses, interferometers and several other optical gadgets. He invested some of his money and some from friends to set up an optical industry. It remained a cottage industry and did not grow as it should for two simple reasons. Dr. Kichlu was very possessive about his inventions and would not allow the industry to grow to a scale which will be beyond his personal control. Investors were shy because they lacked knowledge of the market and its capacity for absorbing new and sophisticated optical goods. After Dr. Kichlu died, there was no corporate management to take over what was essentially a one-man show. Most of the effort was lost. The only residual gain was a few skilled technicians in optical engineering who were readily absorbed but their collective skills were lost only the individual skills found a market place.

Acharya Prafulla Chandra's great contribution was both conceptual and the driving force he provided. However, he was not a powerful innovator, nor was he familiar with investment, production, or management skills. His disciples who founded the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works were enthusiasts, patriots, sound chemists but singularly lacking in corporate management and marketing skills. Management is singularly weak ; made weaker by the image of the boxwallet type of the business executive. Understanding technology and process engineering in the small scale and the stress on cooperative management is quite weak. It is a soft option unrelated to the great Acharya's ideals and equally irrelevant to entrepreneurial management. If we

have to live up to the dreams of the great Acharya about India, and Bengal as a truly innovative, venturesome industrial nation or State, we have to go beyond our knowledge of science and technology which I think, we have, to the things we have not, entrepreneurial skills, management and marketing knowledge and capability, risk-taking ability. Combining these with our knowledge of science and technology we can hope to fulfil some of the expectations of the great Acharya.

মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবন্তি॥
—যোগবাশিষ্ঠ

তরুলতাও বেঁচে থাকে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে ; কিন্তু সেই যথার্থভাবে জীবিত থাকে যে মনের দ্বারা জীবিত থাকে।

এই মননশীলতাই মানুষকে তরুলতা পশুপক্ষী থেকে শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত করেছে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ইত্যাদি জীবধর্ম অতিক্রম করে এখানেই মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—'মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি।' সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা প্রধানতঃ তার স্থূল প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারেই নিয়োজিত হয়। তাকে যথার্থ মনন-শীলতা বলা যায় না। মনন-চিন্তারও তর-তম আছে। যে মনন ক্রিয়া মানুষের স্থূল প্রয়োজনের গণ্ডী অতিক্রম করে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, অধ্যাত্ম ভাবনা বা অনুরূপ উন্নত মানস-অনুশীলনে নিয়োজিত করে তাকেই যথার্থ মননশীলতা বলা যেতে পারে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন যথার্থ মননশীল মানুষ ছিলেন। তিনি 'বিষয় পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য, দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয়' করে-ছিলেন ; তিনি ব্যক্তিগত স্থূল প্রয়োজনের উর্ধ্বে বৃহত্তর মানবজগতের কল্যাণ চিন্তায় তাঁর মনন-ক্রিয়াকে নিয়োগ করেছিলেন। শুধু রসায়ন বিজ্ঞানই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের উন্নতি-বিধায়ক বিচিত্র চিন্তাকর্মে সমগ্র জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই—হিন্দু-রসায়ন, প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চা, নব্য ও প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কার সমস্যা, জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যা, জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়, বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার, অন্ন সমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তার প্রতিকার, অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, অধ্যয়ন ও সাধনা, বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা ইত্যাদি কতোই না উন্নত ভাব-চিন্তায় তাঁর মননশীলতা নিয়োজিত হয়েছে !

সন্দেহ নেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধক, বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী একজন অনন্য-সাধারণ মননশীল মনীষী এবং বিজ্ঞান ও চিন্তাজগতে তাঁর অবদান চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এহো বাহ্য। আমাদের মনে হয়—বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী প্রফুল্লচন্দ্রের

চেয়ে মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র আরো বড়। বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে; তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো; আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির।···বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গ সমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল।··· তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্র মাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃতকীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।' এই প্রশস্তি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কেও সঙ্গত কারণেই সমভাবে প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। মননশীলতা ও প্রতিভার জন্য তিনি নিশ্চয়ই আমাদের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানুষ হিসাবে, মনুষ্যত্ব গৌরবে তিনি আমাদের অন্তরের রত্নসিংহাসনে চিরকাল আসীন থাকবেন, সেই মনুষ্যত্বের গৌরব মহিমায় আমাদের অনুপ্রাণিত করবেন। বিদ্যাসাগরের মতো আচার্য রায়ও তাঁর অন্যবিধ কৃতকীর্তিকে এই চরিত্র মাহাত্ম্যে খর্ব করে রেখেছেন। বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে প্রফুল্লচন্দ্রের পরে আরো বহু মনীষী ও বিজ্ঞানী তাঁদের প্রশংসনীয় অবদানের জন্য যশ, খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের মতো মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত এমন আর কোন মানুষ আমাদের অন্তরে তেমন করে রেখাপাত করে না, আমাদের পরমাত্মীয় বলে এমন আর কাউকে গ্রহণ করতে পারি বলে অন্ততঃ আমাদের জানা নেই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা বৃহত্তর সমাজের সেবায়, পরার্থে উৎসর্গ করে গিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' তিনি তাঁর মূল্যবান জীবন দান করে গিয়েছেন।

বিশেষতঃ তাঁর ছাত্র বাৎসল্য কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর অনাড়ম্বর বাসগৃহটি আমাদের প্রাচীন যুগের গুরুগৃহের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিজে অত্যন্ত সাদাসিধে, সরল জীবনযাপন করতেন এবং তাঁর উপার্জনের প্রায় সমস্তই দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতেন। এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'It is difficult to believe that the man in simple Indian dress and wearing simpler manners could possibly be the great scientist and professor he even then was. And it took my breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the rest he devoted to public uses and particularly for helping poor students.' আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'The association of plain living and high thinking is always very rare; in addition to these, there is in Sir P. C. Roy the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a

single individual is indeed rare in any country, and there can be no higher example for the young generation to emulate than the life of this great teacher.' কপোতাক্ষ তীরবর্তী আর এক মনীষী বঙ্গসন্তান কবি শ্রীমধুসূদনের বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। বিদ্যাসাগর চরিত্রে মধুসূদন দেখেছিলেন 'প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরাজের কর্মশক্তি এবং বাঙালী-মায়ের হৃদয়।' প্রফুল্লচন্দ্রকে যে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর বলা হয় তা অমূলক নয়। বিদ্যাসাগরের মতোই আচার্য রায় মাতৃহৃদয়ের কারুণ্য-স্নেহধারায় সকলকে বিশেষতঃ দরিদ্রকে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মতোই ছিল তাঁর বহুমুখী নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা এবং ছিল তাঁর ঋষিসুলভ প্রজ্ঞা। মাতৃভক্তিও ছিল তাঁর বিদ্যাসাগরেরই মতো, আর ছিল তাঁর মানব সেবার অকৃত্রিম প্রয়াস।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনযাত্রা, খাওয়া-পরা ছিল অবিশ্বাস্য রকম সাদাসিধা, সহজ সরল, কিন্তু চিন্তাভাবনা ছিল উচ্চস্তরের তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই 'Spartan simplicity in dress and almost ascetic austrity in diet'— ছিল তাঁর চরিত্রের, তাঁর জীবনাদর্শের অচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের সেবা এবং সত্যানুসন্ধানই ছিল তাঁর ধর্ম। তিনি কিরূপ অনাড়ম্বর অথচ উন্নত জীবনযাপন করতেন—ছাত্রদের প্রতি তথা মানুষের প্রতি তাঁর কিরূপ আন্তরিক স্নেহ-সেবার মনোভাব ছিল—তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী সকলেই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা বর্ণনা করে গেছেন।

আচার্যদেবের অন্যতম ছাত্র অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—অধ্যাপক রায় এবং কলেজের বেয়ারাকে একই চৌখুপি ছিটের স্যুতির কোট পরিহিত দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছিলেন আচার্য রায় একটা থান কিনে চারটা কোট করিয়ে দুটো বেয়ারাকে দিয়েছিলেন এবং দুটো নিজে পরতেন। ডাঃ নিমাইদাস রায়চৌধুরীর নিবন্ধ থেকে জানা যায় —সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে রসায়ন-বিজ্ঞানের এই প্রধান আচার্য উপরের হলঘরের একাংশে অতি সাধারণভাবে বসবাস করতেন, আমরণ একটি সাধারণ খাটিয়ায় শয়ন-বিশ্রাম করতেন। রোজ ৮।১০ জন ছাত্র তাঁর 'আশ্রমে' আহার না করলে তাঁর শান্তি হত না। ৮২ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজের জামাকাপড় নিজেই কাচতেন, নিজের বাসন-পত্র নিজেই মাজতেন। তাঁর ছাত্রদের ও অভ্যাগতদের মুড়ি, সিরাপ ইত্যাদি নিজহাতে প্লেটে করে দিতেন, আর সেই সঙ্গে দিতেন তাঁর স্নেহমাখানো কিলচড়। তিনি ছিলেন ছাত্রদের 'friend and philosopher and guide'। সুযোগমত তিনি ছাত্রদের নিয়ে ময়দানে ও অন্যান্য স্থানে বেড়াতে যেতেন। আবার অধ্যাপনার সময় বিভিন্ন জীবনাদর্শেরও শিক্ষা দিতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যাবলী জানার ও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিবছর মাস তিনেকের জন্য পল্লী অঞ্চলে গিয়ে অতিবাহিত করতেন এবং নগ্নপদে সকলের গৃহে গিয়ে কুশলবার্তা নিতেন। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হতেন। তাঁর স্বগ্রামও অবশ্যই এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হোত না।

যে-মানুষটি বিজ্ঞানের উচ্চ চিন্তারাজ্যে বিচরণ করতেন, আমাদের দেশের তথা বিশ্বের সমকালীন জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে ছিল যাঁর অন্তরের গভীর যোগ, বেঙ্গল কেমিক্যালের মত একটি প্রতিষ্ঠানের যিনি ছিলেন নির্মাতা-প্রতিষ্ঠাতা—সেই এত বড় মাপের মানুষটি যে কতো সহজে দেশের অশিক্ষিত, অনগ্রসর সাধারণ মানুষ তথা গরীব চাষীদের সঙ্গে তাঁর সমগ্র সত্তা নিয়ে মিশতেন, তাদের জীবনের সমস্যাবলী সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, বিশেষতঃ বাঙালী জাতির সার্বিক উন্নয়নে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন—তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এখানেই তাঁর চরিত্রের মনুষ্যত্ব গরিমার গৌরব। আর এখানেই আচার্যদেবের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত রয়েছে বলে আমরা মনে করি। জাতিভেদপ্রথা-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, পণপ্রথা-বাল্যবিবাহ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষে-বন্যাত্রাণে, দেশাত্মবোধের জাগরণে তাঁর নিরলস প্রয়াস চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই সমস্ত মানব-কল্যাণমূলক কর্মপ্রচেষ্টা ও সমাজসেবার মধ্যে তাঁর যে ভূমিকাটি বড় হয়ে উঠেছে সেখানেই তাঁর মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত রয়েছে। এই মানুষ প্রফুল্লচন্দ্রই তাঁর অন্যবিধ কর্মকীর্তিকে অতিক্রম করে গেছেন বলে আমরা মনে করি—এখানেই তাঁর চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

পরিশেষে আচার্যদেবের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সভাপতিরূপে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষণের কিছু অংশ স্মরণ করে আমরা তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি—

"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহায়িত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচার শক্তি, বোধ শক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চারিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন, এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে—পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।"

॥ জয়তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥

সহায়িকা

১। চারিত্র পূজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। Acharya Prafulla Chandra Roy Birth Centenary Souvenir Volume, Calcutta University

গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গ

ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইছামতী নদী তখন ছিল ভয়ঙ্করী। একপারে বর্দ্ধিষ্ণু টাকী গ্রাম। মহাকুমা শহরকে হার মানায়। নামকরা জমিদারদের বাস। অপর পারে টাউন শ্রীপুর। এখানকার জমিদারেরাও ধনী। তবে টাকীর জমিদারদের সাথে পাল্লা দেওয়ার মত ধনী নন। টাউন শ্রীপুর তখন খুলনা জেলার অন্তর্গত আর টাকী ২৪ পরগণার অধীন।

সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে টাকীতে সরকারী হাইস্কুল স্থাপিত হয়। খুলনার দক্ষিণাংশে টাকী স্কুল সবেধন নীলমণি। আর কোন হাইস্কুল ছিল না। বড়লোকের ছেলেরা কলকাতায় অথবা অন্যত্র হাইস্কুলে পড়ত। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা মাইনর স্কুলে (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) পড়ার পর পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

টাউন শ্রীপুরের শ্রীশরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী তখন হাইকোর্টের উকিল। আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান। দেশদরদী। আচার্য রায়ের অনুরোধে ১৯১৫ সালে টাউন শ্রীপুরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে প্রাণ হাতে করে বর্ষার উন্মত্তা নদী পার হয়ে আর এপারের ছেলেদের টাকী স্কুলে পড়তে যেতে হত না। কিন্তু হাইস্কুলের ছেলে মেলে কই? অনুন্নত শ্রেণীর বাস সারা অঞ্চল জুড়ে। সবাই তো চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত। পড়াশুনায় আদৌ আগ্রহ নেই। তাই আচার্যদেবের পরামর্শে শরৎবাবু একটি বিরাট আটচালা ঘর তৈরী করলেন। চারি দিকে বারান্দা। অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেরা থাকবে এখানে। হাইস্কুলে পড়বে। আমি ১৯১৭ সালে এই স্কুলে সম্ভবতঃ নীচের ক্লাসে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম।

আচার্যদেব যখন এখানে আসতেন তখন এই মেসবাড়ীর একটি ঘরে দু'চার দিন থাকতেন আর ছেলেদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতেন। দেখতাম তিনি এইসব ছেলেদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করছেন—বিজ্ঞান পড়তে হবে কেন আর কুসংস্কার থাকলে জীবনে উন্নতি হয় না কেন। আমি তখন ছোট ; তবে আমাদের লোভ হত কবে আমরাও তাঁর কাছে এমনি করে গল্প শুনব।

আচার্যদেব যখন আসতেন তখন সাথে আনতেন বিস্কুট। অকাতরে সব ছেলেদের বিস্কুট দিতেন খেতে। একদিন আমাকে যখন বিস্কুট দিতে গেলেন তখন আমি বিস্কুট নিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে চাপড় মেরে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বুঝি বাওনের ছেলে?" উত্তরে বললাম—'হ্যাঁ'।

পর দিনের ঘটনা। আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে আমায় বললেন "চেলি পরে এক উড়ে বাওন আর লুঙ্গি পরে এক মুসলমান বাবুর্চি আলাদাভাবে ভাত রান্না করে থালায় করে তোকে ভাত খেতে দিলে। তুই দেখিসনি কে কোন

থালায় ভাত দিয়েছে। ভাতের থালার রান্না ভাত দেখে চিনতে পারবি কোন ভাত কে রান্না করেছে? কোনটি অস্পৃশ্য আর কোনটি নয়?" আমি প্রশ্নটি শুনে হকচকিয়ে যাই। উত্তর দিতে পারিনি। চুপ করেছিলাম। কিন্তু যত বড় হয়েছি ততই এ প্রশ্ন দিন দিন আমার মনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে।

ব্রাহ্মণের ছেলে। যথাসময়ে পৈতে হ'ল। গলার পৈতে বিঁধতে লাগল আমার মনকে। ক'দিন বাদে ছিঁড়ে ফেললাম এই পৈতে গলা থেকে। আর কখনও পরিনি। মনের ভার লাঘব হ'ল। সমাজে যারা অচ্ছুত বলে পরিচিত এবার তাদের সাথে মন খুলে মিশতে পারলাম। উপলব্ধি করলাম এবার তাহলে আচার্যদেবের প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারব। ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন ব্রাহ্মণেরা যখন আমাকে ওদের সমাজে অপাংক্তেয় মনে করতে লাগল তখন আরও স্থির নিশ্চিত হলাম যে আমি মনের দিক থেকে অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করতে শিখেছি। মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম যে আমি আচার্যদেবের আদর্শকে অনুসরণ করতে শিখেছি।

তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। আচার্যদেব এসেছেন স্কুল পরিদর্শনে। গেলাম তাঁর সাথে দেখা করতে। আমার সংকল্পের কথা শুনে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "তুই তাহলে বাওনদের মধ্যে শূদ্র হয়ে গেলি। এতে শাপে বর হ'ল।"

সত্যই শাপে বর হয়েছিল। চাষীদের সাথে মিলে চাষ করতে ভাল লাগত। কায়িক শ্রম করে আনন্দ পেতাম—আদৌ মনে হত না যে আমি এর জন্য ছোট হয়ে গেছি। পরের বার আচার্যদেব এলেন। শুনলেন আমার কথা। সেই সজোরে পিঠের চড়—সারাজীবন মনে রাখবার মত স্নেহের স্পর্শ। মুখ ভরা হাসি নিয়ে সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "বাওনের ঘরে জন্মে যদি চাষী হতে পারিস তবে তোর বুদ্ধি ওদের সাথে মিশে দারুণ কাণ্ড ঘটে যাবে। যারা তোকে সমাজ ছাড়া করেছে তারা একদিন তোকে মাথায় নিয়ে নাচবে।"

গুরুর নির্দেশে মনে প্রাণে চাষী হলাম। পড়াশুনা আর করলাম না—এন্ট্রান্স (বর্তমানে মাধ্যমিক) পর্য্যন্ত পড়েই বিদ্যামন্দির ত্যাগ করলাম। নীল আকাশের তলায় এসে নূতন পাঠ শুরু করলাম। চাষই ধ্যান, চাষই জ্ঞান আর চাষই সাধনা হয়ে গেল। চাষের জমি আমার ল্যাবরেটরী হ'ল। আজ চাষবাসের ক্ষেত্রে হাতে-কলমে গবেষণা করে সমাজের যতটুকু কল্যাণ করতে পেরেছি তার জন্য আচার্যদেবকে জানাই শত প্রণাম।

আমি বোধহয় তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। সেইসময় আমাদের স্কুলে এক নূতন এসিষ্ট্যান্ট টিচার এলেন। তাঁর নাম শ্যামাপদ চক্রবর্তী। ভীষণ রবীন্দ্র বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বলতেন—প্রকৃত কবি হলেন ভারতচন্দ্র, নবীনচন্দ্র আর মধুসূদন।

যখনই আচার্যদেব শরৎচন্দ্রের মেসবাড়ীতে ৩/৪ দিন থাকতেন তখনই দেখা যেতো একটি ছিপছিপে ছেলে আর তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করছেন। তখন আর কেউ সেখানে যেতে পারত না। পরে জেনেছি এঁর নাম নিত্যানন্দ সেনগুপ্ত। আচার্যদেবের প্রিয় ছাত্র।

জার্মানী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আচার্যদেবও একপ্রকার সম্মতি দিয়েছেন। ইংরাজী ভাল জানেন। ইতিমধ্যে জার্মান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখেছেন।

একদিন এঁর সাথে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর তিন রাত ধরে তর্ক হয়। রবীন্দ্রনাথ আদৌ কবি কিনা তাই নিয়ে তর্ক। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপদবাবু হার মানলেন। ভবিষ্যতে এই শ্যামাপদবাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক হন এবং রবীন্দ্র-নাথের কাব্য সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে। এই ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নিত্যানন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আচার্যদেবের সাথে নিত্যানন্দের গোপন আলোচনা কি বিষয় নিয়ে হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল। নিত্যানন্দ জার্মানী গেলেন না। আচার্যদেবের নির্দেশে অনুন্নতদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মহান ব্রত। নিরলস পরিশ্রম। সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে খুলনা জেলার তুরমুজখালীতে প্রথমে প্রাইমারী স্কুল পরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দেশ ভাগের পর তিনি এদেশে এসে ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সাহেবখালীতে একটি হাই-স্কুল স্থাপন করেন। পরে তিনি আচার্যদেবের নামে এই স্কুলের নামকরণ করতে চান। আচার্য-দেব নিত্যানন্দের নামেই স্কুলের নাম স্থির করে দেন। অনুন্নত শ্রেণীর বহু ছাত্র এই স্কুল থেকে পাশ করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে জ্ঞানের প্রদীপ তিনিই প্রথমে জ্বালেন।

আজকের দিনের যুবকেরা অনুন্নত সমাজের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। জার্মানী গিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা করে খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক হওয়ার মোহ ত্যাগ করে এমনিতর সমাজসেবায় আত্মবলিদান যে কতবড় ত্যাগ ও আদর্শবোধের পরিচায়ক তা তাদের পক্ষে বোঝাও খুবই কষ্টকর। নিত্যানন্দের মত নিঃস্বার্থ মানবদরদী সমাজ সংস্কারক আজ একান্তই দুর্লভ। একমাত্র যোগ্য গুরু আর উপযুক্ত শিষ্যের মিলনে এরূপ মহৎ কর্ম হওয়া সম্ভব।

[অনুলেখক : সন্তোষ বসু ও কুমার মিত্র]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস

অলয়জ্যোতি রায়চৌধুরী

'স্যার উইলিয়াম জোন্সের সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় সুধী গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে আমরা বহু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহা হইতে সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের জ্ঞানের কিছু পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়েও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয়—হিন্দু রসায়নের ইতিহাস এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে জটিলতার জন্যই এতাবৎ এই ক্ষেত্রে কেহ অগ্রসর হন নাই।'

তাই, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁর প্রিয় রসায়নশাস্ত্রের মতো দুরূহ বিষয়ের ইতিহাস রচনায় স্বেচ্ছায় ব্রতী হন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রেরণা ছিলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক এবং রসায়নশাস্ত্রের বিখ্যাত ইতিহাসকার মিঃ বার্থেলো।

আধুনিক যুগের ইউরোপের মতো অতীত যুগে বিশ্বের দরবারে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ভারতের পরম অবদান স্বীকৃত ছিল। যদিও পরাধীন ভারতে শাসক ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ও রাজনৈতিক ইতিহাস লেখক ধারাবাহিকভাবে অতীত ভারতের গৌরবকে খর্ব করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। এমনকি আজকের দিনেও, ইউরোপীয় দেশসমূহের কাছ থেকে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের স্বীকৃতি সহজলভ্য নয়। এরকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের পরাধীনকালে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস'-এ (প্রথম ভাগ) প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন জ্ঞানের পরিধি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'ধাতব এবং বিশেষ করে পারদ সংক্রান্ত ওষুধ ব্যবহারে বিশ্বে হিন্দুরাই পথপ্রদর্শক ছিলেন।' তিনি বৈদিক যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রসায়নের উন্নতির ইতিহাসকে চারটি স্তরে বিভাজন করেন। প্রথম, আয়ুর্বেদীয় পর্যায় (Ayurvedic Period from Vedic Age or Pre-Buddhistic Era to circa 800 AD), দ্বিতীয়, উন্নয়নশীল পর্যায় (Transitional Period from 800 AD to circa 1100 AD), তৃতীয়, তান্ত্রিক পর্যায় (Tantric Period from 800 AD to circa 1300 AD) এবং চতুর্থ, রসায়ন পরবর্তী যুগ (Latro-Chemical Period from 1300 AD to circa 1550 AD). তবে কোনো পর্যায়ই এককসম্পন্ন নয়, বরঞ্চ একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, পরিপূরকও বলা চলে।

আলোচ্য প্রবন্ধ হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাসে সীমাবদ্ধ থাকবে।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনাকালের বেশ কিছু পরে মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায়, আচার্যদেবের পক্ষে বোঞ্জ-যুগের প্রথমাবস্থার হরপ্পার সংস্কৃতি কাল, সিন্ধু উপত্যকার বাসিন্দাদের রসায়ন জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের কথা, বিশেষ করে মৃৎপাত্র তৈরীতে, ইট তৈরীতে এবং খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি ও ব্যবহার্য ধাতবপাত্রাদি তৈরীতে, সেই জ্ঞানের সু-উপযোগ বিশ্লেষণ করে সেই যুগকে চিহ্নিত করে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানকাল, সেই যুগকে ইতিহাসপূর্ব পর্যায় বা Pre-historic Period (4000 BC to 1500 BC) বলা হয়। এই আবিষ্কারের ফলে আচার্যদেবের গবেষণায় কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়নি, উপরন্তু হিন্দু রসায়নের প্রাচীনতা এবং ধারাবাহিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুরা যুগে সংকলিত ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় উপাদানগুলিতে দিন-পঞ্জী-লেখার রীতির প্রচলন ছিল না। সেকালের সংকলক বা লেখক বেশীর ভাগ সময় লেখার দিন-কাল বোঝাতে তদানীন্তন প্রোৎসাহী রাজার রাজত্বকাল উল্লেখ করতেন। কিন্তু কাল নিরূপণের কোনো সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায়, নানা ভাবনা ও জ্ঞানের আদি সূত্র গ্রীক বা হিন্দুদের কাছ থেকে পৃথিবী প্রথম পেয়েছে, এ-নিয়ে বিতর্ক আজও চলে আসছে। তবে এটা বোধহয় বলা অস্বাভাবিক নয় যে, একই সময়ে বা অল্প ব্যবধানে একই চিন্তা-ভাবনা দূরবর্তী দুটি দেশ অনুভব করে থাকতে পারে এবং একই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান তারা একই সাথে প্রয়োগ করে থাকতে পারে। কারণ, মানুষের বুদ্ধির বিকাশ বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশেও একই ধারায় ঘটতে দেখা গেছে। যাহোক ভারতবর্ষে প্রথম এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুবিন্যস্তভাবে রচিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' শ্রেষ্ঠ গবেষণা-কর্ম বলে স্বীকৃতি পায়।

আয়ুর্বেদীয় পর্যায়ে ভারতবাসীর রসায়ন জ্ঞান ঔষধ প্রস্তুতকরণে পূর্ণ বিকশিত হয়।

ঋগ্বেদের কালে (আনুমানিক 15th--12th Century BC বা তারও আগে) শুধুমাত্র সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এক সূক্তে (1, 162) আগুনে ঝুলিয়ে ব্রোঞ্জের পাত্রে মাংস রান্নার কথা আছে। ব্রোঞ্জ পাত্র ছাড়াও যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র, নির্মাণে ব্যবহৃত হত। সোনা দিয়ে গয়না তৈরী করা হত। ঋগ্বেদে লোহা ব্যবহারের উল্লেখ নিয়ে সব ভাষ্যকার একমত হতে পারেননি। ঐ সময় চামড়া সংস্কারের (tanning) উল্লেখ আছে। উৎসব এবং পূজা অনুষ্ঠানে সোমগাছের ডাল থেকে নিষ্কাশিত সোমরস পানের উল্লেখ ছাড়াও মধু এবং বার্লি থেকে উৎপন্ন সুরারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সময় উলের কাপড় প্রচলিত ছিল। তা' লাল বা খয়েরী রঙে রাঙান হত। রঙ গাছ-গাছড়ার নির্যাস থেকে তৈরী করা হত।

পরবর্তীকালে শুক্লযজুর্বেদে আরো দুটি ধাতুর ব্যবহার পাওয়া যায় যথাক্রমে সিসে এবং টিন। অথর্ববেদে শুধু সোনা, রূপা এবং তামার উল্লেখ আছে। এছাড়াও অথর্ববেদে বশীকরণ মন্ত্র, যাদু-বিদ্যা, প্রেতবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়সহ ভেষজগুণসম্পন্ন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস

অলয়জ্যোতি রায়চৌধুরী

'স্যার উইলিয়াম জোন্সের সময় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় সুধী গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে আমরা বহু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং তাহা হইতে সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদের জ্ঞানের কিছু পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়েও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয়—হিন্দু রসায়নের ইতিহাস এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে জটিলতার জন্যই এতাবৎ এই ক্ষেত্রে কেহ অগ্রসর হন নাই।'

তাই, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁর প্রিয় রসায়নশাস্ত্রের মতো দুরূহ বিষয়ের ইতিহাস রচনায় স্বেচ্ছায় ব্রতী হন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রেরণা ছিলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক এবং রসায়নশাস্ত্রের বিখ্যাত ইতিহাসকার মিঃ বার্থেলো।

আধুনিক যুগের ইউরোপের মতো অতীত যুগে বিশ্বের দরবারে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ভারতের পরম অবদান স্বীকৃত ছিল। যদিও পরাধীন ভারতে শাসক ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ও রাজনৈতিক ইতিহাস লেখক ধারাবাহিকভাবে অতীত ভারতের গৌরবকে খর্ব করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। এমনকি আজকের দিনেও, ইউরোপীয় দেশসমূহের কাছ থেকে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের স্বীকৃতি সহজলভ্য নয়। এরকম পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের পরাধীনকালে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস'-এ (প্রথম ভাগ) প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন জ্ঞানের পরিধি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'ধাতব এবং বিশেষ করে পারদ সংক্রান্ত ওষুধ ব্যবহারে বিশ্বে হিন্দুরাই পথপ্রদর্শক ছিলেন।' তিনি বৈদিক যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রসায়নের উন্নতির ইতিহাসকে চারটি স্তরে বিভাজন করেন। প্রথম, আয়ুর্বেদীয় পর্যায় (Ayurvedic Period from Vedic Age or Pre-Buddhistic Era to circa 800 AD), দ্বিতীয়, উন্নয়নশীল পর্যায় (Transitional Period from 800 AD to circa 1100 AD), তৃতীয়, তান্ত্রিক পর্যায় (Tantric Period from 800 AD to circa 1300 AD) এবং চতুর্থ, রসায়ন পরবর্তী যুগ (Latro-Chemical Period from 1300 AD to circa 1550 AD). তবে কোনো পর্যায়ই এককসম্পন্ন নয়, বরঞ্চ একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, পরিপূরকও বলা চলে।

আলোচ্য প্রবন্ধ হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাসে সীমাবদ্ধ থাকবে।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনাকালের বেশ কিছু পরে মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায়, আচার্যদেবের পক্ষে ব্রোঞ্জ-যুগের প্রথমাবস্থার হরপ্পার সংস্কৃতি কাল, সিন্ধু উপত্যকার বাসিন্দাদের রসায়ন জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের কথা, বিশেষ করে মৃৎপাত্র তৈরীতে, ইট তৈরীতে এবং খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি ও ব্যবহার্য ধাতবপাত্রাদি তৈরীতে, সেই জ্ঞানের সু-উপযোগ বিশ্লেষণ করে সেই যুগকে চিহ্নিত করে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানকাল, সেই যুগকে ইতিহাসপূর্ব পর্যায় বা Pre-historic Period (4000 BC to 1500 BC) বলা হয়। এই আবিষ্কারের ফলে আচার্যদেবের গবেষণায় কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়নি, উপরন্তু হিন্দু রসায়নের প্রাচীনতা এবং ধারাবাহিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুরা যুগে সংকলিত ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় উপাদানগুলিতে দিন-পঞ্জী-লেখার রীতির প্রচলন ছিল না। সেকালের সংকলক বা লেখক বেশীর ভাগ সময় লেখার দিন-কাল বোঝাতে তদানীন্তন প্রোৎসাহী রাজার রাজত্বকাল উল্লেখ করতেন। কিন্তু কাল নিরূপণের কোনো সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায়, নানা ভাবনা ও জ্ঞানের আদি সূত্র গ্রীক বা হিন্দুদের কাছ থেকে পৃথিবী প্রথম পেয়েছে, এ-নিয়ে বিতর্ক আজও চলে আসছে। তবে এটা বোধহয় বলা অস্বাভাবিক নয় যে, একই সময়ে বা অল্প ব্যবধানে একই চিন্তা-ভাবনা দূরবর্তী দুটি দেশ অনুভব করে থাকতে পারে এবং একই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান তারা একই সাথে প্রয়োগ করে থাকতে পারে। কারণ, মানুষের বুদ্ধির বিকাশ বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশেও একই ধারায় ঘটতে দেখা গেছে। যাহোক ভারতবর্ষে প্রথম এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুবিন্যস্তভাবে রচিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' শ্রেষ্ঠ গবেষণা-কর্ম বলে স্বীকৃতি পায়।

আয়ুর্বেদীয় পর্যায়ে ভারতবাসীর রসায়ন জ্ঞান ঔষধ প্রস্তুতকরণে পূর্ণ বিকশিত হয়।

ঋগ্বেদের কালে (আনুমানিক 15th—12th Century BC বা তারও আগে) শুধুমাত্র সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এক সূক্তে (1, 162) আগুনে ঝুলিয়ে ব্রোঞ্জের পাত্রে মাংস রান্নার কথা আছে। ব্রোঞ্জ পাত্র ছাড়াও যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র, নির্মাণে ব্যবহৃত হত। সোনা দিয়ে গয়না তৈরী করা হত। ঋগ্বেদে লোহা ব্যবহারের উল্লেখ নিয়ে সব ভাষ্যকার একমত হতে পারেননি। ঐ সময় চামড়া সংস্কারের (tanning) উল্লেখ আছে। উৎসব এবং পূজা অনুষ্ঠানে সোমগাছের ডাল থেকে নিষ্কাশিত সোমরস পানের উল্লেখ ছাড়াও মধু এবং বার্লি থেকে উৎপন্ন সুরারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সময় উলের কাপড় প্রচলিত ছিল। তা' লাল বা খয়েরী রঙে রাঙান হত। রঙ গাছ-গাছড়ার নির্যাস থেকে তৈরী করা হত।

পরবর্তীকালে শুক্লাযজুর্বেদে আরো দুটি ধাতুর ব্যবহার পাওয়া যায় যথাক্রমে সিসে এবং টিন। অথর্ববেদে শুধু সোনা, রূপা এবং তামার উল্লেখ আছে। এছাড়াও অথর্ববেদে বশীকরণ মন্ত্র, যাদু-বিদ্যা, প্রেতবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়সহ ভেষজগুণসম্পন্ন

লতাগুল্ম এবং গাছপালার বর্ণনা আছে। এই ভেষজের ব্যবহার হত দীর্ঘজীবন লাভ এবং চুল-বৃদ্ধির জন্য। লোকের বিশ্বাস ছিল, অদৃশ্য দৈত্য-দানবের দৃষ্টিপাতে অসুখ-বিসুখ হয়। 'ভৈষন্যানি' শ্রেণীভুক্ত ঔষধ-সে রোগ দমনে সাহায্য করে। আয়ু এবং স্বাস্থ্যবর্ধক ও স্থির যৌবন প্রাপ্তির জন্য 'আয়ুষ্যানি' শ্রেণীভুক্ত ঔষধের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে এই 'আয়ুষ্যানি' শব্দের সম-অর্থে রসায়ন শব্দের চল হয়। আরবদেশে রসায়ন শব্দের সম-অর্থে ব্যবহার হয় 'আলকিমিয়া' শব্দ যা থেকে ইউরোপীয় ভাষায় আলকেমি ও কেমিষ্ট্রি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সীসা, সোনা, সোমরস ও অন্যান্য ভেষজকে কেন্দ্র করে বৈদিকযুগে রসায়নের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ঔষধ প্রস্তুতিতেও তাদের ব্যবহার বৈদিকযুগে দেখা যায়।

আয়ুর্বেদের অর্থ হল আয়ু বা জীবনবেদ বা বিজ্ঞান। অথর্ববেদ থেকেই আয়ুর্বেদের উৎপত্তি মনে হয়। আয়ুর্বৈদিক যুগে রজন, লাক্ষা, হরিদ্রা, নীল মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি রঞ্জনের ব্যবহার জানা যায়।

বহু অতীতকাল থেকেই ভারতবাসীদের কাচের উৎপাদন বিদ্যাও জানা ছিল। উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে বস্তি জেলার কপিয়া নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে কাচ তৈরীর কারখানা আবিষ্কার হয়, যা' খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়। ঐ একই এলাকায় পিপরাহা নামক স্থানে এক বৌদ্ধস্তূপের নীচে কাচের এক পাত্রে বুদ্ধের দেহাবশেষ পাওয়া যায় যার গাত্রের পাঠোদ্ধার করে মনে করা হয় ঐ পাত্র কপিয়ার কারখানায় তৈরী হয়েছিল। এছাড়াও, অসংখ্য কাচের পুঁতি ও কাচ পাত্রের নানা আকৃতির টুকরো-টাকরা ঐ স্থানে পাওয়া গেছে। মহাভারত ছাড়াও ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'বাসবদত্তায়' ময়ূরের গলার মতো রঙীন কাচপাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অতীত ভারতবর্ষে কাচশিল্পের ধারাবাহিকতা এবং উন্নত অবস্থা বোঝা যায়। প্লিনি ভারতীয় কাচ শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন।

ভারতের নানা প্রত্নক্ষেত্র থেকে থালা বাটি আদি নানাবিধ পোড়ামাটির মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই পাত্রগুলি কারুকার্যমণ্ডিত এবং চমকপ্রদভাবে পালিশযুক্ত। এতে নানা রঙের বাহারও পাওয়া যায় যেমন কুচকুচে কালো থেকে হালকা নীল, লালচে খয়েরী থেকে ছাই রঙের। অনেক সময় এই রঙের ব্যবহার দেখে মৃৎপাত্রের সঠিক কাল-নির্ণয় করা যায়। ফেরিক অক্সাইডের ব্যবহারে পাত্রের রঙ লাল হত এবং ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের সাথে লৌহ অক্সাইডের মিশ্রণের নানা অনুপাতের উপর কালো, চকোলেট ইত্যাদি রঙ পাওয়া যেত। নীল বা সবুজ রঙের জন্যে কপার অক্সাইড ব্যবহার করা হত।

দেখা গেছে, পোড়ামাটির মৃৎপাত্রকে চকচকে করার জন্যে, সাধারণতঃ পোড়াবার আগে কাচের মতো একপ্রকার লেইয়ের প্রলেপ লাগান হত। যা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়ঃ Silica—88·12%, Aluminium Oxide—3·12%, Ferric Oxide—1·82%, Lime—1·26%, Alkalis—5·04%, Cupric Oxide—·46%, চুল্লীতে 1200°C তাপমাত্রায় মৃৎপাত্র পোড়ান হত।

সাঁচীতে প্রাপ্ত পাথুরে কারুকাজের উপর লাল রঙের এক প্রলেপ পাওয়া গেছে। লাল গিরিমাটির

সাথে চুন মিশিয়ে দেওয়ালে লাল বা গেরুয়া রঙের চুনকাম করা হত।

তামা গলান এবং ঢালাই-এর কাজ পঞ্চম খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হতো, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এক টন ওজনের সাড়ে সাত ফুট উচ্চতার এক তামার বুদ্ধমূর্তি এখানে পাওয়া যায় যা বর্তমানে বার্মিংহাম মিউজিয়ামে আছে। এছাড়াও অনেক ছোট ছোট তামার বুদ্ধমূর্তি, তামার তাল ইত্যাদি পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০ ফুট উঁচু এক বুদ্ধমূর্তির কথা লিখে গেছেন। এছাড়াও, খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে ভারতে বসতি স্থাপনকারী গ্রীক এবং ব্যাকটেরিয়ান নৃপতিগণ ছাড়াও ২য় খৃষ্টাব্দে কণিষ্ক, পরবর্তীকালে গুপ্তরাজারা এবং তারও পরের নৃপতিগণ তামার মুদ্রা ব্যবহার করতেন। তামা গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে এইসব মুদ্রা তৈরী করা হতো। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন তাম্রফলক পাঠ করে জানা গেছে, ৩য় খৃঃ পূর্বাব্দেও তার ব্যবহার ছিল। তামাকে পবিত্র ধাতু মনে করা হতো। তাই পূজা-আচ্চায় তামার পাত্রের ব্যবহার মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সভ্যতা কালে; বৈদিক যুগ থেকে আজও চলে আসছে। মেগাস্থিনীসের বিবরণে (৩য় খৃঃ পূঃ) প্রাচীন, বৌদ্ধস্তূপে তামার পাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধাতুযুগের বিকাশ ভারতেই সর্বপ্রথম হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বিহারের সিংভূম এবং হাজারিবাগ জেলার সমগ্র তামার খনি অঞ্চলে ধাতুমল ছড়ানো পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে জানা গেছে হাজার হাজার বছর আগে খনি থেকে তামার আকরিক বের করে তামা নিষ্কাশন করা হতো। এবং তার কয়েকটি খনির ব্যবহার আধুনিক কালেও হয়ে আসছে। আকরিক তামা কাঠ কয়লার আগুনে গলান হতো। গলন্ত তরল অশুদ্ধ তামাধাতু বকযন্ত্রের মাধ্যমে শুদ্ধ অবস্থায় মাটিতে কাটা গর্তে জমাট বাঁধান হতো। তামা শোধন প্রণালী প্রাচীন ভারতীয়দের জানা ছিল। তামা-আর্সেনিক মিশ্রিত খনিজ তামার সাথে অল্প পরিমাণ সীসে মিশিয়ে সহজে গলানো হতো। গন্ধক বা কার্বন ঘটিত আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশন পদ্ধতি জানা থাকায়, প্রাচীন ভারতীয়দের ধাতুবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অতি উন্নত পর্যায়ে ছিল বলা চলে। ব্রোঞ্জ এবং পিতলের মত মিশ্রধাতুর ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের উৎকর্ষতা এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, বঙ্গদেশ থেকেই এই শিল্প নেপাল এবং তিব্বতে প্রসার লাভ করে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৭ম খৃষ্টাব্দ) নালন্দায় একশ ফুট লম্বা পিতলের নির্মিত এক বিহারের বর্ণনা পাওয়া যায় যার নির্মাণ কাজ তখনও শেষ হয়নি। মূর্তি তৈরীতেও ব্রোঞ্জের মতো পিতলের ব্যবহার ছিল।

তক্ষশীলায় প্রত্নখননে কুষাণযুগের (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) নানারকম তৈজসপত্র, স্নানাগারে ব্যবহৃত পাত্র, রান্না-বান্নার বাসন, গয়না-পত্র এবং শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এই সময়ে ব্যবহৃত তামার শুদ্ধতা 99·7% পর্যন্ত ছিল। ব্রোঞ্জে টিনের অনুপাত 21-25% পাওয়া গেছে, বাসন-পত্রাদিতে ব্যবহৃত এই ব্রোঞ্জে টিনের অনুপাত

বেশী থাকায়, গলনাঙ্ক নিম্নাঙ্কে থাকত, ফলে তাদের প্রস্তুতি কর্ম সহজতর হয়েছিল। সেই সময় বাসন-পত্র ঝালাই করার চল ছিল। তক্ষশীলায় রূপার বাসন-পত্র ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে রূপো এবং সোনার অলঙ্কার পাওয়া গেছে যার আনুমানিক কাল ৩য় খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে আনুমানিক ৩য় খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তক্ষশীলায় রূপো এবং সোনার গয়না, তামা এবং ব্রোঞ্জের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা হত। গয়নায় অলঙ্করণ, ফিলগিরীর কাজ এবং পাথর সেটের কাজ প্রথম খৃষ্ট শতকেই তক্ষশীলার স্বর্ণকার এবং মণিকারদের জানা ছিল। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত নানা লৌহ-উপকরণ তক্ষশীলায় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে তৈজসপত্র, যুদ্ধাস্ত্র, ছুতোর ও কুমোরদের উপযোগী এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিই প্রধান। কপিলাবস্তুর কাছে পিপরাতে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে ব্যবহৃত লোহার বর্শাফলক, কাঁটা এবং পেরেক পাওয়া গেছে। এছাড়া লোহার তালও পাওয়া গেছে। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে ব্যবহৃত লোহার বন্ধনী এবং ঐ স্থানেই বৌদ্ধস্তূপের ভিত নির্মাণে লোহার ধাতুমল ব্যবহারে, (যা এখন কলকাতার যাদুঘরে রাখা আছে), প্রমাণ হয় ভারতীয়দের লৌহ ধাতু নিষ্কাশনের জ্ঞান তৃতীয় খৃঃ পূর্বাব্দেই ছিল।

চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে রাজপুতনার পুষ্করণের রাজা চন্দ্রবর্মন, সম্ভবত মথুরার কাছে বিষ্ণুপদ শৃঙ্গে একটি লৌহস্তম্ভ, বিজয়স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে রাজা অনঙ্গপাল দ্বিতীয় (1050 AD) দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে তা বর্তমান স্থানে সংস্থাপিত করেন। স্তম্ভটি ২৪ ফুট লম্বা, পায়ের দিকে বেধ ১৬.৪ ইঞ্চি এবং মাথার দিকে ১২ ইঞ্চি মোট ওজন ৬ টনের মতো। থামের উপরের দিকে সাড়ে তিন ফুট এক মাথা বসান আছে। গরম লৌহপিণ্ড পরস্পর জুড়ে এবং পিটিয়ে এই স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছিল। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই লোহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। এতে লোহা 99·720%, Carbon 0·080%, Silicon 0·046%, Sulphur 0·006%, Phosphorus 0·114%, Manganese Nil% ছাড়া অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত নেই। ফলে, ধারণা করা হয় যে, ফসফরাসের ভাগ শতকরা বেশী হওয়ায় এবং তুলনায় গন্ধক অত্যন্ত কম এবং ম্যাঙ্গানীজ না থাকাতেই দিল্লীর লৌহস্তম্ভ মোর্চেহীন থাকে। আবার অনেকে এমনও অনুমান করেন যে ঐ স্তম্ভটিতে Magnetic Oxide (FeO_4)-এর এক হাল্কা আস্তরণ থাকায় জং ধরে না। যাই হোক, সারা পৃথিবীর কাছে দিল্লীর এই লৌহস্তম্ভ প্রাচীন ভারতের ধাতুবিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যার উৎকর্ষতার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ হিসেবে আজও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সৃষ্টিকর্ম আজকের দিনেও বিস্ময় সৃষ্টি করে। 640 খ্রীষ্টাব্দে গঠিত ভুবনেশ্বর মন্দিরে লোহার অনেক বন্ধনী এবং বীমের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ইস্পাতের ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য রাজের সভাসদ্ Ktesias বলে গেছেন, পারস্যরাজ এবং তাঁর মাতা তপাকে ভারতীয় ইস্পাতে তৈরী ছুটি তরোয়াল দান করেছিলেন। পেরিপ্লাসও বলে গেছেন, খৃষ্ট জন্মের প্রথম শতকে ভারতবর্ষ থেকে ইস্পাত এবং লোহা

আফ্রিকা থেকে অ্যাবিসিনিয়া পর্যন্ত রপ্তানী হত। অশোকের শিলা-লেখগুলি এত সুন্দর এবং পরিচ্ছন্নভাবে খোদাই করা পাওয়া গেছে যে অনুমান করা হয়, চতুর্থ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও সূক্ষ্ম ইস্পাতের লিখন-পাতির ব্যবহার ছিল। এ ছাড়াও, সুশ্রুতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে শল্য চিকিৎসা-উপযোগী অনেক যন্ত্রপাতির বর্ণনা আছে, যা থেকে ঐ সময়ে ইস্পাতের ব্যবহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। রাজা পুরু বিজিত হবার পর আলেকজাণ্ডারকে তিরিশ পাউণ্ড ওজনের ইস্পাত-পিণ্ড ভেট দিয়েছিলেন। এ-থেকে অনুমান করা হয়, ঐ সময়ে ইস্পাত মহার্ঘ বস্তু ছিল। এমনও প্রমাণ আছে যে ভারতীয় ইস্পাত এবং লৌহ তু'হাজার বছর আগেও পশ্চিমদেশে রপ্তানী করা হত। ইউরোপে তার নাম ছিল উজ (Wootz)। এই উজ হায়দ্রাবাদ, মাইশোর, সালেম প্রভৃতি স্থানে উৎপাদিত হত। বিখ্যাত দামাস্কাস্ ব্লেড এই উজ থেকেই তৈরী হত। ইস্পাত উৎপাদন-পদ্ধতি ভারতীয়দের কাছ থেকে প্রথমে পারসীকরা এবং তাদের কাছ থেকে আরবরা শিক্ষা করে। এই পদ্ধতিতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই সেদিনও, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ইস্পাতের উৎপাদন হত। আচার্যদেব তাঁর হিন্দু রসায়নের ভূমিকায় লিখেছেন, ধাতু প্রস্তুতের প্রণালীসমূহ যা 'রসার্ণবে' বর্ণিত হয়েছে তার উপরে খুব কমই উন্নতি সাধন করা যায় এবং সেই প্রণালীসমূহকে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের যে কোনো পুস্তকে হুবহু উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধদেবের সময়ে এবং পরবর্তীকালে পাণিনির সময়ে নীল, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রজন ইত্যাদি রঙের ব্যবহার পাওয়া যায়। ফিটকিরী নামক রাগ-বন্ধনীর সাহায্যে মঞ্জিষ্ঠার দ্বারা সে সময়ে বেশ টকটকে লাল রঙ প্রস্তুত হত। নীলের পাতা থেকে নীল রঙ করার প্রণালী এবং রাগ-বন্ধনীর আবিষ্কার হিন্দুদেরই। এভাবে সুতা পাকা রঙ করে এবং কাপড় রপ্তানী করে তারা দেশ-বিদেশ থেকে বহু অর্থ উপার্জন করত। রঙ—গাছের শিকড়, কাণ্ড, বাকল, পাতা, ফুল এবং ফল থেকে নিষ্কাশন করা হত। ভারতবর্ষে কালির ব্যবহার খৃ. পূ. চতুর্থ শতাব্দী থেকেই হয়ে আসছে। তালপাতায় এবং গাছের বাকলে অতীতকাল থেকেই অমোচনীয় কালি দিয়ে লেখা হত। অজন্তার মুরালগুলো সীসে (red lead) এবং হিঙ্গুল মিশ্রিত একপ্রকার কালি দিয়েই রাঙানো হয়েছে।

বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় গাছের ফুল, যেমন—বকুল, চাঁপা ইত্যাদি থেকে সুগন্ধ তৈরী করার পদ্ধতি বর্ণিত আছে। বৃহৎ সংহিতায় তু'রকম সিমেণ্ট জাতীয় পদার্থের বর্ণনা আছে—যাদের একটিকে বজ্রলেপ, যা দেওয়ালে লেপন করলে দেওয়াল বজ্রের মত শক্ত হত এবং অপরটিকে বজ্র-সংঘট বলা হত। যার ব্যবহারেও বজ্রের মত কঠিন গঠন সৃষ্টি হত এবং হাজার বছরের স্থায়িত্ব লাভ করত। বৌদ্ধযুগের মন্দির-গঠন-প্রণালীতে এর ব্যবহার দেখা যায়।

অতীতকালে ফলিত রসায়নের নানা আবিষ্কারের ফলে জগতে ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। এছাড়াও শিক্ষা-ক্ষেত্রে তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, অমরাবতী, নালন্দা, কাশী, কাঞ্চী, বিক্রমশীলা, মাত্বরা, বলভী, প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের গৌরব বৃদ্ধি

করেছিল। আজকাল যেমন শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয়রা ইউরোপ, আমেরিকায় যায়, এক সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে একই উদ্দেশ্যে ছাত্ররা ভারতবর্ষে আসত।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদেও ব্যবসায়ী চিকিৎসকদের উল্লেখ আছে। 'চরক' এবং 'সুশ্রুত' কবিরাজ সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত অতি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ। পুরাকালে দেশ-বিদেশ থেকে নানা চিকিৎসক দল এসে হিমালয়ের কাছাকাছি কোনো স্থানে নিয়মিত মিলিত হতেন এবং পারস্পরিক জ্ঞান আদান-প্রদান করতেন। পরে তা লিখিত হত। এই রকমই এক চিকিৎসকদের সম্মিলনীতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ চরকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তক্ষশীলা খুব প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। চরক ও সুশ্রুত কোন সময়ে লেখা এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। চরকের নাম পাণিনির সূত্রে পাওয়া গেছে। প্রফুল্লচন্দ্র এ-রকম অন্যান্য সূত্র অবলম্বনে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, 'চরক' প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের, 'সুশ্রুত' চরকের পরে রচিত হয়েছে।

সুশ্রুতে অস্ত্রচিকিৎসার কথা আছে। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের কবিরাজদের মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসা বহুদিন পূর্বে লোপ পেয়েছে। ম্যাকডোনেলের মতে, আধুনিক ইউরোপ ভারতীয়দের কাছ থেকেই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নাকের গড়ন ভালো করার পদ্ধতি শিক্ষা করেছিল। অর্শ, পাথুরী ও ভগন্দর রোগে অস্ত্রোপচার করার কথা সুশ্রুতে আছে। অস্ত্রোপচার দ্বারা জরায়ু থেকে সন্তান বের করার প্রণালী হিন্দু কবিরাজরা জানতেন। তখনকার দিনের ব্যবহৃত ১২৭ রকমের অস্ত্রোপচার যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সব ইস্পাতেই তৈরী হত। একটি চুলকে লম্বালম্বিভাবে কাটতে পারে এমন সূক্ষ্ম যন্ত্রকেই অস্ত্রোপচারের পক্ষে উপযুক্ত এবং ভাল বলে বিবেচনা করা হত।

প্রাচীনকালে কায়-চিকিৎসায়ও হিন্দু কবিরাজেরা যথেষ্ট দক্ষতা এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সুশ্রুতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের পাতা, শিকড়, ফুল ও ফলের গুণাগুণ, বিষাক্ততা, রোগ-আরোগ্যের ক্ষমতা, ব্যবহার পদ্ধতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। চরকে আছে এরণ্ড তেল বিরেচনে শ্রেষ্ঠ। নানারকম সাপ ও ইঁদুরের ক্ষতিকর বিষের প্রকারভেদ এবং নরনারীভেদে তাদের প্রভাব ইত্যাদির বর্ণনা সুশ্রুতে আছে। সর্পাঘাতের চিকিৎসার বিবরণও তাতে পাওয়া যায়। মশার দংশন যে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ তাও সুশ্রুতে আছে। এসব থেকে বোঝা যায় পুরাকালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে হিন্দুরা অগ্রণী ছিল। এ বিষয়ে তাঁরাই জগতের প্রথম শিক্ষাগুরু।

গ্রীক চিকিৎসকদের দক্ষতায় না কুলানোয়, ভারত বিজয়ের সময় সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর শিবিরে ভারতীয় চিকিৎসকদের নিযুক্ত করেছিলেন। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল্-রশীদের চিকিৎসার জন্যে অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে মানকা নামক এক চিকিৎসক গিয়েছিলেন। হিন্দু চিকিৎসকরা শুধু আরবে নয়, মিশরদেশ পর্যন্ত চিকিৎসা করতে যেতেন। এই পরম্পরা বৈদিক-যুগ থেকেই চলে আসছিল বলে মনে করা হয়। ইউরোপে হিপোক্রেটিসকে চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্মদাতা বলা হয়। তবে তাঁর ঔষধের প্রয়োগ ও

ব্যবহার সম্বন্ধীয় আলোচনা হিন্দুদের কাছ থেকেই ধার করা। আধুনিক কালের চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো হিন্দুদের প্রাচীন চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তকে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শরীর-সংস্থানবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে, হিন্দুরাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্মদাতা। আধুনিক যুগেও মনে করা হয়, চিকিৎসাবিদ্যায় উন্নতি রসায়ন বিদ্যায় উন্নতি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের চিকিৎসাশাস্ত্রে উন্নতি রসায়ন জ্ঞানের উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়।

ভারতবর্ষের রসায়নশাস্ত্রে এই ব্যুৎপত্তি কিন্তু চিরস্থায়ী হয়নি। মধ্যযুগ থেকে তার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। তবে এই ক্রমাবনতির কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বুদ্ধ-উত্তরযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকালে জাতিভেদ প্রথা নতুন প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। ফলতঃ সমাজের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, কায়িক শ্রমযুক্ত কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে নেয়। পরিণতিতে, বংশ পরম্পরাগতভাবে শিল্পীর নিপুণতা আবহমান থাকলেও সত্যের সন্ধানে জ্ঞানের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই দেখি, যেসময় পাশ্চাত্যদেশে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, বয়েল, নিউটন, ডাল্টন বা মেণ্ডেল জন্মগ্রহণ করে যাচ্ছেন, তখন এই ভারতবর্ষ জ্ঞানের আলো থেকে অন্তর্হিত হয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে অপসৃয়মান হয়ে চলেছিল। যে ভারতবর্ষে সুশ্রুতের কালে কবিরাজদের শল্য চিকিৎসা অপরিহার্য ছিল, তা ভাগবত-পরবর্তী-যুগে অপ্রচলিত হয়ে যায়। মনুর অনুশাসনে, মৃতদেহ স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হত। যে ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্য থেকে মধ্যযুগের সাহিত্যে সমুদ্র-বাণিজ্যের ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই ভারতবর্ষেই বেশীদিন আগে নয়, ব্রিটিশ আমলেই সমুদ্রযাত্রা করলে ভারতবাসীদের সমাজচ্যুত হতে হত।

এছাড়াও ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং যন্ত্রসভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশকালে দেশী-গ্রামীণ শিল্পের নাভিশ্বাস ওঠে।

বর্তমানকালেও দেশীয় গবেষণা-পদ্ধতির মাধ্যম পরিহার করে শিল্পে উন্নতিতে বিদেশী সহযোগিতায় শিল্প-পত্তনের প্রবণতা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা দেখে এবং শিক্ষায় মৌলিক চিন্তার প্রতি নিরুৎসাহভাব দেখে মনে হয়, ভারতবর্ষ অনতিকালে রসায়নবিদ্যায় তার অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করবে, এই আশা দুরাশা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশীয় ভেষজ এবং ফলিত রসায়নের বিকাশকল্পে পরাধীন ভারতবর্ষে, "বেঙ্গল কেমিক্যাল" স্থাপন করে যে দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন তা এই বিংশ শতাব্দীতেও শিল্পে বিকাশশীল স্বাধীন ভারতবর্ষে একক দৃষ্টান্ত হয়েই রইল। দুঃখ এখানেই।

সাহায্য ঃ

১। আত্মচরিত/প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২। History of Chemistry in Ancient and Medieval India Incorporating the History of Hindu Chemistry by Acharya Prafulla Chandra Ray/Edited by P. Ray

৩। ঋগ্বেদ সংহিতা/শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

৪। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস /ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

৫। J. Marshall / Taxila Pottery, Ancient India, 1947, P/74

৬। Taxila, Archaeological Survey Report, 1935-36.

৭। A. Ghosh / Excavations at Taxila, Ancient India, 1948, P/41.

৮। S. Piggott/Prehistoric India

৯। Origin & Evolution of Indian Clay Sculpture / C. C. Das Gupta

১০। সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান /শ্রীঅতুল সুর

১১। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র/ডঃ ইন্দ্র

১২। A Vedic Reader for Students /A. A. Macdonell

১৩। হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস (প্রথম ভাগ)/আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সমর মিত্র

এক বন্ধু স্যার রায়ের শত জন্মবার্ষিকীতে 'বিপ্লবী বৈজ্ঞানিক' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। তার লেখা আমার পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে এই প্রবন্ধটি জানি বাংলাদেশের দৈনিক কাগজে খুব প্রশংসা কুড়িয়েছে গত বছরে।

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে হয় প্রথম ভারতবাসী যিনি এডিনবরা থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলায় ফিরে স্যার জগদীশের সাথে প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন। পরে সেদিনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী স্যার আশুতোষের ডাকে তাঁর চেষ্টা ও স্যার পালিতের বিরাট দানে গড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে তিনি যোগ দেন। তিনি এর সামান্য ল্যাবরেটরীতে শব সাধনার মত প্রথম স্বাধীন গবেষণায় হাত দেন নতুন একদল তরুণ ছাত্রের সহযোগে। দেখতে দেখতে তাঁর আশ্চর্য আবিষ্কার মার্কিউরিয়াস নাইট্রাইট (Mercurous Nitrite) প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়, আরও পরে পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় তাঁর এই কাজ প্রচুর প্রশংসা পায়। এইভাবে তিনি প্রথম কৃতি ছাত্রদের কাছে গবেষণার দোর খুলে দেন। তাই তিনি ও স্যার জগদীশ ভারতে প্রথম স্বাধীন বিজ্ঞান গবেষণার জন্মদাতা—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আবার তিনি স্যার জগদীশের মত প্রথম বিজ্ঞানকে দেশের সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের বনিয়াদ গড়েন। তাই তাঁর হাতে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসাবে ভেষজ শিল্প বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করেন। পরে ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীন অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ার কাজে—চক্রবর্তী চ্যাটার্জী কোং (বই), বেঙ্গল পটারিজ, বেঙ্গল কেমিক্যাল আরও বড় বড় শিল্প গড়ার কাজে তাঁর নানাভাবে সাহায্য উল্লেখ করা যায়। তিনিই প্রথম হাতে কলমে দেখান যে পাশ্চাত্য জগতে নানা শিল্পগোষ্ঠীর মত ভারতে নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় সামান্য মূলধনে বড় শিল্প গড়া যায়। এইদিক থেকে তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যের কৃতিত্ব প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা দরকার। ডঃ সাহার River Physics নদী পদার্থ বিদ্যার আবিষ্কারের ফলে ডি.ভি.সি. পরিকল্পনা, পৃথিবীর বিখ্যাত টেনোটভ্যালী পরিকল্পনার মত সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় স্বাধীন ভারতের কৃষিশিল্পের শ্রেষ্ঠ বনিয়াদ স্থাপন করেছে।

(এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে তাঁর নাইট অর্থাৎ স্যার উপাধির সাথে জড়িয়ে আছে তাঁর ভারতের পক্ষে অমর বৈজ্ঞানিক অবদান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যখন যুদ্ধের ফলে বিদেশ হতে যুদ্ধের মূল্যবান মালমসলা আমদানী বন্ধ—তখন স্যার রায়

সেই দুর্দিনে মানিকতলায় বিরাট প্লান্ট স্থাপন করে সালফিউরিক এসিড প্রচুর পরিমাণে তৈরী করে যুদ্ধাস্ত্র গড়ার অন্যতম উপাদান যোগান দেন। তাই এই 'স্যার' উপাধি গভর্ণমেণ্টের তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি।)

এইবার এইসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের শিল্পোন্নয়ন Industrialisation-এর ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলাদেশে বড় বড় শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান ভূমিকার কথা ত বলেছি। Example is better than precept অর্থাৎ হাতেকলমে কাজ উপদেশের চেয়ে মূল্যবান—এই প্রবাদবাক্য অনুধাবন করে বাঙলাসহ সারা ভারতে শিল্প-ব্যবসা স্থাপনে ঝড়ের মত ছুটে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, অনেক মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানের তিনি উদ্বোধন করেন। তিনি বক্তৃতায় তরুণ ভারতবাসী বিশেষ বাঙালীদের চাকুরীর গোলামী জীবন ছেড়ে শিল্প-কৃষি-ব্যবসায়ে লেগে যেতে উপদেশ দেন—দিনের পর দিন মাসের পর মাস। এক এক সময় দিনে তিনি ১৫০০ মাইলও ঘুরেন—এই বিজ্ঞান তপস্বী। তাই তিনি বিশেষতঃ বাঙালীর কাছে ব্যুকার ওয়াশিংটন; তাদের জাতি গড়ার ক্ষেত্রে পিতা—Father of Bengali Nation. অবশ্য এই দিকে তাঁকে সেদিন এমনকি এখনও বিচ্ছেদবাদী-প্রদেশবাদী বলে গালি দেওয়া হয়।

তাঁর জীবনের বিশেষ কীর্তির কথা এখনও আমরা বলিনি, সে হচ্ছে তাঁর দধীচির মত আত্মত্যাগে তাঁর বৈজ্ঞানিকের তাপস কামী জীবনে সৃষ্টি করেছেন একদল বিশ্ববিখ্যাত কৃতিবিজ্ঞানী—ডঃ সাহা, ডঃ জ্ঞান ঘোষ, ডঃ নীলরতন সরকার, ডঃ শিশির মিত্র, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ইত্যাদি। তিনি জানতেন তাঁর স্বাধীন ভারতের শিল্পগঠন স্বপ্ন সফল করতে হ'লে একদল সার্থক-কৃতি বিশ্বজয়ী বৈজ্ঞানিক দরকার, যাঁরা দেশের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্পসৌধ গড়ে তুলবে। তাই মনে করতে হয় এঁদের হাতে গড়া সাহা ইনষ্টিটিউট, খড়্গপুরের আই. আই. টি., ক্যালকাটা কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স; প্রসঙ্গতঃ, বাঙ্গালোর ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স ইত্যাদি। এঁরাই ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, গবেষণা ও মডার্ণ টেক্‌নোলোজির ক্ষেত্রে ভারতের নব্য বৈজ্ঞানিকের সূতিকাগার।

এবার আচার্য রায়ের জীবনে শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন Industrialisation কেন বিফল হয়, তা এবার আলোচনা করা দরকার। একথা আমাদের আজ স্বীকার করতেই হবে স্বাধীন ভারত গড়ার সত্যকার বৈজ্ঞানিক ঋষি, স্বপ্নদ্রষ্টা স্যার রায় সারা ভারতের বলতে গেলে সত্যকার পিতা-জনক। তাঁর তুলনা তিনি। এতবড় বিরাট পুরুষ হয়েও তিনি ছিলেন গান্ধীর পার্শ্বে ভারতের অগুনতি গরীববেশে সহজ সরল অনাড়ম্বর খর্বাকার মানুষটি। তিনি চাননি সম্মান, সুনাম, অর্থ, তাঁর সারা জীবনের শেষ কড়িটুকু তিনি শিক্ষা বিস্তারে দিয়ে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বড় ঋণী তাঁর কাছে এ কে না জানে! এ অবস্থায় সারা ভারতবাসী ত বটেই বিশেষ বাঙালীর কাছে তিনি চিরস্মরণীয় পুরুষ। ভারত সরকার বা বাংলা সরকার স্বাধীনতার পরে নানা প্রতিষ্ঠান তাঁর নামে গড়ে তাঁর স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করেছে, কিন্তু স্বাধীন জাতির পিতা হিসাবে অন্য রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠ নেতার সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়নি।

এই ত্রুটি দূর করতে গিয়ে আমরা বাঙালী তাঁর দেশবাসী স্যার রায়কে যে দেবতুল্য ঋষি হিসাবে তাঁর সম্মান দেবো এটা স্বাভাবিক ; বিশেষতঃ যখন দেশের সরকারের অবহেলায় স্যার রায়ের আরম্ভ করা কাজ আর আদর্শ নানাভাবে মুছে যেতে বসেছে।

কয়েকটা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে স্যার রায়ের এই সর্বাঙ্গীণ আলোচনা আবার শুরু করা। গান্ধীর সেদিনের জাতীয় স্বাধীনতার অসহযোগ-অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন খাদি ও কুটিরশিল্প আন্দোলন আর বারবার জেলে যাওয়া—স্যার রায় কখনও মনে মনে মেনে নেননি, একথা তাঁর অনেক কথা হতে বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রধান বনিয়াদ শিল্প একথা স্যার রায় খুব ভালভাবে জেনেই সারাজীবন বৈজ্ঞানিক তপস্বী হিসেবে বাংলায় পীঠস্থান স্থাপন করে সারা ভারতে তিনি এর প্রচারে নেমেছেন। একথা আমরা লিখেছি এমনকি মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন আর নতুন ব্যবসা উদ্বোধনে ডাক দিতেন এও উল্লেখ করেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর গ্রামে কেন তিনি জমিদার সমাজের মায়া কাটাতে পারেননি ? কেন দেশ গাঁয়ের হাইস্কুল, সেবাশ্রম আর এডুকেশন ফাণ্ডে বরাবরই জমিদারেরা বিশেষ করে কাটিপাড়ার অত্যাচারী বোসেরা সেখানে সর্বেসর্বা হয়ে বসেছে ? কেন ফাণ্ডের কর্তৃত্ব গ্রামের ধুরন্ধর গাঁতিদারের হাতে সব সময় থেকেছে ? অথচ তিনি জানেন না তাঁর নাম ভাঙিয়ে এরা গ্রামে নিম্নশ্রেণীর পরে ভীষণ পীড়ন চালায়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর নির্দেশে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য সেবাশ্রমের দুয়ার এই জমিদার পুঙ্গবেরা খুলে দিতে চায় না, এও ঘটনা।

এবার সবশেষে বড় প্রশ্ন আসে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ ও দলে দলে জেলে যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। অথচ তিনি কেন তার প্রতিবাদ করেননি ? অথচ স্যার রায় অনেককে জেল থেকে বের হবার পর দেখা করতে গেলে এদের কাছে অনুযোগ করেছেন, গলায় মালা পরে জেলে না যেয়ে দেশের গঠনমূলক কাজ—ব্যবসা শিল্প গড়ার কাজে (অর্থাৎ সত্যকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা) তাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত ছিল। খাদি কুটিরশিল্প এ দেশে স্বরাজ আনবে গান্ধীর এই আদর্শ বৈজ্ঞানিক শিল্পী স্যার রায় কখনও বিশ্বাস করতেন না। অথচ খাদি আন্দোলনে—তাঁর সময় ও অর্থ অনেক ব্যয় করেছেন কাটিপাড়ার বনেদি জমিদারদের সাহায্যে খাদি-চরকা-তাঁতের জন্য। অনেক টাকা ব্যয় করে সেবাশ্রম তৈরী করেন।

আমরা জানি স্যার রায় গরীবদরদী, দুর্ভিক্ষে, বন্যায় রিলিফ আন্দোলনে ভিক্ষার ঝুলি সারা জীবনে তাঁর কাঁধ হতে নামান নি। আর তাঁর সুনামে আর অক্লান্ত ত্যাগে বাংলার যুবকরা দলে দলে ভলান্টিয়ার দলে যোগ দেয় আর প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে অনেক দুস্থ লোককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান।

সামগ্রিক বিচারে স্যার রায় সেই সীমাবদ্ধ রেনেসাঁস যুগে অন্যতম পথিকৃৎ। আজ তাঁর ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে সমগ্র দেশ তাঁর জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রদর্শিত পথ নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েও আজও অনুস্মরণীয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন

জ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল

পরাধীন ভারতে জাতির নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি বিজ্ঞানী, ইতিহাস বেত্তা, রসায়ন-শিল্প প্রবর্তক এবং আরও অনেক অনেক স্রোত-ধারায় তাঁর অমর প্রতিভা প্রসারিত। কিন্তু পরাধীন দেশে জাত-পাতের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাঁকে এক অবিস্মরণীয় অমরত্ব দান করেছে। ব্রিটিশ-ভারতে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে তিনি অন্যতম পুরোহিত ও প্রবর্ত্তক।

'Profulla Chandra was a pioneer of social reform in the country. Long before the movement against untouchability was launched by Mahatma Gandhi, Profulla Chandra by his numerous speeches and writings used to fight against this and many other social evils like caste-system, child marriage, dowry system, communalism, purdah system, etc.'

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)

উক্ত অনুচ্ছেদের সারমর্ম হলো, মহাত্মা গান্ধীর অনেক আগে প্রফুল্লচন্দ্র সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন এদেশে শুরু করেছিলেন।

আমাদের দেশে জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতা একটি মৌলিক সামাজিক ব্যাধি। সুদীর্ঘ কালব্যাপী এই ব্যাধি ভারতীয় সমাজকে নানাভাবে পীড়িত করেছে! সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রগতির বিরুদ্ধে এই ব্যাধি বাধাস্বরূপ এবং সেকারণে পরাধীন ভারতের ন্যায় বর্তমান স্বাধীন দেশেও এই ব্যাধি কৃষি ও শিল্পের বিকাশের পথে মস্ত বড় বাধা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই ব্যাধির উৎপত্তি অনুসন্ধান করে নিম্নমর্মে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন :

'বংশানুক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। জাতিভেদ-পীড়িত ভারতেও এমন কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে মনে হয় যে, কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ বংশানুক্রমিক। বর্তমান ভারতে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও শিক্ষাবিস্তারের পর পুনা ও মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ, বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং যুক্ত-প্রদেশের অধিবাসী কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্য হইতেই সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ভব হইয়াছে।'

(আত্মচরিত, পৃষ্ঠা ৩৯০)

জনসংখ্যার মাত্র ৫ ভাগ যারা, তাদের মধ্যে সমস্ত প্রতিভার জন্ম সম্ভব হলো একমাত্র জাতিভেদের কারণে, অন্যদিকে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের প্রতিভাবানদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা করে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর উক্ত আত্মচরিতে প্রমাণ

করেছেন যে, পৃথিবীর সব দেশে জাতিভেদের অভিশাপ ও অবিচার বিশেষ কিছু ছিল না এবং অত্যন্ত নিম্নমানের পেশায় নিযুক্ত পরিবারগুলিতে বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের জন্ম হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বিদগ্ধ আলোচনায় বলছেন ঃ 'এই সব দৃষ্টান্ত হইতে এই মহান শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কৃষক, খনির মজুর, নাপিত বা মেষপালকের বৃত্তিতে কোন সামাজিক অমর্য্যাদা নাই। ঐ সব দেশে পরিশ্রম করিয়া সাধুভাবে জীবিকার্জ্জন সম্মানজনক বিবেচিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমের মর্য্যাদা নাই। যাহারা "ভদ্রলোক" বলিয়া পরিচিত, তাহারা অনাহারে মরিবে, তবু কায়িক শ্রমের কাজ করিবে না,—বরং সামান্য বেতনের কেরানীগিরিতে সন্তুষ্ট হইবে। অনেক সময় সে আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া পরগাছার মত জীবনধারণ করিতেও লজ্জিত হয় না।'

(ঐ পৃষ্ঠা ৩৯৩)

জাতিভেদ কায়িক শ্রমকে অমর্যাদার আসনে বসিয়েছে। সে কারণে বর্ণ-বৈষম্যের দরুন 'ভদ্রলোক শ্রেণীর' এক অংশের দরিদ্র মানুষ অনাহারে কালাতিপাত করছে। এই অভিশাপ প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যুর চার দশক পরেও কমবেশী সক্রিয়।

জাতিভেদের অভিশাপে দেশ কিভাবে কৃষি ও শিল্পে পিছিয়ে পড়েছে, সেকথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

তিনি আবারও বলেছেন ঃ

'আমাদের চামার, জোলা, তাঁতি, নাপিতেরা আবহমানকাল হইতে সেই একঘেয়ে পৈতৃক ব্যবসা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জীবনের কোন পরিবর্তন নাই, আনন্দ নাই। আমাদের কতকগুলি শ্রমশিল্পী অস্পৃশ্য জাতীয় এবং তাহারা যেভাবে দিনের পর দিন পৈতৃক ব্যবসা চালায়, তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হিন্দু ভারতের বাহিরে, লোকে যে কোন ব্যবসা বা জীবিকা অবলম্বন করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদার হানি হয় না। সমাজের যে কোন স্তরে তাহারা বিবাহ করিতে পারে, এবং এই কারণে তাহারা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারে।' (ঐ)

নতুন নতুন শিল্প প্রবর্তনে জাতিভেদ যে একটা মস্ত বাধা, সেকথা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর জীবনকালেই অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছিলেন।

জাতিভেদ-পীড়িত হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা, তার ছুঁৎমার্গগামিতা প্রফুল্লচন্দ্রকে অতি শৈশবকাল থেকে ভাবিত করেছিল। হিন্দু সমাজের এই সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি হিন্দুধর্মের পথ পরিহার করে ব্রাহ্মধর্মের পরিমণ্ডলে নিজেকে সমাসীন করেন। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র উদার ব্রাহ্মধর্মের রসে নিজেকে জারিত করে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সমাজে নীচের দিকের সম্প্রদায়গুলির বিশেষ করে, মাহিষ্য, যোগী সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, তন্তুবায় সম্প্রদায়ের জাতিগত সম্মেলনগুলিতে যখনই আমন্ত্রণ পেয়েছেন, তখনই অন্যান্য কাজ রেখে ঐগুলিতে সামিল হয়েছেন।

যেমন 'বাঙ্গালী ব্যবসা কর' এই রণধ্বনির প্রবক্তা হয়েও তিনি যেমন প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট নন, তেমনি এই সব সম্প্রদায়গত সম্মেলনগুলিতে

উপস্থিত হওয়া ও যথোচিত ও সময়োপযোগী ভাষণ প্রদান সত্ত্বেও তাঁকে সাম্প্রদায়িক বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। কারণ প্রফুল্লচন্দ্র বুঝেছিলেন, এইসব প্রচেষ্টাগুলি মূলতঃ রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সম্মেলন, সম্প্রদায়গুলির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

এক সময়ে তিনি হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আহূত সম্মেলনেও সামিল হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁর অন্য কিছু নয়, এই সম্মেলনের মঞ্চকে রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা।

আমরা কপোতাক্ষ-তীরবাসিগণ প্রফুল্লচন্দ্র প্রবর্তিত ও অনুশীলিত উদার ভাবধারার পরিমণ্ডলে আবাল্য লালিত হয়েছি। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় তাঁর জন্মভূমি রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে যখন সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল, তখন বর্তমান লেখকসহ আমরা বহু গ্রামবাসী সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলাম। আমরা পরবর্তীকালে অনুভব করেছিলাম যে, প্রফুল্লচন্দ্র সংস্কারমুক্ত উদার গণ-তান্ত্রিক যে পরিবেশ প্রবর্তন করেছিলেন। সেটাই আমাদের সাম্যবাদী আন্দোলনের পক্ষে প্রভূত সহায়ক শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল।

"আমাদের দেশের হরিজন সমস্যা এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূলে যে-মনোবিকার আছে তার মতো বর্বরতা পৃথিবীতে আর কি আছে জানি না। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি না, অথচ সে কথা স্বীকার না করে নিজেদের বঞ্চনা করতে যাই।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঃ আদর্শ শিক্ষক জীবনের পটভূমি

—শিক্ষাব্রতী

ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অসংখ্য কৃতীছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আচার্যদেব সম্পর্কে বলেছেন, "আজও মনে পড়ে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা যেদিন তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে গুরু-শিষ্যের সেই পরিচয় দিনের পর দিন ঘনীভূত নিবিড়তর ও সার্থক হইয়াছে। স্নেহমুগ্ধ মনে আজ সেই সকল দিনগুলি স্মরণ করিতেছি।

তাঁহার ক্লাসে যখনই শিক্ষালাভ করিতে যাইতাম, অনুভব করিতাম চারিদিক নূতন হাওয়া বহিতেছে। শিশুর মত খোলামন লইয়া গুরুদেব আমাদের সকলকেই অতি আপনার জন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবার, আলাপ-আলোচনা করিবার, তর্ক করিবার, জানিয়া লইবার অবাধ স্বাধীনতা আমাদের ছিল। তিনি প্রণম্য, অসীম তাঁহার জ্ঞান, কিন্তু তিনি আমাদের অতি নিকট বন্ধুসম ছিলেন। তাঁহার মধুর হাসি, তাঁহার অকপট ব্যবহার, তাঁহার অনাড়ম্বর বাসগৃহ, তাঁহার শুচিস্নিগ্ধ বেশ, তাঁহার নিরলস কর্মব্যস্ত জীবন, তাঁহার উৎসাহ যেন যাদুমন্ত্রবলে আমাদের জীবনধারাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন 'সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিতে হইবে কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।'

মানুষের সকল শিক্ষার মূলে আছে সংযমের সাধনা। আচার্যদেব নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া ও মানিয়া চলিতেন। সেইজন্যই তাঁর চিররুগ্ন দেহ তাঁহার কাজের অন্তরায় হয় নাই। আত্মশাসনব্রতে নিজেকে কঠোরভাবে নিয়োগ করিয়া বছরের পর বছর এই শীর্ণদেহখানিকে অপরিবর্তিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জীবনকে একটি ধরা-বাঁধা একটি প্রাত্যহিক ছকের মধ্যে আনিয়া তিনি যে কর্মবহুল জীবনযাপন করিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর।

স্বার্থ বলিতে তাঁহার অবচেতন মনেও কিছু ছিল না। বাংলার সমাজজীবন ও রাজনীতিক্ষেত্র হইতেও তিনি দূরে সরিয়া থাকেন নাই।... পরাধীনতার জ্বালা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বরাজের স্বপ্ন তিনি দেখিতেন—স্বরাজ পাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবশক্তি দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যে বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল তাহাতে আচার্য রায়ের সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা কম নহে। আচার্য রায়ের আবাসস্থল সায়ান্স কলেজ হইতে গোপনে শৈলেন ঘোষের আমেরিকা যাত্রা ইহার একটি দৃষ্টান্ত।"

আজ যদি আমরা বিদ্যালয়ে, কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ

করেছেন তাঁদের জীবন, শিক্ষণপদ্ধতি ও ছাত্রদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক লক্ষ্য করি তবে তাঁদের কারও কারও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকলেও আর কোন বিষয়ে তাঁর সাথে সাদৃশ্য বা উৎকর্ষ মেলে না। পরাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষাদানের সীমিত সুযোগ, চরম দারিদ্র্য এবং শিক্ষাবিষয়ে সরকারের চরম ঔদাসীন্যের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের মত আচার্য আবির্ভূত হলেন। অথচ আজ দেশ স্বাধীন, সরকারী আনুকূল্যে শিক্ষাদানের অপূর্ব সুযোগ, দেশের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য সৃষ্টিধর্মী এবং নিরলস বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের একান্ত প্রয়োজন। তাদের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন আদর্শ শিক্ষকেরা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের মত আচার্য দুর্লভ। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এর কারণ কি?

যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রকে দেশবরেণ্য আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পরিবার এবং তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাবে।

বাল্যজীবনে পিতার প্রভাব ঃ

আচার্যদেবের পিতা ১৮২৬ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার দিনে 'পারসী'ই আদালতের ভাষা ছিল। তিনি একজন মৌলভীর কাছে 'পারসী' ভাষা শেখেন। তিনি অনেক সময় বলতেন যে, যদিও তিনি হিন্দুর ঘরে জন্মেছেন কবি হাফিজের 'দেওয়ানা' তাঁর মনের গতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। তিনি গোপনে মৌলভীদত্ত সুস্বাদু মুরগীর মাংস পর্যন্ত খেতেন। পরিবারের লোক একথা জানতে পারলে পিতৃদেবের আচরণে স্তম্ভিত ও মর্মাহত হতেন। এই সংস্কারমুক্ত পিতা পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর কলেজে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য পড়বার সময় দেবচরিত্র রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। নিঃসন্দেহে এই শিক্ষকের প্রভাবে তাঁর সামাজিক চেতনা আরও উন্নত হয়। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অচলায়তনকে ভেঙে ফেলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে প্রবল থেকে প্রবলতর হ'তে থাকে। জ্ঞানপিপাসা তীব্রতর হয়। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ও আরবী জানতেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর বেশ দখল ছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তৎকালীন সমাজের প্রগতিশীল মনীষীদের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। ১৮৬০ সালে আচার্যদেবের জন্মের এক বছর আগে তাঁর পিতা বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছিলেন। সেই সময়ে এই সংস্থার মাধ্যমে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৃটেনের উদীয়মান ব্যবসায়ী সংস্থার সাথে একযোগে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন।

তাঁর পিতা সঙ্গীত ভালবাসতেন এবং ওস্তাদের মত বেহালা বাজাতে পারতেন। সন্ধ্যাকালে তাঁর বৈঠকখানায় সঙ্গীতের জলসা বসত। যে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বাংলাদেশে হিন্দুসঙ্গীতের পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ। তিনি 'নব্য বাংলার' ভাবে অনুপ্রাণিত হন। তাই তিনি স্বগ্রামে 'বিধবা বিবাহ' দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হন এবং ১৮৫২ সালে রাড়ুলীতে বালিকা বিদ্যালয়

স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ যশোহর-খুলনায় এই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়।

হাফেজ, সা'দী এবং ইংরাজ সাহিত্যিকদের গ্রন্থপাঠে তাঁর উদার মন গঠিত হয়। লক্ষণীয় যে তৎকালীন যুগে নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে প্রায় দুর্গম সুন্দরবন নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী হয়েও তাঁর পিতা নব্যবাংলার প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারার সাথে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেছিলেন।

যেমন করে ঠাকুরবাড়ীর প্রগতিশীল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় এবং তাঁর চরিত্র ও মানসিকতা গঠনে তার প্রভাব অপরিসীম, তেমনি প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যজীবন সুদূর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামে তাঁর প্রগতিশীল ও উদার মনোভাবাপন্ন পিতার সৃষ্ট সুস্থ পরিবেশে অতিবাহিত হয়। তাঁর সংস্কারমুক্ত মানসিকতা ও জ্ঞানান্বেষণের অসীম স্পৃহা এবং দেশপ্রীতির বীজ এই সময়ে উপ্ত হয়।

পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ঃ

আচার্যদেব ও তাঁর ভাইদের সাথে তাঁর পিতার সম্পর্ক ছিল একান্ত সহজ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। সুযোগ পেলে নানা বিষয়ে পিতার সাথে গল্প করতেন। এই আলোচনার মাধ্যমে পিতার বহুমুখী পাণ্ডিত্য তাঁকে মুগ্ধ করত। জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তুলত। অথচ তখনকার দিনে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ছিল একটা দূরত্ব যা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' থেকে জানা যায়।

পিতার গ্রন্থাগার ঃ

ছেলেদের উচ্চশিক্ষাদানের জন্য ১৮৭০ খ্রীঃ আচার্যদেবের পিতা বড় ভাইদের সাথে তাঁকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। হেয়ার স্কুলে ভর্তি করলেন। হঠাৎ ১৮৭৪ খ্রীঃ কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন। দু'বছরের জন্য পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এলেন গ্রামের বাড়ীতে। তাঁর বাবার ছিল একটি বিরাট গ্রন্থাগার। যেন শাপে বর হ'ল। তখনকার দিনে বই-এর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। বাংলায় প্রকাশিত সব ভাল বই, ইংরাজী ভাষার সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব বই ছিল আর ছিল সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং জার্মান ভাষার বই।

আচার্যদেবের বয়স তখন তের। জানার ইচ্ছা ছিল প্রবল। অফুরন্ত সময় আর পাঠাগারের অগণিত বই। শুরু করলেন পড়া—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সব বুঝতেন না—তবুও পড়তেন। জনসনের ডিক্সনারী তাঁকে আকৃষ্ট করল চুম্বকের মত। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা থেকে অনেক মূল্যবান উদ্ধৃতি ছিল। কি আনন্দ পেতেন এগুলি কণ্ঠস্থ করে—প্রবীণ বয়সেও কথার ফাঁকে এই উদ্ধৃতির উল্লেখ প্রায়ই শোনা যেত। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভালবাসার সূত্রপাত এই পড়াশোনার মধ্যে থেকে। শেক্সপীয়ারের বিয়োগান্ত নাটকগুলি পড়তেন কিন্তু ভাল বুঝতেন না। কিন্তু যে আকর্ষণ জন্ম নিল এই পাঠে—তা ফল্গুস্রোতের মত প্রবাহিত হ'ল জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত—প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে শেক্সপীয়ার পাঠ ছিল অবশ্যকর্তব্য—মানসিক সুস্থতা রক্ষার উৎস। এই সময়ে ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ পাঠে তিনি অনুপ্রাণিত হ'ন অতীতকে জানবার জন্য। পরবর্তীকালে

প্রাচীন ভারতের রসায়নশাস্ত্রের গবেষণামূলক গ্রন্থরচনায় এই অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে অদৃশ্যশক্তিরূপে চালিত করে। তাই তিনি বলেছেন, "তখন বুঝি নাই যে, পুরাতত্ত্ব বই-এর প্রতি আমার আকর্ষণ পরবর্তীকালে 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' রচনায় আমায় সাহায্য করবে।"

বৈজ্ঞানিক হয়েও সারাজীবন সাহিত্যপ্রীতির বীজ এখানেই উপ্ত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারেযে বিলেত যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের মেজদার নিজস্ব পাঠাগার রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

জীবনচরিত পাঠের প্রভাব ঃ

তিনি আত্মচরিতে বলেছেন, 'স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে আমার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিত না। চেম্বারের জীবনচরিত আমি কয়েকবার আগাগোড়া পড়িয়াছি। নিউটন ও গ্যালিলিওর জীবনী আমার বড় ভাল লাগিত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী চিরদিনই আমার নিকট আদর্শ ছিল। কিরূপ সামান্য বেতনের একজন কম্পোজিটার হইতে তিনি নিজের অদম্য অধ্যবসায় ও দুর্জয় শক্তির দ্বারা দেশের একজন প্রধান ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন তাহা সবিস্ময়ে স্মরণ করিতাম।'

এই জীবনীপাঠের আদর্শ তিনি নিজের জীবনে অনুসরণ করেছিলেন আবার শিক্ষাদানকালে সুযোগ পেলেই এইসব জীবনের জীবন্ত ছবি তিনি আগ্রহভরে তুলে ধরতেন ছাত্রদের সামনে। সংগ্রামই জীবন, দৃঢ় সিদ্ধান্তে অটল থেকে কাজ করলেই সাফল্য সুনিশ্চিত—এই ছিল তাঁর বাণী।

আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব ঃ

সুস্থ হয়ে তিনি অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হলেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্ণধার কেশবচন্দ্র সেন এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রাণ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়। আচার্যদেব 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, 'আদর্শ শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংসর্গের প্রভাব কিরূপ তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম।'

ছাত্রদের মন জয় করার যে মধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আচার্যদেব অর্জন করেছিলেন, বাল্যজীবনে পিতা ও পুত্রের মধুর সম্পর্ক এবং আদর্শ শিক্ষকের সান্নিধ্যলাভের মাধ্যমে তার ভিত্তি রচিত হয়। এই সময়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাসের প্রভাব প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করত।

কঠোর শৃঙ্খলাবোধের সূত্রপাত ঃ

তখনকার সমৃদ্ধ জমিদারেরা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। কিন্তু আচার্যদেবের পিতা ছিলেন নিয়মশৃঙ্খলার অনুসারী। নিজে খুব ভোরে উঠতেন এবং সারাদিনের কাজ একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা ছিল। নিঃসন্দেহে বালক প্রফুল্লচন্দ্র অবচেতনভাবে এই শৃঙ্খলা অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। পরবর্তী জীবনে এর ফল হয় সুদূর প্রসারী। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব তাঁকে নিরলস কর্মবহুল প্রাত্যহিক জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে।

পরোক্ষ প্রভাব ঃ

দীর্ঘদিন রোগভোগে তাঁর স্বাস্থ্য বাল্যকালেই ভেঙে পড়ে। এই রুগ্ন দেহকে কর্মক্ষম ও সুস্থ

রাখতে হলে চাই কঠোর শৃঙ্খলার অনুসরণ। পরোক্ষভাবে এই ভগ্নস্বাস্থ্যও তাঁকে প্রাত্যহিক জীবনে সময়ানুবর্তিতা পালনে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে তিনি পরবর্তী জীবনে ছাত্রদের কাছে নিয়ম ও শৃঙ্খলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের শৃঙ্খলাপালনে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম।

ডেভিড হেয়ারের প্রভাব ঃ

তিনি তখন হেয়ার স্কুলে আবার ভর্তি হয়েছেন। নতুন বাড়ীতে স্কুল স্থানান্তরিত হয়েছে। তৎকালীন যুগে ডেভিড হেয়ার ছিলেন এদেশে ইংরাজী শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম অগ্রদূত। দেওয়ালে প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে কয়েক লাইন লেখা ছিল। তার মর্ম হ'লঃ ডেভিড হেয়ারের জীবন একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হয়েছে। এই লাইনটি তাঁর মনের উপর কিরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তা বোঝা যায় বৃদ্ধ বয়সে সেই লাইনটি হুবহু মুখস্থ বলতে পারায়। শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড হেয়ারের অবদান তাঁকে কতখানি অনুপ্রাণিত করে তা বোঝা যায় আচার্য হিসাবে তাঁর ভূমিকা এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মাঝে শিক্ষা প্রসারের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব ঃ

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে প্রফুল্লচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন। এই সময় একদিকে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন অপর দিকে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতা জাতীয় জীবনে এক নব চেতনার সঞ্চার করে। তখন সুরেন্দ্রনাথ এই কলেজের অধ্যাপক। শুধু তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য তিনি এই কলেজে ভর্তি হন। সুরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় তরুণ ছাত্র-হৃদয়ে স্বদেশীয় এক নব উন্মাদনা জেগে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের এই প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর ছাত্রদের সংস্কার মুক্ত মন গড়ে তোলার জন্য এবং জাতির সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য নিজের জীবন ও উপদেশের মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব ঃ

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে, স্বাদেশিকতা ছিল সেই যুগের ধর্ম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও এই যুগধর্মে দীক্ষিত হন।

স্বদেশীযুগে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্বাদেশিকতার প্রভাবে গড়ে ওঠে, সেই পরিষদেরই প্রতিষ্ঠিত যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত।) তখন প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কলেজে অধ্যাপনায় ব্যস্ত। কিন্তু এই শত্রুর শিবিরে শ্বাসরোধকারী পরিবেশের মধ্যে স্বাদেশিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে একদিকে ছাত্রদের বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করাতে এবং অন্যদিকে গবেষণাকে শিল্প গড়ার কাজে প্রয়োগের জন্য নিরলস পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর

ছাত্রদের বিদেশের ডি. এস-সি. ডিগ্রী গ্রহণে নিরস্ত করলেন। তাদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুললেন। তাই তিনি বলেছেন—আমাদের দেশে মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীমানদ্বয় বিলাতী ডিগ্রীর মোহে স্বাদেশিকতা খর্ব করেননি। এ পরম গৌরবের কথা। এর পিছনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব ঃ

দেশ পরাধীন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন দ্রুতবেগে প্রসারিত হতে লাগল। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশনেতারা সর্বস্ব ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করলেন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে। দেশের অগণিত মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। তাদের সাথে একাত্ম হতে গেলে চাই তাদের প্রতি গভীর ভালবাসা আর ত্যাগধর্মে দীক্ষা। অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপনই হবে দেশভক্তির প্রকৃত পরিচয়। প্রফুল্লচন্দ্র স্বাদেশিকতার এই আদর্শ মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। অনাড়ম্বর সরল জীবন, অকুণ্ঠ নিঃস্বার্থপরতা আর স্বহস্তে কাটা সূতায় তৈরী খদ্দরের কাপড়ের শুচিস্নিগ্ধ বেশ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনাদর্শের জীবন্ত সাক্ষ্যরূপে ছাত্রদের মনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করত। তাদের চরিত্র ও আদর্শ জীবন গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

সেবাধর্মে দীক্ষা দান ঃ

১৯২০ সালে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা আর ১৯২১ সালে খুলনায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সরকার উদাসীন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ। প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রদের নিয়ে অগণিত দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর বয়স ষাট বছর—চিররুগ্ন জীর্ণদেহ। কিন্তু জাতির বিপদে তিনি আবির্ভূত হলেন পরিত্রাতার ভূমিকায়। উদাত্ত আহ্বান জানালেন দেশবাসীর কাছে। অবাক বিস্ময়ে তাঁর ছাত্রবৃন্দ লক্ষ্য করল জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ তাদের শ্রদ্ধেয় আচার্যদেবকে! সেবাধর্মে তারা দীক্ষিত হ'ল তাঁর কাছে। তিনি প্রমাণ করলেন যে আদর্শ শিক্ষক হবেন আদর্শ দেশপ্রেমিক; ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবেন দেশ সেবায়।

এইভাবে পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাদেশিকতার যুগে, জাতীয় চেতনার উন্মেষের পটভূমিকা পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র আদর্শ আচার্যরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

লক্ষণীয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে গ্রামে, গঞ্জে ও শহরে যে সামান্য সংখ্যক স্কুল ও কলেজ বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠে, সেখানে যে সমস্ত শিক্ষক জনপ্রিয় ছিলেন তাঁরা কখনই অর্থের লোভে নিজের কর্মস্থল ছেড়ে অন্য স্থানে যেতে চাইতেন না। সেবা ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তাঁরা। যার ফলে তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অনেক ভাল ছাত্র তৈরী ও তৎকালীন অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় দেশসেবীদের দীক্ষা গুরু হলেন তাঁদের স্কুলের শিক্ষক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর অন্যতম শ্রদ্ধেয় স্কুল শিক্ষক। ছাত্রপ্রীতি, ত্যাগ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনই ছিল জীবনধর্ম।

বর্তমানে তাঁর মত আদর্শ শিক্ষক দুর্লভ কেন ?

ভিন্নজাতীয় পরিবেশ ঃ

পরাধীন দেশের ক্রমবিকাশমান জাতীয় চেতনা ও আন্দোলন যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল আজ জাতীয় পরিবেশ ও মানসিকতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, আমরা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বিভিন্ন দলের যে সমস্ত নেতারা ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছেন, আজ তাঁদের অনেকেই ভোগবিলাসে মত্ত ; তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ক্রমশঃ চারিদিকে সোচ্চার। কমবেশী সব দলেই একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানসিকতা সুবিধাবাদের এবং আত্মকেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন। জাতীয় আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা তাঁদের যখন এই চারিত্রিক অধঃপতন এবং এই অধঃপতনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী কোনো আন্দোলন গড়ে উঠছে না, তখন 'যে যা পার গুছিয়ে নাও' এই মনোভাব চারিদিকে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। স্বদেশ-প্রীতি যেন বিলুপ্ত প্রায়।

এই জাতীয় পরিবেশের প্রভাব শিক্ষক সমাজের ওপর কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ত্যাগ আর সেবার আদর্শ আজ আর তাঁদের অনুপ্রাণিত করে না বরং বিপরীতটাই রূঢ় সত্য—কিভাবে আয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি করা যায় এই চিন্তায় তাঁরা বিভোর। সমাজের অন্য অংশের বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতার অন্ধ অনুসরণে একান্তই উদ্‌গ্রীব। দেখা যায় যে যদি কোন শিক্ষক ত্যাগ ও সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন এবং ছাত্রসমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন তখন তিনি প্রায় ক্ষেত্রে হয়ে পড়েন সতীর্থদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের লক্ষ্য। কখনও কখনও তাঁর এই ত্যাগকে নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক বলে মনে করা হয়।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিষয়টি দিনের পর দিন স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে তা হ'ল কর্তব্যবোধে চরম অবহেলা। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবহেলার পরিণতি কি ভয়াবহ তা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। দেশব্যাপী এই কর্তব্যহানির মানসিকতা ক্যান্সার রোগের মত সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এর শিকার হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক গড়ে ওঠা সম্ভব কি ?

সৃষ্টিধর্মী শিক্ষকের অভাব ঃ

বর্তমানে বহু উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী ও প্রতিভাবান শিক্ষক অধ্যাপনায় ব্যস্ত আছেন। কিন্তু তাঁদের অধ্যাপনা বা শিক্ষাদান ছাত্রদের সৃজনী মনোভাবকে জাগ্রত করতে পারে না। এবং তাঁদের পাঠ্য বিষয় ছাত্রদের সার্থকরূপে অধিগত হয় না। তার কারণ আচার্যদেব ব্যাখ্যা করেছেন। এইসব শিক্ষক বা অধ্যাপকেরা নিজেদের সৃজনী প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁদের কর্মে আর অধ্যাপনায় উপস্থিত করতে পারেন না। ফলে তাঁদের অধ্যাপনা প্রতিভার উদ্বোধন ঘটাতে পারে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের গবেষণায় যাঁরা ব্যস্ত তাঁরা প্রায়ই অধ্যাপনাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেননি। অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে তাঁরা এই গবেষণার যোগ্য মূল্যলাভে উৎসাহী।

ছাত্রপ্রীতির একান্ত অভাব ঃ

বর্তমানে অনেক প্রতিভাবান পাণ্ডিত্যে বহু প্রশংসিত শিক্ষক অধ্যাপনা করেন। কিন্তু তাঁদের সাথে তাঁর ছাত্রদের সম্পর্ক আদৌ ঘনিষ্ঠ নয়; খুব আনুষ্ঠানিক। তাঁরা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত —এই মনোভাবই তাঁদের ছাত্রদের সাথে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করে। যে দেশপ্রেম ছাত্রপ্রীতির মূল উৎস—তাঁদের আচরণে তার অভাব প্রকট। মানসিকতার দিক থেকে আত্মকেন্দ্রিক; ফলে ছাত্রদের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কই যথেষ্ট বলে মনে করেন।

অনাড়ম্বর জীবনযাপনে উন্নাসিক মনোভাব ঃ

যে ভোগ-বিলাসের প্রবণতা শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে, শিক্ষক সমাজও নিঃসন্দেহে তার শিকার হতে বাধ্য। শিক্ষকের ত্যাগ ও সরল অনাড়ম্বর জীবন ছাত্র-সমাজকে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে তোলে, তাঁর কথায় ও কাজে অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁর জীবনাদর্শে ছাত্ররা প্রভাবিত হয়, অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশ সেবা এবং সংযমী জীবনযাপনে দীক্ষিত হওয়া—তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। শিক্ষকদের দায়িত্ব শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা পাঠ্যবিষয় ছাত্রদের সহজভাবে অনুধাবনে সাহায্য করা নয়, তাদের সৃজনধর্মী কর্মে উদ্বুদ্ধ করা, চরিত্র গঠন করা এবং দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকেরা প্রথম কাজটিকে একমাত্র কাজ বলে মনে করেন। আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য—নিজের জীবনধর্ম দিয়ে ছাত্রদের আদর্শ ও চরিত্রগঠনে সাহায্য করা—একথা তাঁরা আজ কার্যতঃ স্বীকার করেন না। তাই ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ ও সংযম যে একান্ত প্রয়োজন, তাঁদের ভোগবিলাস প্রবণতা তাঁদের সেকথা অনুভবে বাধার সৃষ্টি করছে। কথায় ও কাজে পরস্পর বৈপরীত্য এবং তাঁদের চরিত্রের দ্বৈততা আদর্শ শিক্ষকরূপে গড়ে ওঠার পথে প্রধানতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পারিবারিক পরিবেশ ঃ

অতীতে যৌথ পরিবারে যে ত্যাগ ও পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার পরিবেশ ছিল আজ তা নেই। একক পরিবারের বাবামায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। আজকের দিনে অভিভাবকেরা সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক জীবনের অনুসারী। তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্য ও অর্থের দ্বারা সন্তানকে ভাল ছাত্র-ছাত্রীরূপে গড়ে তুলতে চান একথা সত্য। কিন্তু তাদের কূপমণ্ডুক মানসিকতা সৃষ্টিতে তাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন—কিভাবে তারা পরীক্ষায় ভাল করবে, কিভাবে তারা ভাল মাইনের চাকরী পাওয়ার জন্য নিজেদের মেধাকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করবে—সে সম্পর্কে তাদের মানসিকতা গড়ে তুলবার জন্য তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই পরিবেশে যারা মানুষ হয় তারা ভবিষ্যতে আদর্শ শিক্ষকরূপে গড়ে উঠবার মানসিক প্রস্তুতিই লাভ করে না। তারা দেশকে ভালবাসতে শেখে না। ত্যাগ ও সেবাকে ঘৃণা করতে শেখে; সুস্থ সামাজিক চেতনা বিকাশে তারা অভিভাবকের কাছ থেকে কোন সাহায্য পায় না বরং বিপরীত মনোভাব সৃষ্টিতে তার অভিভাবকেরা উদ্যোগী হন।

তাছাড়া বাল্যকালে কোন সন্তান তার চোখের সামনে পিতামাতার চরিত্রে দ্বৈততা লক্ষ্য করে ; তাঁদের চরিত্রের মহত্ত্ব তাদের চোখে পড়ে না বরং আত্মকেন্দ্রিক জীবনাদর্শে ক্রমশঃ প্রভাবিত হয়।

অবশ্য যদি কোন শিক্ষক পরবর্তীকালে পড়াশুনার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন তবে বাল্যজীবন থেকে শৃঙ্খলাবোধ, পাঠানুরাগ প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে না ওঠায় ছাত্রদের আপন করে নিতে পারলেও তাঁর দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অথচ আদর্শ শিক্ষকের অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন জীবনই ছাত্রদের চরিত্র গঠনে অন্যতম প্রধান উপাদান। তিনি জনপ্রিয় হ'লেও আদর্শ শিক্ষকরূপে ছাত্রদের চরিত্র ও মানসিকতা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন না।

সুতরাং এই পটভূমিকায় আমরা হয়তো জনপ্রিয় অথবা শিক্ষাদানে দক্ষ শিক্ষক পাব কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের মত আচার্য পাওয়া যাবে না। এটা দুঃখের বিষয় হ'লেও বাস্তব রূঢ় সত্য। অথচ জাতীয় জীবনে তাঁর মত শিক্ষক আজ একান্ত প্রয়োজন।

কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হবার পেছনে যে-মনস্তত্ত্ব কাজ করে

১। অজানা আশঙ্কার শিকার
২। অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ
৩। কম যোগ্যতায় বা পরিশ্রমে বেশী লাভের বা উচ্চ পদপ্রাপ্তির বাসনা
৪। অপরের ওপর প্রভুত্ব করার বাসনা
৫। পরিবেশ ও অভ্যাসগত প্রকার

["সমাজ ও বিজ্ঞান" পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৮৪ সংখ্যা থেকে]

নবযুগের উজ্জ্বলতম প্রতিভা

সমর বাগচী

এই ১৯৮৬ সালে আমরা ভারতের দুই যুগন্ধর মানুষকে স্মরণ করছি, তাঁদের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অপরজন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আজ যখন এক ভাঙ্গন ও অবক্ষয়ের চিত্র চারিদিকে পরিব্যাপ্ত, যখন কবি জীবনানন্দের ভাষায় "গভীর আঁধার আসিয়াছে এক পৃথিবীতে আজ", তখন এইসব মানুষদের জীবন ও কর্মকে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুলে ধরা দরকার। আমাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে জানতে হয় আধুনিক জীবনকে অনুধাবন করবার জন্য যাতে আমরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ভালোভাবে করতে পারি। বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা তাই পরিকল্পনা নিয়েছে একটি প্রামাণ্য প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন ও কর্মকে সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরার। এই কার্যে আমাদের সহায়তার হাত এগিয়ে দিয়েছেন আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী এবং Indian Academy of Sciences। ২রা আগষ্ট এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হতে চলেছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তনের পর ভারতবর্ষের পুরনো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কর্মোদ্যোগের কাজ ধীরে ধীরে শুরু হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্তানতিনোপোলের পতনের পর পুরাতন গ্রীক সভ্যতার সহিত পরিচয়ের পর যেমন ইউরোপে রেনেসাঁসের জন্ম হয়, অনেকটা প্রায় সেরকমই নানা কারণে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, উনবিংশ শতাব্দীতে এক নবযুগের সূচনা হয়। বাংলাদেশে সেই সময় এক নবজীবনের জোয়ার আসে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই নবযুগেরই এক উজ্জ্বলতম প্রতিভা।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুধুই বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে জাতীয় জীবনকে পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, বিজ্ঞানের উৎস প্রয়োগে, এই বোধ এসেছিল তাঁর প্রবল জাতীয়তাবোধ থেকে। তাই তিনি বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করলেন জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার কাজে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, দেশকে উন্নত করতে গেলে জাতীয় শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তিনি ভারতে আধুনিক রসায়ন চর্চার জনক।

আচার্য রায়ই ভারতের প্রথম বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক। তাঁর লিখিত 'History of Hindu Chemistry' এখনও ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভারতীয় ঐতিহ্য বলতেই হিন্দু দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তার

কথা বলা হয়। কিন্তু আচার্য রায়ই প্রথম দেখালেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে দার্শনিক চিন্তার সাথে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতাও এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। তিনি তাঁর উপরিউক্ত গ্রন্থে এই বস্তুবাদী ঐতিহ্যের কথা লিখেছেন। যে দেশ চরক ও সুশ্রুতের মত চিকিৎসক এবং পাণিনির মত ভাষাবিদের জন্ম দেয় সে দেশকে শুধুই আধ্যাত্মিক চিন্তার দেশ বলা ঠিক নয়। আমরা যদি শুধু সংস্কৃত বর্ণমালার দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব, কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শব্দের উৎপত্তি স্থলের ব্যুৎপত্তি থেকে সেই বর্ণমালাকে সাজানো হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এইভাবে বর্ণমালাকে সাজানো হয়নি। আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে পাণিনি ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন, ইউরোপে সেই চিন্তা আধুনিক যুগে আলোচিত হয়েছে। একটি দেশের চিন্তার পরিমণ্ডলে বস্তুবাদী চিন্তার ব্যাপক প্রসার ছাড়া ভারতীয় চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে এইসব ফসল ফলত না। মার্কসীয় দার্শনিক অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় চিন্তায় বস্তুবাদী ঐতিহ্যের কথা বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯১৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র একটি বক্তৃতায় পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞান চর্চায় ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রণীত রামচন্দ্রের 'রসেন্দ্রচিন্তামনি' এবং যশোধরের 'রসপ্রকাশ সুধাকর' থেকে যে দুটি উদ্ধৃতি দেন তা পড়লে আশ্চর্য হতে হয়। "প্রথম গ্রন্থটিতে বলা হইয়াছে, 'বিদ্বজ্জনের নিকট যাহা শ্রুত হইয়াছি অথবা শাস্ত্রাদি হইতে শিক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হই নাই, এমন সকল কিছু আমি বর্জন করিয়াছি। পক্ষান্তরে, আমার সুধী শিক্ষকদের নির্দেশ অনুসারে যে সকল প্রক্রিয়া আমি স্বহস্তে সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি, কেবলমাত্র সেই সকলই লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রকৃত শিক্ষক তাঁহারাই যাঁহারা শিক্ষালব্ধ বিষয়কে প্রয়োগ করিতে সক্ষম। অপরাপর শিক্ষক ও শিষ্যরা মঞ্চের অভিনেতাদের সঙ্গেই তুলনীয়'।"

"দ্বিতীয় গ্রন্থটির লেখক যশোধর বলিতেছেন, 'এই গ্রন্থে বর্ণিত যাবতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি আমার স্বহস্তে সম্পাদিত হইয়াছে। অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া আমি কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি না। আমার নিজস্ব প্রত্যয় ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করিলাম'।"

আজ যখন আমাদের স্কুলে ও কলেজে দিন দিন অবনতি হচ্ছে তখন আজ থেকে ৫০০-৬০০ বছর আগের ভারতীয় চিন্তায় পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের উপর প্রাধান্য দেওয়া হত তা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। আচার্য রায় ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিতটাকে ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। আজ ভারতীয় জীবনে এক ব্যাপক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এইসব মহান মানুষদের জীবন ও কর্ম ভালভাবে তুলে ধরতে হবে। আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী প্রফুল্লচন্দ্রের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে পুস্তিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আচার্যদেবের স্নেহধন্য গ্রামবাসী

ডাঃ সুবোধকুমার দে

"এই বলে মোর নাম খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।"

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের গোপন কথা ঝর্ণাধারার মত বেরিয়ে এসেছিল তাঁর কলমের ডগা থেকে, আর বিশ্বখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিকের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি কর্মের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই একই সুর। আচার্যদেব আশৈশব যে মাটির সংস্পর্শে এসেছিলেন, সেই মাটির প্রতিটি রেণু তাঁর অঙ্গে অঙ্গে মিশে গিয়ে লীন হয়ে গিয়েছিল তাঁর রক্তের প্রতিটি কণিকায়। গ্রামের সবুজ ধানক্ষেত, নবপল্লবের হলুদ সবুজের হাতছানি, আঁকাবাঁকা পথের ছুধারে বনবাদাড়—ওঁর কাছে যে কি মোহের সৃষ্টি করত তা একমাত্র প্রকৃতিই বলতে পারে। তাই সুদূর বিলেতের ছিমছাম সভ্যতার নাগপাশ তাঁর জীবনকে কখনও বাঁধতে পারেনি, পারেনি গ্রামের মানুষ আচার্যদেবকে শহরের মোহবন্ধনে আটকাতে। তাই গ্রামের অগণিত মানুষের মিছিলে, তাদের সুখ-ছুঃখের সাথী হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো তাঁর মন। গ্রামের ধুলামাখা—সে পাশ্চাত্যের সোনামাখার চাইতে যে মধুর, সে যে জীবনের অনেক পাওয়ার চাইতেও মহৎ চাওয়া।

আমার বয়েস কত আর হবে? আট কি নয়। অত ছোটবেলাকার কথা কিন্তু মনে আছে তার প্রতিটি ছবি—নিজের চোখে দেখা জিনিষগুলো রক্তের সংগে মিশে আছে। ভুলব কেমন করে? ষ্টীমারঘাট এসে মিশেছে ফণী অধিকারীর মুদিখানার দোকানের পাশে ঠিক ব্যাঙ্কের কাছ বরাবর—বাঁদিকে রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা ছদিকে ধানের ক্ষেত চিরে বাঁকার দিকে, বাঁয়ে মিত্তির বাড়ি, ডাইনে আচার্যদেবের পৈতৃক ভিটা—মধ্যে কি নেই? আছে গ্রামের পোষ্ট অফিস, লাইব্রেরী—অনেক বড় লাইব্রেরী। বইয়ের সংখ্যা তা হবে ১০।১২ হাজার। ডাক্তারখানা বিষ্টুদার—মাঝে ঘরটা এখন খালি—বোধহয় বড় বড় চৌকিগুলো আগেকার জমিদার বাড়ীর কাছারির সাক্ষী হয়ে আছে। এখনও ঘরের ভিতর দিয়েই যাবার সহজ পথ। ভিতরে উঠোন—ওখানে পূজোর সময় ও বিভিন্ন উৎসবের আনন্দে মানুষজন বিভোর হয়। কখনও উৎসবে অংশ গ্রহণ করে বড়রা, কখনও ছোটরা। চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকতে ভয় হয়। উপরের হাঁ করা ছাদ—যদি গায়ে ভেঙে পড়ে। নীচের ভাঙা ভাঙা ইটের স্তূপ, ছোট্ট ছোট্ট আগাছা—কে জানে বাবা ওর মধ্যে সাপ খোপ আছে কিনা? তাহলে মরণ নিশ্চিত। আচার্যদেবের ভাই—

ওঝা যামিনীবাবু তো আর বেঁচে নেই। যাক্ ওটা এড়িয়ে চলাই ভাল। হ্যাঁ, ডানদিকের রাস্তাটার এপাশে ওপাশে ফণী অধিকারীর বাড়ী, বৈরাগীর বাড়ী, ডাইনে সুধীর দাসের বাড়ী। ওদের বুক চিরে রাস্তাটা কখনও আঁকা বাঁকা পথে, কখনও সোজা হয়ে চলে গেছে R. K. B. K. স্কুলের ধার দিয়ে ভাটপাড়ার দিকে। ডাইনে শাখানদীর মত সরু রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে রাড়ুলি আর খেশরার খেয়াঘাটের দিকে। স্রোত যখন থাকে না, কপোতাক্ষ পেরিয়ে ওপারে যেতে খুব সহজ। স্রোতের সময় খেশরার পারে যেতে অনেক সময় লেগে যায়। জন্ম থেকেই দেখছি ধনঞ্জয় পাটনী বরাবর খেয়া-পার করে। ডাইনে জয়গোপাল সাধুখাঁর বাড়ী—বাঁয়ে নারায়ণ সাধুখাঁর বাস্তু।

সালটা মনে নেই। প্রতিবারের মত এবারও আচার্যদেব এলেন গ্রামে কয়েকদিন কাটাতে। মিত্তির বাড়ীতে ওঁর জন্য নির্দিষ্ট পাল্কী নামানো হল। বেশ মনে আছে শচীনদা, বগ্যেদা, কালীদাসদা, ছোট্টদা এবং ঐ বয়সের আরও অনেকে—বয়স ওদের পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যেই হবে—সবাই আচার্যদেবের পাল্কীর বাহক। শ্রদ্ধেয় অমূল্য মুখার্জ্জী, মাষ্টারমশাই, বিপিন চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রৌঢ়রা পাল্কীর সামনে। আমরা ছোটরা—আট-দশ বছরের ছেলেরা খালি পায়ে হাফ্ প্যান্ট পরে জনা পঞ্চাশ দলবেঁধে চলেছি মিছিলের পিছনে পিছনে। কত সৌভাগ্য আমাদের। বয়স অল্প হলেও এটা জানতাম, আচার্যদেব অনেক অনেক বড় মানুষ। দেশবিদেশে তাঁর কত নাম, আমাদের সুদূর গ্রাম তাঁর জন্য গর্বিত। তাই জমিদার বাড়ীর ছেলেরা যারা নিজেরাই পাল্কী চাপে, তারাই আজ পাল্কীর বাহক। গ্রাম যেন এক অঘোষিত নীরব উৎসবে মেতেছে। এই দিনটির জন্য গ্রামের অগণিত মানুষ অধীর আগ্রহে দিন গুণতে থাকে—কবে তাদের ঘরের ছেলে বিশ্বের সাড়া জাগানো বৈজ্ঞানিক ঘরে ফিরবে। বড় রাস্তা থেকে মিছিলের শুরু। বাঁয়ে রায়দের বড় দীঘি, ডাইনে দাগেদের বড় বাগান, বাঁয়ে ব্যাঙ্ক, ডাইনে বাঁয়ে কত চেনা-অচেনা লোকের বাড়ী। আচার্যদেব পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "অমুক দাস বেঁচে আছে তো? অমুক অধিকারীর শরীর ভালো তো?" আরও এগিয়ে ডাইনে অমূল্য সরকারের খবর নেন, বাঁয়ে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বলেন, "গোপালহরির শরীর কেমন?" আশেপাশের লোক উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দেয় আচার্যদেবের চেনা-অচেনা সমস্ত লোকের কুশলবার্তা। হঠাৎ পাল্কী এসে থামলো এক বাড়ীর সামনে। শুধালেন, "শশী ভালো আছে তো? শুনেছি ও রোগশয্যায় অনেকদিন শায়িত।" আচার্যদেবের আদেশে আমাদের বাড়ীতে ঢুকল পাল্কী। আগে পিছনে অসংখ্য লোকের সারি। তুলসীতলায় যেখানে আমার মা প্রতিদিন সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়ে বাবার আরোগ্য কামনা করেন, সেইখানে নামানো হ'ল পাল্কী। বললেন, "একবার শশীর সঙ্গে দেখা করা যায় না?" উত্তরে কে একজন বললেন, "না, উনি অনেকদিন ধরেই উঠতে পারেন না।" সকলের প্রাণের মানুষ, সবার প্রতি দরদী মানুষ, অশক্ত বৃদ্ধ দুজনের কাঁধে ভর দিলেন। আস্তে আস্তে খুব কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙে মাটির বারান্দা পেরিয়ে আরেক ধাপ উঠে আমাদের ঘরে ঢুকলেন।

ঘরের চারিদিকে দারিদ্র্যের ছাপ, এককোণে মাটিতে বাবার বিছানা, ছোট্ট একটা জলচৌকিতে বসলেন আচার্যদেব। কম্পিত হাত রাখলেন বাবার মাথায়—"শশী ভাল আছো তো?" উত্তরে বাবা বললেন, "শরীরটা বড় খারাপ, ওপারের ডাক এসেছে, আর বোধহয় দেখা হবে না সেজদা।"—"না-না, সব ঠিক হয়ে যাবে, ভালো হয়ে যাবে তুমি।" আচার্যদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ হেসেছিলেন বোধহয়। বছর না ঘুরতেই বাবা ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করলেন। সেদিনের আমি—আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, আচার্যদেব কি আমার বাবাকে বেশী স্নেহ করেন? না, মোটেই না। গ্রামের সমস্ত মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম এই স্নেহ-ভালোবাসার ছাপ গ্রামের প্রতিটি ঘরে আজও বিদ্যমান। আজও সেখানকার প্রতিটি চলার পথ, প্রতিটি ধূলিকণা তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

এটা আমার শোনা কথা। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। আমাদের পাশাপাশি গ্রামগুলো লবণ আইন অমান্যের পীঠস্থান। খেয়াঘাটের পাশে কপোতাক্ষের কোল ঘেঁসে আমাদের কয়েক বিঘা জমি ছিল। গ্রামের সত্যাগ্রহী দেশপ্রেমিক স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সেদিনের আন্দোলনের শরিক। আমাদের জমিতেই কপোতাক্ষের লবণভরা জল হাঁড়ি চড়িয়ে জ্বাল দেওয়া হতো। যখনই পৌঁছে যায় সেই খবর ব্রিটিশ শাসকের কানে তখনই বন্দুক-লাঠিধারী ইংরেজের পোষা কুকুরগুলো স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে লাঠি আর বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বেদম প্রহার। আহত হন অসংখ্য নরনারী। জ্ঞান থাকতে কিন্তু ওঁরা লবণের কড়াই ছাড়েননি। ওঁদের অপরাধ? অপরাধ মাত্র একটাই—দেশপ্রেম, দেশকে ভালোবাসা। সেই অপরাধে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে জমির মালিক শ্রীশশিভূষণ দেও কারাবরণ করলেন ছ'মাসের জন্য। ওঁরা রইলেন খুলনার জেলে। বাল্যবিধবা মা তারিণী-দেবীর একমাত্র সন্তান শশিভূষণ, তাই গ্রামের আরও অসংখ্য মায়ের মত তারিণীদেবীও কান্নায় ভেঙে পড়েন। বৃদ্ধার দেশপ্রেম, মাতৃভূমির শৃঙ্খলমুক্তি এসব বড় বড় কথা জানা নেই। তাই গ্রামের লোক ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আপনি ভাগ্যবতী মা, আপনার ছেলে দেশের জন্য কারাবরণ করেছে। এতো আপনার পরম সৌভাগ্য। বৃদ্ধা চোখের জল মুছে ফেলে; না জানা, না বোঝা এক সান্ত্বনায় মন ভরে ওঠে ওঁর। তারপর যেদিন ছেলে গলায় অসংখ্য ফুলের মালা পরে ষ্টীমার থেকে নামলেন, বৃদ্ধা মায়ের সেদিন আনন্দের সীমা নেই। বৃদ্ধার কাছে অনেকের অভিনন্দন আসে যার মধ্যে আচার্যদেবের অভিনন্দন আজও স্মরণীয় হয়ে আছে সবার কাছে। হয়ত আচার্যদেব দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁদের সামান্যতম অবদান ছিল তাঁদের হয়ত একটু বেশীই ভালোবাসতেন। একথা গ্রামের সবার পক্ষেই খাটে। আচার্যদেবের স্নেহ—সে তো অনেক পাওয়ার মধ্যে পরম পাওয়া।

ওঁর স্নেহ-ভালোবাসার আর একটা নমুনা আমার জানা আছে। চাকুরী করা মানে অন্যের গোলামী—ওঁর একেবারে অপছন্দ। তাই নিজের

চেষ্টায় এবং নিজ অর্থে সৃষ্ট বেঙ্গল কেমিক্যালে গ্রামের কারও চাকরী দিতেন না তিনি। হঠাৎ খবর পেলেন শশী অসুস্থ, সংসারের হাল ধরার মত কেউ নেই। বড় ছেলে শচীন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের ২য় বর্ষের ছাত্র। থাক আদর্শের কথা, থাক পরের গোলামী না করার প্রতিজ্ঞা। তাই ২য় বর্ষের ছাত্র ভর্ত্তি হয়ে গেল বেঙ্গল কেমিক্যালের মানিকতলা কারখানার একটা ল্যাবরেটরীতে। এই ছিল মানবদরদী আচার্য-দেবের মন। যে মন তাঁর সমস্ত ভালবাসা, স্নেহ উজাড় করে দিয়েছে শুধু গ্রামবাসীর জন্যে নয়, সমস্ত পিছিয়ে পড়া বাঙালীর জন্যে। অনেকের কথা ভোলা যায় কিন্তু গ্রামপ্রেমী এই খাঁটী বাঙালীর কথা কি কেহ ভুলতে পারবে ?

একটি অনুভবে আচার্যদেব

কমল দে

স্বার্থের অন্ধকারে ভালোবাসা সত্যিকার আলো।

মানুষের সমস্ত সাধনা পূর্ণ হয় মানবকল্যাণে,
তবু ব্যক্তিগত ঘর ও জৌলুষ বার বার
অজগর হয়ে গ্রাস করে ঃ গতি ও রক্ষার দায়
ঝেড়ে ফেলে পুরনো টিকিট।

অথচ মনুষ্যত্বের মহত্তম দায় ছিল সাধনার কাছে,
খাদ্য ও পোষাকে ঢেকে যায় ল্যাবরেটরি ঘর
মানুষের বিপন্নতায় ঃ সৃষ্টি বা নির্মাণ—
লোহার বাসর ঘরে তবু মৃত্যু আসে।

পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে সে তরঙ্গ
ঠিক ধরা পড়ে—মানুষের মানব হৃদয়ে,
ধ্যানমগ্ন পর্বত থেকে সাহায্যের ঝর্ণা নেমে আসে—
আতংকে বিহ্বল চোখ অগুন্তি মানুষ
পাশে দেখে ভালোবাসা ঃ মানুষের প্রকৃত আত্মীয়॥

স্মৃতির দর্পণে

শিল্পী চিত্ত মজুমদার

যাঁকে নিয়ে আজ আমাদের এত গর্ব ও অহঙ্কার তাঁরই আবক্ষ মর্মর মূর্তি বিড়লা মিউজিয়ামে স্থায়ী-ভাবে প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণে অতীতের (প্রায় ৬০ বছর আগে) কিছু কথা ভেসে উঠ্ছে স্মৃতির দর্পণে।

তাঁর পৈতৃক বাড়ী সংলগ্ন তাঁরই পিতার নামাঙ্কিত হাইস্কুলের স্থান সংকুলানার্থে অদূরে কপোতাক্ষ নদীর তীরে কলকাতা থেকে বড় বড় নৌকাযোগে ইট, চুন, বালি, সুরকি, সিমেণ্ট প্রভৃতি, এমনকি বাগদাদের বিরাটকায় বলদ, গরুর গাড়ীসহ যাবতীয় বাড়ী তৈরীর সামগ্রী এনে বিরাটকায় দোতলা বিদ্যালয় নির্মাণান্তে বসতবাড়ী সংলগ্ন হাইস্কুলটি স্থানান্তরিত করার পরে রাড়ুলি, কাটিপাড়া, বাঁকা ও খেশরা গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের নতুন নাম হয় আর. কে. বি. কে. হরিশচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশান। সে-সময় ঐ স্কুলের ১২/১৪ মাইলের মধ্যে আর কোনো হাইস্কুল না থাকায় দূর হতে দলে দলে ছাত্ররা এই বিদ্যালয়ে ভীড় জমানোর ফলে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৭/৮ শ'তে দাঁড়ায়। তখনকার দিনে বাঘা হেডমাষ্টার ছিলেন হরিঢালী গ্রাম নিবাসী পরলোকগত জ্যোতিষচন্দ্র বসু। তাঁর আমলে পড়াশুনার মান ছিল জেলার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাইনাল পরীক্ষায় প্রতি বছরই ঐ ইস্কুলের ৩০/৪০টি ছাত্রের মধ্যে প্রায়ই ১ম বিভাগে পাশ করতো, হয়তো ২/৪টি ছাত্র ২য় বিভাগে পাশ করতো। ফেল বিশেষ কেহ করতো না।

দেশ বিভাগের পরে ছাত্রাভাবে ইস্কুল চলা ভার হলেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার কোনো প্রকারে ইস্কুলটি টিকিয়ে রাখে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার ঐ ভগ্ন বিদ্যালয়টি সামান্যতম সংস্কার করে কোনো প্রকারে খাড়া করে রেখেছে। একটি কথা বলে রাখা ভাল দেশ বিভাগের পর থেকে আস্তে আস্তে কপোতাক্ষ নদীর ভাঙ্গনের ফলে মূল বিদ্যালয়টিকে গ্রাস করতে ১০/১২ হাত বাকী। এজন্য বিদ্যালয়টি পূর্ব দিকে একটু বসে গেলেও তাঁর আশীর্বাদে ক্রমে ক্রমে কপোতাক্ষ নদী ভরাট হয়ে একেবারে মরে যাওয়ার ফলে এখন সেখানে ধান চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে তাঁর সাধের বিদ্যালয়টি অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কোনো প্রকারে এখনও টিকে আছে।

স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্যে তিনি গ্রামে ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করেন। সে-সময় আমিও চরকা কাটতাম এবং কলকাতার খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কাপড় বুনিয়ে এনে পরতাম। গ্রামের স্বর্গীয় মনীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে

৩ খানি তাঁত স্থাপন করে এক নতুন যুগের সূচনা করার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে এক নব চেতনার উদয় হলো। এর পরেই শুরু হলো গ্রামের মাষ্টার বিপিন চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে কপোতাক্ষ নদীর পাড়ে বিরাট বটতলায় রাস্তার ধার ঘেঁসে গোলপাতা ছাউনীর লম্বা লম্বা ঘরে কাঁচা চামড়া পাকা করার এক প্রতিষ্ঠান Tannery (ট্যানারি) স্থাপিত হল। ঐ কাজে নিযুক্ত হলো কতিপয় উৎসাহী যুবক। তার মধ্যে মনে পড়ে সুন্দর বোসের কথা। নতুন উদ্যম ও উৎসাহে যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কয়েক বছর চলার পরে প্রকৃত সুষ্ঠু পরিচালনাভাবে আস্তে আস্তে সবই বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার টাকা অপচয় হওয়ায় তাঁর স্বপ্নের বেকার সমস্যা ও বাঙ্গালীকে গোলামীর হাত থেকে মুক্ত ও আত্মনির্ভর করে, ব্যবসায়ে স্বনির্ভর করে তোলার স্বপ্ন আর সার্থক হলো না।

একবার ডাঃ মেঘনাদ সাহার আগমন উপলক্ষে আচার্যদেবের বাড়ীতে 'নটীর পূজা' অভিনয় করে গ্রামের ছাত্রীরা। ৺দেবেন রায়চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শিবানীর অভিনয়ে ডাঃ সাহা মুগ্ধ হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে পুরস্কৃত করেন।

তিনি প্রতি বছর গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে ১ মাসের জন্য আসতেন। সে-সময় গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেককে প্রতিদিন বিকালে ৪ আউন্স মত উচ্চ মানের সিরাপ বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তাদের লেখাপড়া শিখে স্বনির্ভর হয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় উন্নতি করার উৎসাহ দিতেন। আবার সময় করে বিপিন বাবুকে সঙ্গে করে পালকি চড়ে বড় বড় ঝুড়ি বোঝাই জিভে গজা ও জিলিপিসহ হঠাৎ স্থানীয় পাঠশালায় হাজির হতেন, এমনকি বাঁকার মাইনর ইস্কুলেও। পাঠশালা পরিদর্শনকালে তাঁর প্রদত্ত জিলিপি খেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচুর আনন্দ লাভ করতো ও লেখা-পড়ায় উৎসাহ পেত।

পরিশেষে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে গ্রামের ৺চারুদা, কতিপয় ছাত্র ও বয়স্ক লোক তাঁর বড় তৈলচিত্র (যা তাঁর নামীয় লাইব্রেরীতে ছিল) বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে বহন করে গ্রামের বিশেষ বিশেষ বাড়ী প্রদক্ষিণ করার সময় আমাদের বাড়ী এলে আমিও তাদের সামিল হই। এভাবে রাড়ুলি, বাঁকা ও খেশরা প্রদক্ষিণ করে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরে ফিরি। ঐভাবে শোক মিছিল করে যে যে বাড়ী গিয়েছি সবাই সাধ্যমত শোক মিছিলের প্রধান নায়ককে (চারুবাবু) দান করেন।

তাঁর শ্রাদ্ধাদিতে কলকাতা থেকে হাজার হাজার টাকা আসে। ঐ টাকায় এই উপলক্ষে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-এর এলাহি কারবারে গ্রামের কতিপয় স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ ছাড়া দীন-দুঃখী, গরীব ও ভিখারীরা এক মুঠো অন্ন খেতে পায়নি। অথচ এই দীন-দুঃখী, অসহায় বিপদাপন্ন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। এবং সারা জীবনের উপার্জন প্রায় সমস্ত অর্থ অকাতরে গরীব-মেধাবী ছাত্র, অসহায়া বিধবা, দীন-দরিদ্র ও নানা প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন তিনি।

এতক্ষণ যাঁর কথা বললাম তিনি হলেন জগদ্বিখ্যাত রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক ও দীনের বন্ধু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র

কমল চক্রবর্ত্তী

প্রবন্ধের শিরোনাম অনেকের মনেই বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রতিভা জগদ্বিখ্যাত ; সমাজ ও স্বদেশ সেবায় তাঁর পরিচয় সর্বজনবিদিত ; শিল্পসংগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার জীবন্ত স্বাক্ষর বেঙ্গল কেমিক্যাল। কিন্তু যুগ পুরুষ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনীষার এ-দিকটির তেমন আলোচনা হয়নি। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস আচার্যের সাহিত্য-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় যদি যোগ্য-ভাবে উপস্থিত করা যায় তবে এতবড় বিজ্ঞানীর মাঝে এমন গভীর সাহিত্য-প্রতিভা দেখে সকলে মুগ্ধ হবে। সে-কাজ যথার্থ অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত মানুষের জন্য তোলা রইল। আমি এ প্রবন্ধে তার নান্দীপাঠ ক'রে যেতে চাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে তাঁর অজান্তেই ; তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চার জন্য কলম ধরেননি। 'India before and after Mutiny' প্রবন্ধটি সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধের অন্যতম পরীক্ষক উইলিয়াম মূয়র যে মন্তব্য করেছিলেন 'একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ যাতে সত্যই একটা Motto আছে।' বোধ হয় আচার্যের সমগ্র রচনা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তিনি তাঁর সমগ্র রচনাতেই একটি 'motto' দ্বারা চালিত হয়েছেন। সে 'motto' হ'ল—এদেশের এজাতির সামগ্রিক কল্যাণ। তাই প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। বাংলার নব্য লেখকদের আহ্বান ক'রে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেন বঙ্কিমচন্দ্রের সে আহ্বানে সাড়া দিয়েই কলম ধরেছিলেন।

বাংলার মননশীল সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যকে তিনি বহু বিচিত্র ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও ছিল বহুব্যাপ্ত। 'প্রাণীবিজ্ঞান' থেকে রসায়ন বিদ্যার মত বৈজ্ঞানিক বিষয়তো ছিলই। তার সঙ্গে সমাজ চিন্তা, রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-সমালোচনা এমনি বহুতর বিষয় স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। আবাল্য ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, তাই ইতিহাসও তাঁর রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে, বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন এই

জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী। উনিশ শতকের বাঙালী মনীষার বহুমুখী প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তির প্রতি প্রথমে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখের প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না। তাঁর আধুনিক ইতিহাস সচেতন মন ইতিহাসের পটভূমিতে দেশ ও জাতির প্রকৃত পরিচয় উপস্থিত করতে চেয়েছে, তাই লিখেছেন 'বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান'। এই প্রবন্ধে কেবল ভারতের অতীত গৌরব কথার মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে চাওয়া হয়নি। জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ ক'রে তাকে আধুনিক বিশ্বে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি যেমন তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ, তেমনি এর ভাব-ভাষা ও সিদ্ধি প্রমাণ ক'রে যে বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর প্রবন্ধ-সাহিত্যের কত বড় লেখক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। প্রকৃতিপ্রীতি ও সৌন্দর্যবোধ যে মরমী সাহিত্যিকের একটা বড় গুণ; মূলতঃ বিজ্ঞানী ও সমাজ সংগঠক প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে তার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাঁর সুগভীর প্রকৃতিপ্রীতি, সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও কাব্য পাঠে উৎসাহের পরিচয় পাই নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করে—'বিহঙ্গকুলের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন', 'সুন্দরবনের গণ্ডার লোপ' ও 'রজনীকান্ত স্মৃতি।' আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই আন্দোলনে প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ের যোগ ছিল, তাই সে-সময় চরকাকে কেন্দ্র ক'রে তিনি যে প্রবন্ধ 'চরকা ও বস্ত্রসমস্যায় বঙ্গ মহিলার কর্তব্য' লিখেছেন, এতে প্রফুল্লচন্দ্রের অর্থনীতিজ্ঞান ও প্রবন্ধ রচনার আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় পাই। এছাড়াও বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি আরও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধে তাঁর গভীর অর্থনীতিজ্ঞান, দেশ ও জাতির প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ এবং প্রবন্ধ-সাহিত্যের সকল গুণ লক্ষ্য করা গেছে। সমাজ সংস্কারক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা' ও 'অস্পৃশ্যতা বর্জন'-এর মত প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যিক হিসাবে বিজ্ঞান মনস্কতা, যুক্তি গ্রন্থন ও ভাষার দৃঢ়তা মনোযোগী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন। এই সকল প্রবন্ধে যেমন গভীর সহানুভূতি, দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা অনুভব করা যায়; তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক ও কখনও কখনও ব্যঙ্গ কৌতুকের ঝাঁঝও অনুভূত হয়। এ প্রবন্ধগুলিকে তাই কেবল সমাজ সংস্কারকের রচনা বলতে ইচ্ছা হয় না; গভীর মননশীল সাহিত্যকীর্তি হিসাবেই উল্লেখ করতে হয়। প্রফুল্লচন্দ্র সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক ছিলেন। কবি ও শিল্পীদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল তারই পরিচয় বহন ক'রে **'Shakespearian Puzzle'** শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ।

আধুনিক লেখক ইতিহাস সচেতন হবেন এটাই স্বাভাবিক। প্রফুল্লচন্দ্রের সেই সচেতনতার পরিচয় পাই তাঁর 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা', 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' এবং 'আত্মচরিত' গ্রন্থ থেকে। তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে তিনি আত্মজীবনী রচনায় একটা সম্পূর্ণ নতুন রীতি প্রবর্তন করেছেন। নিজের জীবনের ছোটবড় ভালমন্দ নিয়ে রস সৃষ্টি নয়, নিজের জীবনকে আদর্শ করে মহত্তম ক'রে উপস্থিত করা নয়, কর্মজীবন ও ভাবজীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা নয়, সত্য ও কল্পনার আশ্রয়ে গড়ে

ওঠা মায়াময় জীবনী নয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজের কথা ও নিজের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে বিশেষ বিশেষ বাণী প্রচার করেছেন। নতুন ও পুরানো দিনের বহু মনীষীর মহত্ত্ব, মনুষ্যত্বের জয়গান করেছেন তাঁর 'আত্মচরিত'-এ। এক মহাজীবনের বাণী নিতান্ত অনাড়ম্বর সরলভাবে উপস্থিত হয়েছে ; যাতে তাঁকে আমাদের নিতান্ত আপনার জন বলে বোধহয়। তাঁর লেখা 'অধ্যয়ন ও সাধনা' গ্রন্থটি আবার ভিন্ন রসের পাঠক মনে তৃপ্তি জোগাবে। তাঁর ব্যাপক ও বিচিত্র রচনার কয়েকটি মাত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা গেল। উৎসাহী পাঠক আচার্য-রচনার এই বৈচিত্র্য এবং বৈদগ্ধ্য সম্পর্কে সম্যক জানবেন তাঁর রচনা পাঠ করেই।

প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর একটি গড়ে ওঠার ইতিহাস আছে। মননশীল সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যে গভীর অধ্যয়ন, অভিনিবেশ, মনীষা ও বিশ্লেষণী শক্তি প্রয়োজন আচার্যের ক্ষেত্রে তা ছিল অপরিমেয়। সৎসাহিত্যের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেই স্বীকার করবেন। দেশ ও জাতির এবং সমগ্র মানব সমাজের জন্য অপরিসীম মমত্ববোধ তাঁর সমগ্র রচনাকে হৃদয়রসে জারিত করেছে। সাহিত্যিকের সর্বপ্রধান শক্তির উৎস হ'ল তার ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন। সে ব্যাপারে আচার্যের বৈদগ্ধ্য ছিল সংশয়াতীত। বাংলাভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তিকে ব্যবহার করার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিভাষা সমিতিতে তাঁকে অন্যতম কর্ণধার করা হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্যিকের যে Cosmic দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন তারই অনুকূলে ছিল তাঁর ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় জ্ঞান।

প্রফুল্লচন্দ্রের রচনাভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—'সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।' বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যকে অনুসরণ করে নিঃসন্দেহে বলা যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর রচনাশৈলী সহজ-সরল, বক্তব্য উপস্থাপনায় দৃঢ়তা অনন্যুকরণীয়। সর্বোপরি রচনার প্রসাদগুণের জন্যই তা সুখপাঠ্যও বটে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আচার্যের এ পরিচয় সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে তেমন আলোচনা নেই। কিন্তু যাঁরা জহুরী তাঁরা জহর চিনেছিলেন, তাই বঙ্গীয় বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে তিন বার (১৯৩১-৩৪) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

প্রবন্ধের শেষে এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি, মননশীল সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী সুধী সমাজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে গবেগণা, অধ্যয়ন ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে উৎসাহী হবেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—
'ভারতের কোন বৃদ্ধঋষির নবীন মূর্তি'

রমেশ মুখোপাধ্যায়

শেক্সপীয়ার বলেছেন, "Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them." যীশুখ্রীস্ট বলেছেন, "অহংকারশূন্য ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তারাই পৃথিবীর অধীশ্বর।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, Serene indifference to fame and wealth proves only that a worker. গীতায় দেখি নিত্য সন্ন্যাসী বলা হয়েছে 'জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥' (৫/৩) অর্থাৎ যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দ্বেষ করেন না এবং সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই রাগদ্বেষাদিশূন্য কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলে জানবে। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত অগ্নিতে আহুতি দানকেই বৈদিক যজ্ঞ বলে। স্মৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে কথাটাকে ব্যাপক ক'রে ঋষির উদ্দেশ্যে, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে, পশুপক্ষীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণকে যজ্ঞ বলেছেন। আর গীতা কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থে নয়, মানুষের প্রীত্যর্থে ও কল্যাণার্থে নিজেকে ভুলে যে কর্ম তাকেই যজ্ঞ বলেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনচর্চা ও জীবনবোধ উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর সঙ্গে যে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা যে গীতার অনুসরণে একটা অখণ্ড যজ্ঞ তা সংক্ষেপে উপস্থিত করবার প্রয়াস করেছি এই নিবন্ধে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরাধীন, লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও অপমানিত ভারতবাসীকে বিশ্বের মানুষের কাছে যেসব ভারতীয় মনীষী তার সত্যিকার পরিচিতি উপস্থিত করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য। বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বেদান্ত কেশরী স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করলেন, মূলতঃ উপনিষদের কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার জয়ী হলেন, আর লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধশান্ত গুরুর বেদীতে আসীন থেকে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়চ' এই বাণীর মূর্ত বিগ্রহরূপে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, অতীত ভারতের গৌরবময় বিস্মৃত বিজ্ঞান-জ্ঞানভাণ্ডারকে নোতুন করে উন্মুক্ত করে, আর্তদেশবাসীর সেবায় ত্যাগের প্রজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর কাছে ভারতবাসীকে মাথা তুলে আপন অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার শক্তি অর্জনে এক বিরল দৃষ্টান্ত

স্থাপন করলেন। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থে আচার্য রায় ভারতের নিকট আরবের ঋণ সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনা করেছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে দশমিক পদ্ধতি ইউরোপ আরবের কাছ থেকে পেয়েছিল, তা প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের অংশবিশেষ মাত্র। ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে ভারত যে তির্যকপাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রণালী জানত তা উক্ত গ্রন্থে জানতে পেরে ইউরোপীয় হারমান মেলেরে মতো বৈজ্ঞানিকও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ১৯১১ সালে জার্মানীতে ভন লিপম্যান আচার্য রায়ের উক্ত গ্রন্থের সারাংশ প্রকাশ করেন। 'লণ্ডনে কেমিক্যাল সোসাইটিতে উচ্চস্তরে আরোহণ করতঃ এমন এক যুগে বহু রাসায়নিক সত্যের আবিষ্কার করেছিলেন, যখন এ-দেশ (লণ্ডন) অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।' আচার্য রায়কে এই প্রতিভা অর্জন করতে হয়নি বা দল তৈরী করে ঢাক-ঢোল পেটাবার সাংগঠনিক কায়দাটাকে আয়ত্ত করে প্রতিভার ফাঁপা বেলুন দেখাতে হয়নি। তিনি ছিলেন শেক্সপীয়ারের ভাষায় Born great—জন্মগত প্রতিভাধর। প্রসঙ্গতঃ এখানে দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে অসুস্থ অবস্থায় তিনি রাড়ুলি গ্রামে থাকাকালীন মাত্র ১২/১৩ বছর বয়সে পিতার গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করতে করতে লক্ষ্য করলেন সংস্কৃত ও লাতিন ভাষার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য, এবং অপরের সহায়তা ব্যতীত নিজ প্রতিভায় Principia Latina-র ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ও ব্যাকরণ শিক্ষা করলেন। ফরাসী, ইতালিয়ান ও স্পেনিশ ভাষা লাতিন ভাষা থেকে উদ্ভূত এবং তিনি সেগুলোও অধিগত করলেন। সেই সময়ই পিতার বৈঠক-খানায় প্রত্যহ সমবেত গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণের খোশমেজাজী গল্পের আসরে বসতে তাঁর মন চাইত না। সময়টা কাটাতেন তিনি মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া এ্যারারুট, বার্লি ও মিছরী দিয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দরিদ্র কৃষক ও গ্রামবাসীদের সেবায়। আর যা করতেন সেই সময় তা আচার্যের 'আত্মচরিত' থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ "কৃষিকার্য্যের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ ছিল। আমি কোদাল দিয়া মাটি কাটিতাম এবং নিজে চাষ করিয়া বীজ বুনিয়া নানারূপ ফসল উৎপাদন করিতাম। গোবর, ছাই এবং গলিত পত্রের সার দিয়া জমির উর্বরশক্তি বৃদ্ধি করিতাম······গ্রামের জমিদারের ছেলে হওয়ায় জমির ফসল কেটে বাজারে বিক্রয় করি, ইহাতে আমাদের কোন কোন প্রতিবেশী লজ্জাবোধ করিতেন, কিন্তু আমি ইহা গ্রাহ্য করিতাম না।"

জ্ঞান একটা ভাবানুভূতিবিশেষ। ভাব-রাজ্যের অনুভূতি মাত্রেরই বস্তুরাজ্যে থাকবে একটা অভিব্যক্তি। অনুভবতো শূন্যে বিচরণশীল নয়—তার ক্রিয়াকারিত্ব থাকবেই। কর্পূরের সত্তা তো সার্থকতা পায় গন্ধরূপে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে। জ্ঞানও তেমনি চরিতার্থতা লাভ করে নিয়ত কর্মের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে, অভিব্যক্ত হয়ে। সাধারণ নরনারী কর্ম করে নিজের হিতের জন্যে, কিংবা আসক্তিতে পুত্রকন্যাদি মুষ্টিমেয় লোকের হিতের জন্যে পক্ষান্তরে জ্ঞানী কর্ম করেন অনাসক্তভাবে 'সর্ব্বভূত হিতে রত হয়ে। আচার্য রায় তাই জ্ঞানী, অমানুষকে মানুষ করাই হোল তাঁর যাবৎ কর্মের মূল ; আচার্য রায় সেই মানুষ রসিক

কবি চণ্ডিদাস যে 'মানুষ'কে সবার উপরে বলেছেন অক্লান্ত সাধনা ও জীবনব্যাপী তপস্যাচরণের দ্বারাই এ সম্ভব। জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের ত্রিবেণী সম্মেলনে সত্যিকার তপস্বী তিনি।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥"

গীতা (৩/২১)

পূতচরিত্র সামনে থাকলে অনুবর্তীজন মহত্ত্বলাভে শীঘ্র সক্ষম হতে পারে। আচার্য রায় সেই পূত-চরিত্র যা জীবনে উদ্দীপন আনে শুভ চেতনার।

"বিজ্ঞানের অনুশীলন কেবল বিজ্ঞানের জন্যেই করিতে হইবে, এবং তাহার জন্য সানন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, এমন লোকের প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে জাতীয় সাহিত্যে বিজ্ঞান তাহার যেন স্থান লাভ করিবে এবং তাহার আবিষ্কৃত সত্যসমূহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগিবে—এক কথায় বিজ্ঞানকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করা।" আচার্য রায়ের এই উক্তির পাশে আজকের প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ভয়ঙ্কর রূপকে দেখলে পার্থক্যটা বুঝতে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীতে আজ ৫০ কোটি লোক যখন অনাহারে দিন কাটায়, যখন ৩৫ হাজার শিশু অনাহারে ও অপুষ্টিতে ভোগে, তখন পৃথিবীর আলো বাতাসসহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করা যায়! স্বভাবতঃই আচার্য রায়কে আজকের মানুষ যে ভুলে থাকবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! প্রয়োগ-বিজ্ঞানকে শিল্প প্রচেষ্টায় নিয়োগের আদর্শে বাস্তবায়িত রূপ 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্'। "যাহার ভিতরে গবেষণা কার্যের কোন অনুপ্রেরণা জাগে নাই, কেবলমাত্র বৃত্তির লোভেই তাঁহার পক্ষে গবেষণার কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।" আচার্য রায়ের এই সত্যিকার বৈজ্ঞানিকসুলভ উক্তিকে আজকে স্মরণে আনেন? আমি বিগত ২৯ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সুযোগে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে মনে হয় আচার্য রায় আজ জীবিত থাকলে তিনি হয়তো নিরালায় অশ্রু বিসর্জন করতেন। শুধু চাকুরী জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভ, সস্তা খ্যাতির কামনা, বা যতদিন চাকুরী না পাওয়া যায় ততোদিন বৃত্তির টাকাটা আয়ের লোভে পি-এইচ. ডি. পাওয়ার জন্যে যে করুণ হুড়োহুড়ি চলছে এবং ইউ. জি. সি.র কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে গবেষণার নামে, তা মানুষের কল্যাণবোধের মূল্যায়নে অর্থহীন ও হাস্যকর ব্যাপার।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণকালে কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ আয়োজিত বিদায় সম্বর্ধনা সভায় আচার্য রায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি: "...আপনারা কেহ কেহ হয়তো জানেন যে, যাহাকে পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি বলে তাহার প্রতি আমি কোনদিন বিশেষ মনোযোগ দিই নাই। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার কার্যকাল শেষ হইবার সময় আমি কি মূল্যবান সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছি তাহা হইলে প্রাচীনকালের কর্নেলিয়ার কথায় আমি উত্তর দিব।" ...তারপর কর্নেলিয়ার সেই বিখ্যাত কাহিনী বলবার পর আচার্য রায় বললেন, "আমি কর্নেলিয়ার মতো রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিতে পারি, 'এরাই আমার রত্ন'।"

এবং অন্যতম রত্ন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি, "আমার স্মৃতিতে আসীন আচার্যদেব বালপ্রকৃতি, মধুরভাষী, শীর্ণদেহ, জ্ঞানতপস্বী, দেশপ্রেমিক এবং ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। তিনি প্রণম্য, তিনি প্রাচীন, অসীম তাঁহার জ্ঞান কিন্তু তিনি আমাদের অতি নিকট বন্ধুসম ছিলেন। তাঁহার মধুর হাসি, তাঁহার অকপট ব্যবহার, তাঁহার নিড়াম্বর বাসগৃহ, তাঁহার শুচি-স্নিগ্ধ বেশ, তাঁহার নিরলস কর্মব্যস্ত জীবন, তাঁহার উৎসাহ যেন যাদুমন্ত্র বলে আমাদের জীবনধারাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষের সকল শিক্ষার মূলে আছে সংযমের সাধনা। আচার্যদেব নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া এবং মানিয়া চলিতেন। …এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কর্মযোগীরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

"স্বার্থ বলিতে তাঁহার অবচেতন মনেও কিছু ছিল না, দেশের দরিদ্র নারায়ণের পরিত্রাণের জন্য তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া লইয়া এই সর্বত্যাগী বৃদ্ধ কর্মবীর মহাপুরুষ জীবন-সন্ধ্যায় কালের ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন দেশ সেবায় জনহিতকর কার্যে নিজেদের উৎসর্গীকৃত করিতে।…

"…মতের বন্ধনমুক্ত আচার্যদেবের জীবনগীতা হইতে বাংলার যুবকগণ যুগে যুগে উদ্যমশীল জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া অনুপ্রাণিত হইতে পারিবে।"

"Science can denature plutonium, but it cannot denature the evil in the heart of man"—আইনস্টাইনের এই বক্তব্য আর আচার্যদেবের অনুভবের মধ্যে পার্থক্য ছিল না বলেই বৃদ্ধ বয়সেই দশ বছরে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দু'লক্ষ মাইলেরও অধিক পথ তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন, দুর্ভিক্ষে, বন্যায় দুর্গত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, খদ্দর প্রচার ও দেশের স্বাধীনতার জন্যে গবেষণাগার ছেড়ে জনগণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং তাই ১৯১৯ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে কুখ্যাত রাউলাট এ্যাক্টের প্রতিবাদ সভায় বললেন, "আমি বৈজ্ঞানিক, গবেষণাগারেই আমার কাজ, কিন্তু এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককেও দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়, আমি তাই এই অনিষ্টকর আইনের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।" আচার্য রায় লিখলেন, "প্রিয় ভগিনী, আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, যখন আমি বিজ্ঞান চর্চা করি তখন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া দেশকেই সেবা করি। আমাদের লক্ষ্য একই—ভগবানই জানেন, আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"

১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সেবা সম্পর্কে ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার প্রকাশিত প্রতিবেদনের কিয়দংশ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। "স্যার পি. সি. রায়ের আহ্বানে দেশবাসীর সাড়া দিবার একটি কারণ, বৈদেশিক গভর্নমেণ্টকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা, আর একটি কারণ দুর্গতদের সেবা করিবার প্রবৃত্তি। কিন্তু স্যার পি. সি. রায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার প্রভাবই ইহার প্রধান কারণ। স্যার পি. সি. রায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁহাকে গোঁড়া অসহ-

যোগী বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি একজন প্রবল জাতীয়তাবাদী এবং গভর্নমেণ্টের কার্যের তীব্র সমালোচক। শিক্ষক এবং সংগঠক কর্তা হিসাবেও তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। একজন ইউরোপীয়কে বলিতে শুনিয়াছি, 'মিঃ গান্ধী যদি আর দুইজন স্যার পি. সি. রায় তৈরী করিতে পারিতেন তবে এক বছরের মধ্যেই তিনি স্বরাজ লাভে সক্ষম হইতেন'। একজন বাঙালী ছাত্র আমাকে বলিয়াছিলেন 'যদি কোন সরকারী কর্মচারী অথবা কোন অসহযোগী রাজনীতিক সাধারণের কাছে সাহায্য চাইতেন তবে লোকে এক পয়সাও দিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু যখন স্যার পি. সি. রায় সাহায্য চাইলেন, তখন লোকে জানে আরও একবার জয়লাভ করিল।"

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর আচার্য রায়ের একাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে প্রফুল্ল জয়ন্তী পালিত হয়েছিল কলকাতার টাউনহলে তার জন্য চাঁদা উঠেছিল ১৬,৮৫২ টাকা (যখন ৪ পয়সায় এক সের দুধ পাওয়া যেত)। কিন্তু টাউনহল ভাড়া ও ডাক টিকিটের জন্য খরচ হয়েছিল ১৪৬ টাকা। আর একটি টাকাও খরচ করতে হয়নি উদ্যোক্তাদের। কারণ ছাপাখানা, ফুলওয়ালা প্রভৃতি সাধারণ মানুষ কেউ একটা পয়সাও গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। কোন জননেতার পক্ষে আজও দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই হৃদয়অর্ঘ্য পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। সেই সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ পাঠ করেছিলেন তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করছি, "উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক তিনি বল্লেন, 'আমি বহু 'হব', সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টি, সেই ইচ্ছার নিয়মে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখন সম্ভব হত না। এই যে আত্মদান-মূলক সৃষ্টিশক্তি এ দেবীশক্তি।"

বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক হিসাবে প্রাপ্ত বেতনের সবটাই (তখনকার দিনের ৭০,০০০ টাকা) বিজ্ঞান কলেজকে দান করে দিয়েছেন এবং নিজস্ব ৫৬,০০০ টাকার শেয়ারের অংশ বেঙ্গল কেমিক্যালকে দান করে গেলেন। বস্তুতঃ জীবনের কোন মুহূর্ত অর্থ সঞ্চয়ের ভাবনা মনে উঁকি দেয়নি। অর্থের প্রতি লালসা ত্যাগ করা আমার মনে হয় সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। গভীর আধ্যাত্ম চেতনা ও কঠোর সংযম সাধনা ব্যতীত তা অর্জন করা দুঃসাধ্য। আচার্যদেব সে কামনা থেকেও মুক্ত ছিলেন নতুবা বেঙ্গল কেমিক্যালের নামের সঙ্গে নিজের নামটা যুক্ত করে দিলে বোধ হয় কারও কোন আপত্তির কারণ ঘটত না, অথবা যে অর্থ দান করে গিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তা দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইনস্টিটিউট—এই ধরনের নাম দিয়ে কোন রসায়ন গবেষণা কেন্দ্রেও করতে পারতেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের কথায় সেই 'Serene indifference to wealth and fame' ছিল বলেই তিনি ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যমুনার তীরে মালা জপতে জপতে এক সাধু যখন পায়ে ঠেকা পরশ পাথরখানাকে পায়েই ঠেলে বালুর নীচে রাখছেন—'যদি কভু লাগে দানে'—এই মনে করে, তখন বুঝতে হবে 'যে ধনে

হইয়া ধনী মণিরে মান না মানি', এমন এক ধন তিনি পেয়েছেন, গীতায় যাকে বলা হয়েছে "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" —যা পেলে সব ধন তুচ্ছ, সব দুঃখ উপেক্ষণীয়— এটাই পরাশান্তির আঙিনা। আচার্যদেব 'সেই আঙিনায়' স্থিত হতে পেরেছিলেন বলেই 'আত্মচরিতে' বলেছেন, "আত্মনেব চ সন্তুষ্টঃ' অর্থাৎ নিজের মধ্যে নিজেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যাহারা অপ্রিয় ব্যাপার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, তাহাদের সৌভাগ্য আমি কামনা করি; অন্যের মনোভাব সম্বন্ধে সব সময় ভালো দিকটাই দেখতে হয়, ··· যদিও আমি একজন শিল্প ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য, তথাপি আমার তরুণ বয়স হইতেই আমি এই জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি এবং বিষয়-সম্পত্তির উপর আমার বিরাগ প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ··· 'অর্থমনর্থম্ ভাবায় নিত্যম্' এই কথাটি সর্বদা আমার মনে রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় আত্মজীবনীতে 'আমি' শব্দটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার অপরিহার্য, ইহাতে অহং—জ্ঞানের ভাব অতিমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবার আশংকা আছে। সুতরাং যখনই এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তখনই আমার বিষম দায়িত্বের কথা স্মরণ হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে আমি কাজ করিয়াছি ভগবানের হস্তধৃত যন্ত্ররূপেই করিয়াছি।

"আমার ব্যর্থতা আমার নিজের। কিন্তু আমার জীবনে যদি কিছু সাফল্য হইয়া থাকে, তবে তাহা ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানেই আমাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

"আমার জীবনের বিবিধ কর্ম বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি নিম্নলিখিত শাস্ত্র বাক্যটির তাৎপর্য অনুভব করিয়াছি, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'।" গীতা বলেছেন, 'নিমিত্তমাত্রং ভব' (১১/৩৩) নিমিত্ত মাত্র হও। পরিপূর্ণরূপে শরণাগত হও। তাঁর হাতের বাঁশী হতে হবে। আমাদের শুধু ফাঁপা হতে হবে। অন্তর থেকে সমস্ত অহংকার, অভিমান ও ক্ষুদ্রতাকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিতে হবে—তবে তিনি বাজাবেন ইচ্ছানুরূপ সুরের ঝংকারে। যীশুখ্রীষ্টও একই কথা বলেছেন, Empty thyself, I shall fill thee, আচার্যদেব তাঁর আত্মচরিতের শেষ পৃষ্ঠায় এই 'তাৎপর্যের' কথাই—এই পরম অনুভবের কথাই বলেছেন।

কঠশ্রুতিতে আছে,

"যদা সর্ব্বে প্রবিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অর্থ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥"

অর্থাৎ এই সংসারেই যখন হৃদয়ের কামনা গ্রন্থিগুলি নাশপ্রাপ্ত হয়, তখনই মরণশীল মানুষ অমরত্ব লাভ করে। এটাই হল নিখিল বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। আচার্যদেব তাই অমর—তাই নবীন মূর্তিতে ভারতের এক প্রাচীন ঋষি।

তাঁর জন্মভূমিতে আমরা জন্মলাভ করে ধন্য হয়েছি। ঈশ্বর আমাদের আচার্যদেবকে স্মরণ-মনন করবার যোগ্যতা দান করুন—এই প্রার্থনা করি।

A Twentieth Century Rishi

Sir Jadunath Sarkar
Kt. C.I.E. D. Litt.

With the death of Sir Prafulla Chandra Ray a lofty becon-light of our nation has been quenched, and a character has disappeared from our midst which can hardly ever reappear in the coming centuries, since our social evolution has already taken a turn to a new stage. He was himself an eminent research worker in Chemistry and the teacher of two generations of scientific workers; indeed, in popular parlance he bore the title of "the Father of D. Sc's". In this respect he ran true to the type of our ancient Rishis, — those self-forgetting, life-devoting, austerely simple, but smiling and childlike, gurus, who moulded Indian life and thought twenty-five centuries ago. Indian scientists now in the fulness of life can truly speak of him as Bhavabhuti spoke of the father of Indian song: "He the primeval Great Teacher, who gave origin to our craft."

Acharya Prafulla Chandra, as he was lovingly called in Bengal, was the 'Kulapati' of Indian Science; his pupils and his pupils' pupils fill many a chair in laboratories all over India; and many others who had not been privileged to sit at his feet, have been inspired by the example of his life.

And a life, so rich in its variety, so fruitful of achievement, and so unfailingly directed to a single goal for 83 years, deserves reverential contemplation for our own good. Hard working, abstemiously poor professors of Chemistry there have been on the Continent especially in France. His visit to one such old savant in a poor servantless tenement in the suburbs of Paris, during his Continental tour of 1921, Dr. Ray described to me with rapt admiration. But what raised P. C. Ray to a different plane from them was the practical side of his life's work. This original investigator of Nature's secrets, this abstract scientist, was at the same time an intensely practical patriot. Scorning to win cheap popularity by flattering the current whims of our 'educated public', he kept crying out month after month,

year after year, from the platform and the press : 'Young men of India ! give up indolence, give up your habits of luxury, pursue plain living and high thinking throw away the hollow bombast and deceptive slogans of politics, and turn to the economic regeneration of the country. Otherwise, our race would become extinct.' His insistence on this primal need of the nation made supercilious 'leaders' sneer at him (in private talk) as an old crack-brain. But he also won the lasting gratitude and devotion of thousands of his thoughtful countrymen, as a true light of life. And he set practical examples of how to do it. This aim he kept before himself and before his countrymen to the last day of his life, and always stressed to us who had the privilege of his private friendship.

Judged by the use he made of his life's opportunities in pursuing his ideal, and not merely by the honour and wealth he earned (though these, too, were considerable for a middle-class Bengali college teacher)—his career was in every sense fruitful of success. His equipment for his chosen work was the highest possible and richly varied. Born on 2nd August 1861, he went through the undergraduate course in Calcutta, won the Gilchrist Scholarship for study in Britain (1882), and joined the Edinburgh University where he obtained the D. Sc. Degree in 1887. His career there is best illustrated by the following conversation :

In 1936 the Dacca University conferred honorary doctorates on Sir P. C. Ray and Sir John Anderson the Governor of Bengal. At the tea party following the ceremony, Dr. Ray sitting at the right hand of the Governor smilingly remarked to him, "Today we have become enrolled in the same University. We are fellow students now."

Sir John,—"Was it not earlier ? Are you not a Faraday Gold Medalist of the Edinburgh University and were you not elected Vice-President of the University Natural Philosophy Society in 1886 ?" Sir P. C., 'Yes'.

Sir John—"I also won that medal and was elected a Vice-President of the Society, eighteen years after you. In looking up the lists of my predecessors in that office and among the former medalists I found your name in 1886."

Then their talk drifted on to Ray's contemporaries at Edinburgh who had since made great names in science and some of whom were Anderson's teachers, such as James Walker, Hugh Marshall, Alexander Smith and others.

The Scotsman entered the Civil Service of his country by a competitive examination open to all, and rose to be Governor of Bengal, a minister

under the British Crown and a Right Hon'ble Member of the War Cabinet. His Bengali compeer,—who had won the same academic honours (and a doctorate in addition) eighteen years earlier was admitted to the provincial educational service of his own country grudgingly by nomination, and was confined to the same subordinate category throughout his 27 years of Government service. Sir Alfred Croft, the Director of Public Instruction, refused him a post in the higher service (I. E. S.) with the consoling words, "Many other ways of life are open to you. Nobody compels you to enter the education service." (P. C. Ray's Autobiography).

On his return to India Dr. Prafulla Chandra secured employment as an Assistant Lecturer in Chemistry at the Government Presidency College, Calcutta, in June 1889, and continued to serve there till his retirement in 1916, when the Calcutta University took him up as the Palit Professor of Chemistry at its newly founded Science College in Upper Circular Road. Here in a single barely-furnished upper room he passed all his remaining years, and here he breathed his last, on 16th June 1944, at the age of almost 83 years. His presence there and his daily work in the laboratory year after year, were an inspiration to countless students, even to those who did not profess Chemistry. It was a life wholly dedicated to science—and also to the country's varied interests, as I shall show later.

After being settled in life in Calcutta the young scientist proposed for the hand of the daughter of a very well-known cultured family, but his suit was rejected and one of his pupils was preferred to him. (The lady later died young and without issue.) So, Prafulla Chandra remained a bachelor all his life ; it was a gain to science and to the country—and to himself also personally. The lonely hermit was spared the hundred and one worries of domestic management which fall on the father, and he escaped also.

The grief that saps the mind
For those on earth we see no more.

But it does not mean that henceforth he led a sordid self-control life, dead to the rest of mankind. On the contrary, he took the student community—not in Bengal alone—as his adopted sons, and lavished all his time, all his thoughts and nearly all of his money on them. His influence over them sprang not only from his life's example, but also from his varied mental equipment. Prafulla Chandra Ray was no narrow specialist who knows nothing and cares for nothing outside the minute subdivision of science in which he is making his researches. His liberal culture and

wide human outlook were reflected in his love of general literature, passion for reading history books and study of Sanskrit. Thus the scientific bias of his genius was balanced and corrected by literature, as Sir J. C. Bose's was by sumptuous examples of the painter's and sculptor's art, which the many visitors to the Bose Institute and Home must have noticed. In his old age, Dr. Ray was reading Cicero's 'De Senectute'. During one of my visits he told me in anger : "Look at a D. Sc. and one my pupils. I was dictating a paper of mine to him, when he suddenly stopped and asked me, 'How shall I spell Cicero ? Does it begin with S or C ?" The new generation knows nothing beyond science, and their minds are cramped by their want of a broad general culture. From this basic defect even their writings on science will be unreadable. He was opposed to the abolition of compulsory Sanskrit from the Matriculation course and argued that the ignorance of this parent language would hopelessly weaken and vitiate the style of our Bengali writers, even on strictly scientific subjects ;—"those who do not know Sanskrit literature, cannot write Bengali well."

He told me that during his fifth visit to Europe (in 1926), he went to the Rotunda-like place in London (now destroyed in the Blitz) with bookshops radiating all around, and bought a copy of Tom Jones in five volumes, in a large paper clear-type edition, as very soothing to the eye in his old age ! classics, English fiction, Indian history, —all these were the delight of his life and the nourishing sap of his intellect.

His love of history and his love for the country drove him to suspend his 'modern' chemical research and study ancient Sanskrit works on science and make experiments to test the old formulae and recipes of Hindu medicine. Old Sanskrit works on chemistry (rasa-shastra) were traced by him, usually with the help of Autrecht's Catalogues Catalogorum of Sanskrit MSS, and he secured transcripts of them for study with the help of pandits. The multifarious and recondite learning shown by Dr. Rudolf Hoernle in editing and translating the Bower Manuscript, extorted his boundless admiration. At this stage of his studies in Hindu Chemistry, he one day told me in the Professors' Common Room, 'I admire Hoernle like a god. What marvellous scholarship ! It is more than human.'

At the same time he was no blind Chauvinist, no false patriotism would ever make him support any untrue claim. One day I collared him and asked, "Do you really believe that the ancient Hindus knew the atomic theory in its modern scientific sense ?"

He replied with a smile, "I don't. But I have given the theory in an appendix to my History of Hindu Chemistry as propounded by a friend who has been clearly stated as its father !!!"

He opposed the opening of the Indian mints to the free coinage of silver,—which would still further lower the exchange value of the Rupee,—though many Indian industrialists were ranged against his view. When in a neighbouring province (economically very weak), the bureaucracy (with some Indian support) proposed to spend ten lakhs of University office buildings, Sir P. C. Ray publicly declared that to spend so much on mere brick and mortar would be worse than a mistake, it would be a crime !

His heart was with the mass of the people, and not confined to the youth of the middle and the lower middle classes only. In 1917 and 1918 he spent his puja holidays (October) at Benares, and we used to row up and down the Ganges in a hired boat in the evening. One day he asked us about the owners of the lofty palaces bordering the river front,—this is the Sindhia House, this is the Udaipur House this is the Durbhanga Maharajah's Ghat, this is the old Peshwa's Palace (since purchased by a Rajah), and so on. Then he remarked, "I can now understand why there is Socialism in this world. Look at these lofty mansions of the idle rich and look at the miserable huts of the actual workers and cultivators that I saw bordering the railway line for many miles before Benares." Then, looking at the priests fleecing the pilgrims at the sacred ghats, he added, "Did not Vivekananda say that there would be no regeneration of India unless we seized the priests by the long tufts of hair at the back of their heads and flung them into the ocean ? He was quite right."

Even a pure scientist cannot remain untouched by the politics that dominate the life of his countryman. Prafulla Chandra was a silent but ardent and at the same time farsighted and wise patriot, even from his student days in an alien land. He believed (as he once told me in his sitting room cum laboratory on the ground floor of the old Presidency College building, eastern wing), that the British conquest of India was a divine dispensation for our own good, as a necessary step in our evolution towards advanced science, industry and modern knowledge. This was also the publicly avowed opinion of Bankim Chandra, the author of the ignorantly-denounced song Bande Mataram. But, at the same time, he was keen to point out the shortcomings of the actual British Indian

administration and the prevalence of drift and absence at Whitehall of a clearly laid and persistently followed policy of Indian uplift. On this subject he wrote a strongly worded and fully documented anonymous pamphlet when a student at Edinburgh, which he later acknowledged in his Autobiography. When Lord Curzon, in his address as Chancellor of the Calcutta University, told us that truthfulness is a virtue peculiar to Europe and little known and less valued in the East, the students hissed at him as he was leaving the Senate House. I was not in Calcutta at the time. Sir P. C. Ray who narrated the story to me added, "Those who can applaud have also a right to hiss." Some readers may remember how the very next morning the Amrita Bazar Patrika published an extract from Lord Curzon's travel-book in which he boasts how he had lied to the Prime Minister of Korea in order to gain a diplomatic point !

This keenness to ensure the lasting good of his countrymen was at the bottom of his opposition to all disruptive schemes like the yearly deteriorating Bengal Secondary Education Bills and the attempts of designing leaders to widen the cleavage between the Hindus and the Muslims,—who in Bengal at least from one society, separated only by religion (with attendant meal and marriage customs). He applauded every attempt to show how the literature produced by the Bengali Muslims is very genuine Bengali,—and once embraced a Muslim essayist on this subject on the platform of a Bengali Literary Conference at Rajshahi. He subsidised the publication of Reza-ul-Karim's thoughtful English essays appealing for Hindu-Moslem Unity.

The dream of his life, as he often used to tell his friends in his Presidency College days, was to see a fully equipped institute of scientific research established in India. That dream was realised, thanks to the munificence of Taraknath Palit and Rashbehari Ghosh, in 1916. Himself leading a hermit's life of simplicity and abstinence, he pleaded for the necessary equipment of apparatus to the fullest extent. Any parsimony here would, he argued, be false economy and harmful to the nation's advance by nullifying the labours of the savants. At a meeting of the Hindu University Court (at Benares, in 1918), he argued, "I am a scientific worker ; you see how I am dressed. If my coat sleeves are examined you will find proof that I am a chemist, accustomed to handling corrosive acids. I do not ask for anything for myself. But I tell you, you must equip your laboratories with the latest and best apparatus, or you

will not get the fullest benefit from the genius and industry of your students." This speech convinced even those Elders who had been clamouring to see again the day when "Five thousand Vidyarthis (students) would squat down on the grass under the trees and go through their college courses,"—very cheaply.

Of his personal charity, large-scale relief organisation, fundation of industries, tireless efforts at social uplift and practical help, I have no time to speak today.

[From *Modern Review* July 1944]

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্বপুরুষ

নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্বজেরা ছিলেন মৌদ্‌গল্য গোত্রীয়—উপাধি ছিল দেব, দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। এই বংশের আদি পুরুষ বিজয় হরিদেব দাক্ষিণাত্য থেকে এসে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বা আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটিতে বসতি স্থাপন করেন। এই হরিদেব থেকে অষ্টম পুরুষ ছিলেন পীতাম্বর। নবাব সরকারে চাকরী করে তিনি খাঁ উপাধি লাভ করেন। তিনি বিপুল সমারোহে কুলযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সমাজে 'ধন্য পীতাম্বর' নামে খ্যাতি অর্জন করেন। ধন্য পীতাম্বর থেকে পঞ্চম পুরুষ ছিলেন শিবদাস দেবসরকার। তিনি গৌড়াধিপ হুসেন শাহের অধীনে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে তাঁর স্নেহভাজন হন এবং সরকার উপাধি লাভ করেন। তিনি নবাবের অনুগ্রহে মলুই পরগণার জমিদারী লাভ করে কপোতাক্ষের কূলে বর্তমান ঝিকরগাছার কাছে হাজিরালি গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। তাঁর শ্রীরাম খাঁ ও নীলাম্বর খাঁ নামে দু'পুত্র ছিল।

শ্রীরাম খাঁ থেকে প্রসিদ্ধ বোধখানার চৌধুরী বংশের উদ্ভব। শ্রীরাম খাঁ একটু স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইসলাম ধর্মপ্রচারক গাজীদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল না। শেষ কালে গাজীর অত্যাচারে তিনি সপরিবারে নিহত হন। তখন তাঁর নাবালক পুত্র অজিত নারায়ণ তাঁদের এক বিশ্বস্ত দাসীর সাহায্যে কোনক্রমে প্রাণে রক্ষা পান। ঐ বিপদের পর নীলাম্বর খাঁ বোধখানা ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে হরিঢালীতে এসে বসবাস শুরু করেন। নীলাম্বরের পৌত্র ছিলেন শ্রীরাম মল্লিক—মোগল আধিপত্য স্বীকার করে তিনি মলুই পরগণার জমিদারী বহাল রাখেন। কপিলমুনির কাছে শ্রীরামপুর বলে যে গ্রামখানি আছে তা তাঁরই নামে গড়ে উঠেছিল। শ্রীরামের পুত্র রামগোপালই রাড়ুলীর রায়চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ বলে স্বীকৃত।

রামগোপালের কমলাকান্ত, গোপীকান্ত, রঘুনন্দন ও শ্রীহরি নামে চার পুত্র ছিল। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কমলাকান্তের বীরত্বের কথা নিয়ে নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তিনি খুবই বলিষ্ঠ ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করতে তখন তাঁর সমকক্ষ ওদিকে কেউ ছিল না। খুলনার দক্ষিণাংশ জুড়ে তখন মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের অত্যাচারে লোক ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাত। জলপথে তারা দেশের ভেতরে প্রবেশ করে নৃশংসভাবে ধ্বংসলীলা চালাত। যুবতীদের প্রতি তাদের জঘন্য অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। কমলাকান্ত অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে গুটিকয় বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে কেওড়া ও হিজল গাছে ভরা নদীর বাঁকে লুকিয়ে,

অতর্কিতে তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়ে, সেই সব জলদস্যুদের বিপর্যস্ত করে দিতেন। তাঁর অসীম সাহস ও বীরত্বের ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। তিনি দস্যুদের আক্রমণ থেকে নিজ পরিবারদের নিষ্কণ্টক করবার জন্য নদীকূল থেকে দূরে হরিঢালী গ্রামে বসতি সরিয়ে নিয়েছিলেন—আর সে-স্থানের সুরক্ষার জন্য চারপাশে গড় কেটে রেখেছিলেন। দস্যুদমনে সব সময় ব্যাপৃত থাকায় এবং প্রজাদের কাছ থেকে ঠিকমত খাজনা আদায় করতে না পারায় তিনি খুবই অর্থকষ্টে পড়েন। ফলে, ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে বাকি খাজনার দায়ে তাঁদের ভূসম্পত্তি চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়ের অধিকারে চলে যায়।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রামগোপালের তৃতীয় পুত্র রঘুনন্দন বোধহয় হরিঢালী ত্যাগ করে বুড়নপুর অঞ্চলে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রায়চৌধুরীদের প্রাচীন দলিলপত্রাদি বিচার করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশ মিত্র মনে করেন, "কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ মলুই পরগণার অন্তর্গত বুড়নপুর গ্রামের একাংশে গিয়া বসতি স্থাপন করেন।" এ কারণ ঐ পাড়া রায়ের আলি>রাড়ুলী নামে পরিচিতি লাভ করে। এখনও রাড়ুলীর দাক্ষিণ-পূর্বাংশের একটা বড় অঞ্চলকে বুড়নপুর বলা হয়। রামকৃষ্ণ ও তাঁদের পরিবারের সকলেই হরিঢালী ছেড়ে তখনও রাড়ুলীতে চলে আসেননি। কেউ কেউ হরিঢালীতেও বাস করতেন।

রামকৃষ্ণের চার পুত্র ছিল—শিবচরণ, দয়ারাম, শুকদেব ও চন্দ্রশেখর। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচরণ ঢাকার দেওয়ান মুহম্মদ রেজাখাঁর মুন্সী ছিলেন। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে যশোরে ইংরেজ শাসনাধীনে রাজস্বকেন্দ্র স্থাপিত হলে শিবচন্দ্র যশোরে রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দয়ারামের পুত্র মানিকচন্দ্র সেই চাকরী লাভ করেন। মানিকচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ সরকারের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর পুত্র আনন্দলাল তরুণ বয়সে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। তাঁর চাকরী জীবনের বেশীর ভাগ সময় যশোরে কাটত। আনন্দলাল খুব সৌখীন ছিলেন। যশোর আদালতে সেরেস্তাদারী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। রাড়ুলীতে বিরাট অট্টালিকা-শোভিত সুন্দর বসতবাড়ী তিনি নির্মাণ করেন এবং গ্রামবাসীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তাঁদের বসতবাড়ি সংলগ্ন বড় পুকুর কাটিয়ে দেন।

আনন্দলালের পুত্র হরিশ্চন্দ্রই ছিলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক এবং লোকপ্রিয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা। তাঁর জন্ম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন কালে দেবচরিত্র রামতনু লাহিড়ীর ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁকে তাঁদের জমিদারীর তদারক করার জন্য পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে রাড়ুলীতে ফিরে আসতে হয়। তাছাড়া, অন্য আর একটা কারণ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই ঘটনার প্রায় তিন বছর আগে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন—তাই, আনন্দলাল সংস্কারমুক্ত পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে তাঁর আওতার বাইরে রাখা নিরাপদ মনে করেন নাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। তাঁর কথায় তাঁর পূর্বপুরুষ জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে

বা তার কিছুপরে বুড়নপুরে এসে বাস করেন। নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে তাঁদের জায়গীর ছিল। তাঁর প্রপিতামহ মানিক রায় নদীয়া ও যশোরের কালেক্টরের দেওয়ানের উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। সে-সময় তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। তিনি মাঝে মাঝে মাটির হাঁড়ি ভরে কোম্পানীর 'সিক্কাটাকা' বাড়িতে পাঠাতেন। বিশ্বস্ত বাহকেরা ছ'পাশে ভার বুঝিয়ে বাঁকে করে টাকা বয়ে নিয়ে যেত। সে-সময় এদেশে খুবই ডাকাতির ভয় ছিল। সেজন্য ডাকাতদের সন্দেহ দূর করবার জন্য মাটির হাঁড়ির নীচে টাকা ভর্তি করে উপরে বাতাসা দিয়ে ঢেকে আনা হত। আচার্যদেবের পিতামহ আনন্দলালও সেরেস্তাদারী করে তাঁদের সম্পত্তি যথেষ্ট বাড়িয়েছিলেন। আচার্যদেব মনে করতেন, তাঁর প্রপিতামহের সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্য তাঁদের বিশাল বাড়ির কোনো অংশে মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল অথবা ঘরের মেজে বা দেওয়ালের কন্দরে সংরক্ষিত করে রাখা ছিল। তাঁদের বংশে একটা প্রবাদ আছে, আনন্দলাল সে গুপ্তধনের সংবাদ রাখতেন। কিন্তু তাঁর পিতামহ আনন্দলাল যশোরে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন এবং পিতা হরিশ্চন্দ্রের সেখানে পৌঁছবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে সেই গুপ্তধনের কথা সকলের অজ্ঞাত থেকে যায়। হরিশ্চন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর বাড়ির স্থানে স্থানে খুঁড়ে গুপ্তধনের সন্ধান করেছিলেন কিন্তু তার কোনো হদিস পাননি।

আচার্যদেবের প্রপিতামহ মানিকচন্দ্র রায় সে-যুগের তুলনায় যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত উদার, সংস্কারমুক্ত, বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তিনি কলকাতার শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁর সুহৃদ ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন'-এর সদস্য হয়েছিলেন। তিনি পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ভাল আরবী ও সংস্কৃত জানতেন। বাল্যকালে আচার্যদেব তাঁর পিতার কাছে Young-এর 'Night Thoughts' এবং Bacon-এর 'Novum Organum' গ্রন্থ ছুখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। তাঁর লাইব্রেরীতে অনেক মূল্যবান ইংরেজী গ্রন্থ ছিল। এর থেকে বোঝা যায় হরিশ্চন্দ্র ইংরেজীতেও যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছিলেন। তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'হিন্দু পত্রিকা', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং তার পূর্ববর্তী 'অমৃত-প্রবাহিনী', 'সোমপ্রকাশ', প্রবোধ-চন্দ্রিকা' আদি পত্রপত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। সংগীতেও ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। আচার্যদেব তাঁর আত্মজীবনীতে পিতার সম্বন্ধে লিখেছেন: "সন্ধ্যাকালে তাঁহার বৈঠকখানায় সঙ্গীতের জল্‌সা বসিত এবং পরবর্তী জীবনে স্বভাবতঃই তিনি সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শেষোক্ত ছুইজন বাংলাদেশে হিন্দুসঙ্গীতের পুনরভ্যুদয়ের জন্য অনেক কাজ করিয়াছেন।" আচার্যদেব আরও বলেছেন,—হাফেজ, সা'দী এবং বিখ্যাত ইংরেজ সুসাহিত্যিকদের গ্রন্থপাঠ করে তাঁর পিতার চরিত্র ও মন সুগঠিত হয়েছিল; তাই, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। সে-সময় বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন নব্য-বাঙ্গালার

মন জয় করে নিয়েছিল। হরিশচন্দ্র এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সক্রিয় সহায়ক ছিলেন। তিনি তাঁর উৎসাহ বিশেষভাবে প্রমাণ করবার জন্য রাড়ুলীর স্কুলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশকে বিধবা-বিবাহে সম্মত করান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতার হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর সাধু অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়নি। তবুও তখনকার প্রচলিত 'ধর্মবিরুদ্ধ' বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে উদ্যোগী হবার জন্য হরিশচন্দ্রকে গভীর বিপাকে পড়তে হয়েছিল। তাঁর পিতার শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে পাশের গ্রামগুলির বহুলোক যোগ দিতে অস্বীকার করল। কারণ, তিনি নাকি ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়েছিলেন। আচার্যদেব এই প্রসঙ্গে আত্মচরিতে আরও উল্লেখ করেছেন যে, সাতক্ষীরার জমিদার উমানাথ রায় একটা লোকপ্রিয় ছড়া বেঁধেছিলেন। ছড়ার প্রথম অন্তরাটি ছিল এমন ঃ 'হা কৃষ্ণ, হা হরি, এ কি ঘটাইল,/রাড়ুলী টাকীর ন্যায় দেশ মজাইল।'

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে হরিশচন্দ্র নিজের জমিদারীতে স্থিত হয়ে গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে মন দিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে তাঁর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ এবং সংবেদনশীল। রাড়ুলী গ্রামে তিনিই বোধহয় জেলার সর্বপ্রথম গ্রামীণ বালিকা বিদ্যালয় এবং মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তখন এটা ছিল একটা বিরল দৃষ্টান্ত।

১৩৪০ সালের ৫ই ফাল্গুন, দেশপত্রিকায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছিলেন,—"উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলকাতায় প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। কিছু সময়ের মধ্যে এই শিক্ষা বাঙ্গালাদেশের সুদূর পল্লীতেও ছড়াইয়া পড়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্র নিজ রাড়ুলী গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানকার বালক-বালিকাদের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেন।" তখন রাড়ুলী ছিল যশোর জেলার অন্তর্গত।

'সংবাদ প্রভাকর' ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৮ সংখ্যায় হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরীর স্বদেশীভাষায় বিদ্যালয় সংস্থাপন ও সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভূতপূর্ব সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ও (২৪শে মে ১৮৫৮) এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ছাত্রদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। আচার্যদেবের জননী ভুবনমোহিনী শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে বাংলা-পাঠশিক্ষায় সহায়তা করতেন। গ্রামের নারী সমাজে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করতে তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টা ছিল। সেই সময়কার জাতিভেদদীর্ণ, কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন নারীসমাজে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। দয়া-দাক্ষিণ্যে তাঁর তুলনা ছিল না। আচার্যদেব লিখেছেন ঃ তাঁর মাতা তাঁর পিতার কাছ থেকে উদার ভাব পেয়েছিলেন। বিলেত গেলে জাত যাবে তখনকার দিনের এ ধারনা তাঁর মনে স্থান পায় নাই। তাই, আচার্যদেবের বিলেত যাওয়া ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি করেন নাই।

হরিশচন্দ্র কেবল সমাজ-সেবা বা শিক্ষা-বিস্তারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেননি, গ্রামের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকেও দৃষ্টি রাখতেন। ঐ সময়ে অল্প আয়ের লোকদের টাকা খাটাবার কোন নিরাপদ উপায় ছিল না। চোর-ডাকাতের হাত থেকে টাকা পয়সা রক্ষা করা একটা মস্তবড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য লোকে টাকাকড়ি মাটির নীচে পুঁতে রাখত। হরিশচন্দ্র তাঁর

বাড়িতে একটা 'লোন-অফিস' খুললেন। তাঁর সততার খাতিরে লোকে স্থায়ী সুদে সেখানে টাকা গচ্ছিত রাখতে লাগল। সে যুগে এরূপ কর্মোদ্যোগ সহজ ছিল না।

আচার্যদেবের পিতার বাৎসরিক আয় ছিল দশ হাজার টাকা। গ্রামের চারিদিকে চারমাইল ঘিরে তাঁদের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে রাজার মতো রাজত্ব করতেন। তাঁদের কাছারী-বাড়ি সকাল ৮টা থেকে দুপুর পর্যন্ত পাইক-বরকন্দাজ, নায়েব, গোমস্তা, খাজাঞ্চী, প্রজা ও খাতকদের উপস্থিতিতে গম্‌গম্ করত। কাছারী-বাড়িতে রীতিমতো মামলা মোকদ্দমার বিচার হত। কিন্তু শেষ জীবনে ব্যবসায়ে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হয়নি।

হরিশ্চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ছিলেন বিশ্ববরেণ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পিতা হরিশ্চন্দ্রের উদার সাধুপ্রকৃতি, বিদ্যানুরাগ, স্বদেশপ্রেম, কর্মোদ্যোগ প্রবণতা নানাভাবে আচার্যদেবের মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত হয়েছিল।

সহায়ক গ্রন্থ ॥
১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—নগেন্দ্রনাথ বসু।
২। যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশ মিত্র।
৩। আত্মচরিত—প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

আচার্য স্মরণে

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা ঃ

আচার্যদেবের সপ্ততিতম জন্মোৎসব ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ সাল। স্থান ঃ টাউনহল। সভাপতিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উপলক্ষে চাঁদা উঠেছিল প্রায় সতের হাজার টাকা আর খরচ হয়েছিল একশো সাতচল্লিশ টাকা। চিঠির কাগজ, হ্যাণ্ডবিল, পোষ্টার প্রভৃতির জন্য কাগজ বিক্রেতারা কাগজ দিয়েছিলেন অমনি। ছাপাখানা অমনি ছেপেছিল। যাঁরা চাঁদা আদায় করতে বেরুতেন তাঁরা ট্রামভাড়া নিজেদের গাঁট থেকে দিতেন। বিশেষ কারণে মোটর দরকার হ'লে এক ভদ্রলোক পেট্রলসমেত তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। হিসাব-রক্ষক পয়সা নিতেন না। রোজ সন্ধ্যায় এসে খেটে দিয়ে যেতেন। অনুষ্ঠানের দিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ফুলওয়ালারা বিনা পয়সায় ফুল দিয়েছিল। অক্সিজেন সিলিণ্ডার অমনি পাওয়া গিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ নিজ পয়সায় চা খেয়ে আসত। সেদিন ছুটাছুটি করবার জন্য চারখানি মোটরের যোগাড় হয়েছিল। দরওয়ানরা বকশিশ নিল না।

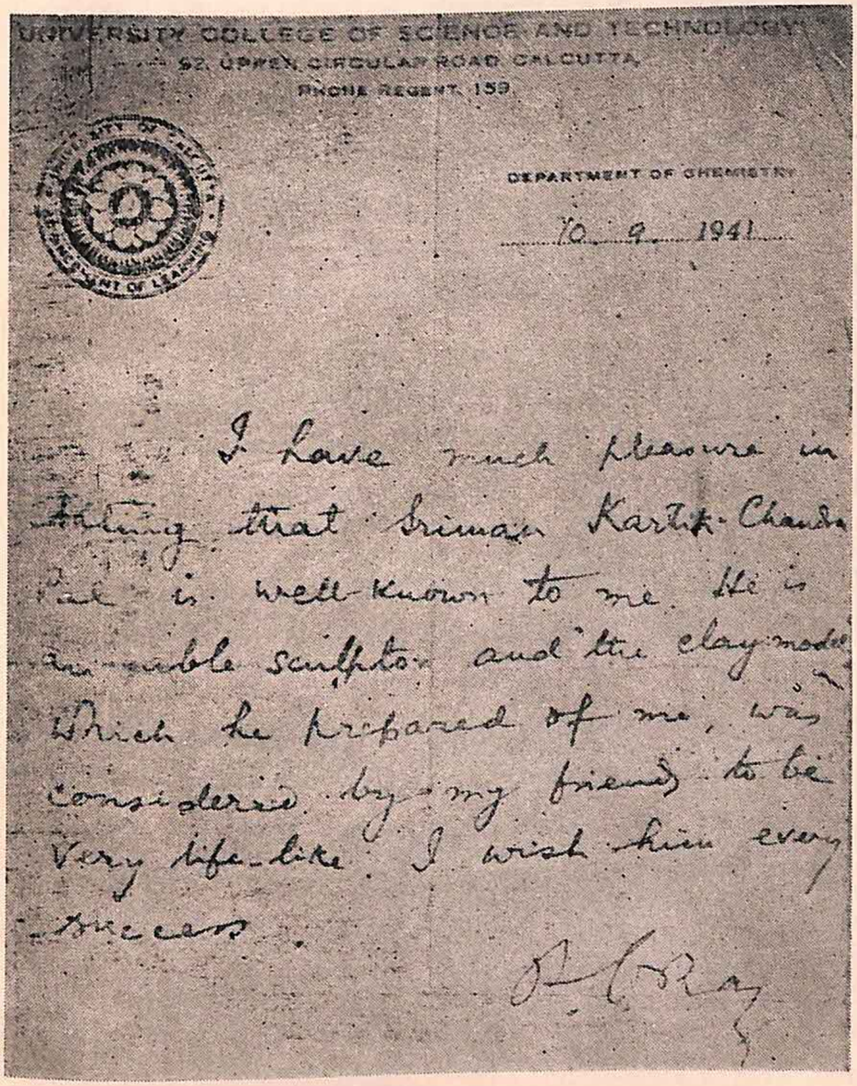
আদায়ী সতের হাজার টাকা পুরো মজুত রইল। সুদ যা আসে—দরিদ্র ছাত্রদের মাইনে দিতে, বই কিনতে দেওয়া হয়।

("জ্ঞান ও বিজ্ঞান" বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬০)



বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাল নির্মিত আচার্যদেবের আবক্ষ মর্মর মূর্তি

[মূর্তিটি ২রা আগষ্ট ১৯৮৬ বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামকে প্রদত্ত হইয়াছে]



UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
92, UPPER CIRCULAR ROAD CALCUTTA
PHONE REGENT 159

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

10. 9. 1941

I have much pleasure in stating that Sriman Kartik Chandra Pal is well known to me. He is an able sculptor and the clay model which he prepared of me, was considered by my friends to be very life-like. I wish him every success.

আচার্যদেবের মর্মর মূর্তি সম্বন্ধে আচার্যদেবের স্বহস্তে প্রদত্ত সার্টিফিকেট

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজচিন্তা

কুমার মিত্র

মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন—জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কোন দেশে বা যুগে বিশেষ কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তখন মঙ্গলময় বিধাতা যেন তাঁহার বিধান সংসিদ্ধ করিবার জন্য এক একজন মহাপুরুষকে আনিয়া উপস্থিত করেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে, ধর্মজগতে, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। গীতাকারোক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশে প্রযোজ্য। অবশ্য কথাগুলি বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝিয়া লইতে হয়। নতুবা ধর্মের, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যুগ প্রবর্তকগণের প্রত্যেককেই অবতার বলিতে হয়। তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই—যখন যেমন লোকের প্রয়োজন তখন সেইরূপ লোকেরই আবির্ভাব হয়।

(পত্র—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১২)

আচার্যদেবের বক্তব্য তাঁর গভীর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। যখন যেমন লোকের প্রয়োজন কে স্থির করেন এই প্রসঙ্গে তিনি মঙ্গলময় বিধাতার কথা বলেছেন। সমাজতত্ত্ব-বিদেরা মনে করেন নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই এই প্রয়োজন নির্ধারণ করে। এই অবস্থাই সামাজিক-মন গঠন করে, মনীষীদের চিন্তাধারাকে বাস্তবে প্রভাবিত করে।

আচার্যদেব বিশ্বখ্যাত মনীষী। তাঁর সমাজ-চিন্তার গতিপ্রকৃতি সঠিক উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন সেই সময়কার পরিস্থিতি আলোচনা করা।

মানসিক গঠনের পটভূমি ঃ

ভারতের প্রথম সশস্ত্র জাতীয় বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত। সারা-ভারতের হৃদয়ে বৃটিশবিরোধী চেতনা সঞ্চারিত হ'ল।

এরপর ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ মাত্র ছ'বছরের মধ্যে বাংলায় বর্ধমান নবজাগরণের পীঠস্থানে জন্ম নিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), নীলরতন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাতজন মনীষী।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরি-স্থিতির প্রয়োজনে এই মনীষীদের আবির্ভাব হয়।

ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে। বৃটিশ শাসনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার

সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ভারতের অর্থনীতির স্বাতন্ত্র্য অতীতে থাকলেও বর্তমানে প্রায় লুপ্ত।

আচার্যদেব বলেছেন—আমরা যে আজ সামাজিক, আর্থিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ঘূর্ণীর মধ্যে পাক খাচ্ছি তার সর্বপ্রধান কারণ এই যে প্রাচীন বা মধ্যযুগের মত আর আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য নই। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে (অর্থাৎ বৃটিশ শাসনের আগে) আমাদের চিন্তা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতা (ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা) তার চিন্তা ও কর্মের সকল-রকম উপকরণ নিয়ে এসে সকল দিক থেকে আমাদের ধাক্কা দিলে। সে ধাক্কায় আমরা সাড়া দিলাম। আমাদের ঘুম ভাঙতে আরম্ভ হ'ল। চোখ চেয়ে দেখলাম সারা জগৎ জুড়ে বিবিধ ঘটনা-পুঞ্জ আশ্চর্য গতিতে ছুটে চলেছে এবং তার ফলে সব দেশের মানুষের চিন্তায়, কর্মে ও সমাজে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটছে। এই সকল আন্দোলনের তরঙ্গ একে একে আমাদের সমাজের উপর এসে পড়েছে। (প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩২৭)

কি অপূর্ব ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ। ইউরোপে ধনতন্ত্র বিকাশের পর্বে যে বহুমুখী নব-জাগরণের সূত্রপাত হয় তার ঢেউ আমাদের দেশেও বহুমুখী নবজাগরণের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। আমরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হলাম।

কিন্তু ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন ঘটল?

এ প্রসঙ্গে আচার্যদেব বলেছেন—

"আজ এই বাষ্প ও তড়িৎ শক্তির যুগে এই রেল, টেলিগ্রাফ ও জাহাজ প্রচলনের দিনে আমরা আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছি। ইংরেজ অধিকারের পূর্বে বাঙালী একরূপ সুখে ছিল। জীবন সংগ্রামে কঠিন প্রতিযোগিতার প্রবল আঘাত তখন বাংলায় লাগে নাই। তারপর অবস্থার পরিবর্তন হ'তে থাকল। দেশে রেলপথ বিস্তৃত হ'ল, বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হ'ল, বাঙালীর দেহের রক্ত জল করা ফসলে বিদেশী বণিক প্রচুর অর্থলাভ করে সম্পদে স্ফীত হ'ল। আর বাঙ্গালী অবাক বিস্ময়ে আপন শোচনীয় অধঃপতনকে বিধিলিপি বলে স্বীকার করে নিল।"

ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম শোষণে বাংলার চরম দুর্দশা। বাঙালী এই দুর্দশা প্রতিরোধে উদ্যোগী হ'ল না।

তা হ'লে এখন কি কর্তব্য? উত্তরে আচার্যদেব বললেন—"সমস্ত পৃথিবীতে আজ ঘটনাচক্র এমন আশ্চর্যবেগে ঘূর্ণ্যমান যে এর ভিতরে অবস্থান করে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লে বিগত একশত বৎসরে আমরা যে সব কাজ করিনি, তা আজ এক বৎসরে সেরে নিতে হ'বে। নইলে রক্ষা নাই।"

কি সেই কাজ? আচার্যদেব বললেন—আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত, জাতির সর্বতোমুখী উন্নতি ও বিকাশ। যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ অনন্যকর্মা হয়ে এ সমস্যার মীমাংসায় নিয়োজিত না হয় তবে জাতির মৃত্যু।

(প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩২৭)

জাতির এই সন্ধিক্ষণে জাতির এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবির্ভূত হলেন সাতজন মনীষী।

এর আগে ইউরোপের নবজাগরণের ঢেউ বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করেছিল। তাই রামমোহন রায় উপলব্ধি করেছিলেন দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সার্থকতা। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানরাশি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন আয়ত্ত না করলে চিন্তা-স্রোতে জোয়ার আসবে না। তাই তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এই মনীষীরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তা প্রধানতঃ (ক) জাতীয় চেতনার বিকাশ সাধন (খ) জাতীয় ঐক্যবোধকে প্রসারিত করা (গ) জাতিভেদ ও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান (ঘ) জাতীয় চেতনার সাথে আন্তর্জাতিক চেতনার সমন্বয় সাধন (ঙ) ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম (চ) ইংরেজী শিক্ষা (তথা আধুনিক শিক্ষা) প্রসার (ছ) বিজ্ঞান গবেষণা ও শিল্প বিকাশের জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা (জ) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শক্তিশালী করা।

একদিকে পুরাণো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম অপরদিকে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপ্রসূত সাংস্কৃতিক অবদানগুলি গ্রহণের জন্য আন্দোলন এবং বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ আর বিজ্ঞান-গবেষণা ও আধুনিক স্বদেশী শিল্প গড়ার নেতৃত্বদান করে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ যত দ্রুত সম্ভব (আচার্যদেবের কথায় একশত বছরের কাজ এক বছরে করা) গড়ে তোলা। সাথে সাথে এই প্রচেষ্টার প্রধান শত্রু, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। এই কাজগুলি পরস্পরের পরিপূরক।

তাই আচার্যদেব বলেছেন—মানসিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা একসঙ্গে হওয়া চাই।

প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজ চিন্তার মূলে ঃ

আচার্যদেবের সমাজ চিন্তার পটভূমি উপরের আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হ'ল। তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মূলে ছিল কত দ্রুত ভারতবর্ষে স্বদেশী শিল্পের বনিয়াদ গড়ে তোলা যায়।

তিনি বলেছেন—দেশে যাতে বিজ্ঞানচর্চা হয় এবং নব্য যুবক চাকরীর উমেদারী ছেড়ে শিল্পোন্নতির কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন সর্বত্রই আমার এই নিশান।

তিনি আরও বলেছেন—জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ৫০ বছর পূর্বে দেশের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অনেক দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার সময়োপযোগী পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এখন আমাদের সামনে পা ফেলে চলতে এবং তার জন্যে নানা দিকে আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে—এই আমাদের প্রধান কর্তব্য।

তা হ'লে বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার সমাধান এবং জাতির পশ্চাৎপদতা দূর করার সঠিক পথ প্রদর্শন বাস্তবে সম্ভব হবে।

সমাজ চিন্তার মৌলিকত্ব ঃ

আচার্যদেবের সমাজচিন্তার মৌলিকত্ব এখানেই যে ভারতের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব যদি ভারত

আধুনিক শিল্প গঠনে স্বাবলম্বী হতে পারে। তিনি বলেছেন—ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে না পারলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অন্য সবকিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। এই শিল্প বিকাশের জন্য যুগপৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য সংগ্রাম করা দরকার। শুধুমাত্র সমাজ সংস্কারের আন্দোলন অথবা বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন বিচ্ছিন্ন-ভাবে করলে ভারতের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শন করা সম্ভব হবে না। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি তাঁর চিন্তা কতখানি সঠিক ছিল।

লক্ষণীয় যে, আচার্যদেবের মত এইরকম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুগ প্রবর্তক সেই সময়ে আবির্ভূত হয়নি।

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

এবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ

(ক) শিল্প বিকাশে বাধাদানকারী শক্তি ঃ

(১) বৃটিশ শাসনঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'আত্ম-চরিতে' বর্ণনা করেছেন কিভাবে বৃটিশ শাসন এদেশের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি ধ্বংস করেছে আর পরবর্তীকালে ভারতবাসীর উদ্যোগে গঠিত শিল্পবিকাশে প্রতিপদে চরম বাধার সৃষ্টি করেছে। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতে স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার প্রধান শত্রু কে।

(২) জাতিভেদ প্রথাঃ তিনি বলেছেন বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশের পথে, জাতিভেদ প্রথা প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছিল। তিনি 'আত্ম-চরিতে' বলেছেন—"করণ-কৌশলের চর্চা নিম্নবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট হইল। বৃত্তিগুলি হইয়া উঠিল বংশানু-ক্রমিক। ইহার ফলে নির্মাণে সূক্ষ্মতা বা ব্যবহার চাতুর্যে উন্নতি হইল সত্য কিন্তু ইহার জন্য যে মূল্য দিতে হইল তাহা অত্যধিক। সমাজের মননশীল অংশের সঙ্গে করণ-কৌশলের চর্চাকারী অংশের সক্রিয় কোন যোগ রহিল না। কাজেই বিবিধ ব্যাপার কেমন করিয়া এবং কেন ঘটে কার্য ও কারণের সমন্বয় কি করিয়া সাধন করা যায় সে সকলের বোধ এক কথায় অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গেল। এদেশের নাম বিশ্বের বিজ্ঞান-মানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল।

"মানসিক আচ্ছন্নতা ও অবক্ষয়ের এই দেশে হস্তশিল্পী শ্রেণীর লোকেরাই নিজগুণে সম্পূর্ণ নিজবুদ্ধিতে প্রখর কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে—এইগুলিই তাঁদের একমাত্র সম্বল—প্রাচীন ঐতিহ্যের বজায় রাখিয়াছেন। শিক্ষা-দীক্ষার সহিত ব্যবসা বা শিল্পের আর কোন সম্পর্কই রইল না। আমাদের সমাজে বিদ্যাবুদ্ধি সব কিছুই উঁচু জাতের। সমাজের নিম্নস্তরে—দলিত জনসংঘের তাই প্রতিভার বিকাশ হ'ল না।

"ইংলণ্ডে জাতিভেদ ছিল না। তাই সেখানে সমাজের সকল স্তরেই প্রতিভার বিকাশ হয়েছে।"

চিন্তার মৌলিকত্ব ঃ

বহু সমাজ সংস্কারক জাতিভেদ প্রথার কুফল সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের

মৌলিকত্ব এখানে যে তিনি এই প্রথার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন যা বিজ্ঞানকে একেবারে অবশ করে ফেলেছিল। জাতির গঠন ও শিল্প বিকাশে এই জাতিভেদ প্রথা অনেক পরিমাণে বাধা দিয়েছে।

(৩) বাঙ্গালীর চাকরীর মোহ : ১৯০৯ সালে তাঁর লিখিত দারুণ আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মসীজীবী বাঙালী বুদ্ধিজীবী উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই চাকরী করতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু শতাব্দীর অন্তে দেখা দিল যে, বুদ্ধিজীবী বাঙালীকে এই চাকরীর মোহ অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আচার্যদেব লক্ষ্য করেছেন, বোম্বাই ও কলকাতার মধ্যে তফাৎ অনেক। তিনি 'আত্মচরিতে' বলেছেন—"বোম্বাই-এর স্যার ফজলভাই কয়েকটা কলের স্বত্বাধিকারী। আর আমরা ১৮ লক্ষ টাকা মূলধনের ভাঙা 'বঙ্গলক্ষ্মী' নিয়ে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত হাবুডুবু খাচ্ছি।"

বাংলার ধনী জমিদার বা ব্যবসায়ীরা শিল্পে পুঁজি নিয়োগে আদৌ উৎসাহী নয়। এই অবস্থায় বাংলার শিল্পে ও ব্যবসায় যদি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা উদ্যোগী না হয় তবে কে করবে? সুতরাং বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের চাকরীর মোহের বিরুদ্ধে তিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে গেছেন।

(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা : বাংলার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার কিছুদিন পরে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালু করল। আচার্যদেব এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে সকলেই কিছু কিছু জমিজমা জোগাড় ক'রে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। এই বসে খাওয়ার প্রবৃত্তিজনিত অলসতা আমাদের সর্বনাশ করলে। আবার যাঁদের টাকা জমেছে তাঁরা হয় মহাজনী করবেন নয় কোম্পানীর কাগজ অথবা জমিদারী কিনবেন এবং বংশানুক্রমে তা ভোগ করবেন। এছাড়া খাটাবার অন্য কোন মতলবই নেই।

জমা ও 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাঙ্গালীর পুঁজি যাতে শিল্প গড়ে তোলায় নিয়োজিত না হয় তার জন্য কি লোভনীয় ব্যবস্থা বৃটিশ শাসন এদেশে চালু করল! শিল্প গঠনের জন্য স্বদেশী মূলধনের অভাব স্থায়ী রূপ নিল। আচার্যদেবের মৌলিকত্ব এখানেই যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা কিভাবে নূতন ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনে চরম বাধার সৃষ্টি করেছিল তা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন।

(৫) কূপমণ্ডুকতা ও লোকাচার : আচার্যদেব বলেছেন—"লোকাচারের চাপে আমরা পঙ্গু হয়ে আছি অথচ বারবার মেনে চলেছি। কিন্তু সাগর-পারের লোকেরা কেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দগতি, অবাধ ও আত্মনির্ভর। দেখুন, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যে-সব বিদেশীরা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সিন্দুক ভরে টাকা নিয়ে দেশে ফিরছে, তাদের ওঠা-বসা, যাওয়া-আসায় বারবেলা ও তিথি-নক্ষত্রের কোন শাসন নেই, তারা প্রত্যেকে ব্যবহারেই স্ব-স্বাধীন। তাই, সর্বত্র তারা স্বাধীন। আমরা এমন কূপমণ্ডুক হয়ে পড়েছি যে আমাদের বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে।"

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেদিকে আচার্যদেব

অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তা হ'ল—ব্যবসা ও শিল্প-বিকাশের পথে অন্তরায় হ'ল—এই কূপমণ্ডুকতা।

পুরাণো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক অবক্ষয় কিভাবে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ স্বদেশী শিল্পবিকাশের পথে তা আমরা একমাত্র তাঁর মত মনীষীর চিন্তায় প্রতিফলিত হ'তে দেখি। এখানেই তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব।

(৬) অস্পৃশ্যতা ঃ জাতিভেদ প্রথার উগ্ররূপ অস্পৃশ্যতা সমাজ সংস্কারকেরা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু কিভাবে ইহা নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছিল এবং বর্তমানে করছে তা একমাত্র তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি। এর আগে এত স্পষ্টভাবে কেউ বলেননি।

তিনি বলেছেন—সামাজিক অত্যাচারের ফলে সাধারণ লোক অস্পৃশ্য ও মূর্খ পশুত্বে নেমে গেল। এদের মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে অস্পৃশ্যতা। এ বিশ্লেষণ অনন্য এবং বাস্তব সত্য।

(৭) কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ঃ আচার্যদেব নিজের জীবন ও প্রচারের মাধ্যমে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কেন তিনি এ-বিষয়ে এত গুরুত্ব আরোপ করলেন? তাঁর কথায় বলি—"বাস্তবিক ব্যবসা করে সাফল্যলাভ করতে শ্রমের মর্যাদাজ্ঞান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নিজের হাতে পাল্লা ধরতে হবে। নইলে বেহারা কর্মচারী রেখে নিজে সাক্ষীগোপালের মত বসে থাকলে ব্যর্থতা তার ফলদান করবে।"

কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর বাস্তব জ্ঞান। ব্যবসা ও শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাধা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি সজাগ এবং তিনি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন প্রায় এককভাবে।

(৮) অন্নসমস্যা ঃ 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তার প্রতিকার' গ্রন্থখানি তাঁর রচনা। তিনি বলেছেন—"অন্নসমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত আছে।" সুতরাং অন্নসমস্যার মৌলিক সমাধান বিচ্ছিন্নভাবে করা সম্ভব নয়। নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কারণ পরাধীনতা অবাধ শিল্পবিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়।

বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা নিয়ে আচার্যদেবের একান্ত উদ্বেগের পিছনে তাঁর সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কাজ করেছিল বলে কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু কেন তিনি বাঙ্গালীর সমস্যা নিয়ে এত বিব্রত? তাঁর মতে—"আমার স্থির বিশ্বাস বাঙ্গালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের পথ উন্মুক্ত। বাঙ্গালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচবেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙ্গালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করবে।"

সুতরাং যখন বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা ও চাকরীর মোহ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অথচ তাঁর চিন্তায় শুধুমাত্র বাংলা ও বাঙ্গালীর সমস্যাই স্থান পায়নি। সমগ্র ভারতের উন্নতির পথ বাংলা ও বাঙ্গালী দেখাতে পারে। তাই বাঙ্গালীকে এই সর্বভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের কর্তব্য পালনে আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া একথা

সবাই জানেন যে ভারতের যে কোন অঞ্চলে স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার জন্য তাঁর অযাচিত সাহায্য উদ্যোক্তারা লাভ করেছেন আর সংকট দেখা দিলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সমাধানে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল শিল্পের মালিক ভারতীয় হওয়া চাই।

এবার আলোচনা করা যাক তিনি শিল্পবিকাশের জন্য কি কি বিষয় প্রয়োজন মনে করতেন।

(১) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার প্রয়োগ: বিজ্ঞানের গবেষণা ও শিল্পবিকাশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। গবেষণালব্ধ ফলকে শিল্প গড়ে তোলার কাজে প্রয়োগ করতে হবে। এই ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

(২) নিরক্ষরতার দূরীকরণ: শুধুমাত্র মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সারাজীবন নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সংগ্রাম করেননি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বৃটিশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে আদৌ সচেষ্ট ছিল না। মার্শম্যান লিখেছেন—'The East Indian Directors thought that to educate the people of India was most absurd and suicidal measure and it must end in our expulsion from the country.' (রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ পৃঃ ৩৯)

সুতরাং ইংরেজ সরকার এদেশে শিক্ষা প্রসারের নামে আঁতকে উঠত। আচার্যদেব বলেছেন—প্রজাশক্তি যদি জাগিয়ে তুলতে হয় তবে এখন শিক্ষার দীপ গ্রামে গ্রামে জ্বেলে দিতে হবে। আন্দোলন জনসাধারণের ইচ্ছা, শক্তি ও সহানুভূতির উপর দাঁড়াতে পারবে।

সুতরাং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আচার্যদেবের ঐকান্তিক আগ্রহের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

(৩) ধর্ম সংস্কার: আচার্যদেব বলেছেন—'যখন মার্টিন লুথার পোপের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে স্বাধীন চিন্তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দিলেন, তখন তাঁর অদ্ভুত মনীষার সোনার কাঠির স্পর্শে মূর্চ্ছিত ইউরোপ চক্ষুরুন্মীলন করল।

ইউরোপের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শিল্পব্যবস্থা তথা ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করল। সুতরাং আমাদের দেশে শিল্প স্থাপনের মানসিকতা শক্তিশালী করতে হলে ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যুগোপযোগী ধর্মচেতনারই প্রকাশ।

(৪) শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার: তাঁর মতে তখনকার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল কেরানী সৃষ্টি করা। স্বাধীন চিন্তা বিকাশে চরম বাধার সৃষ্টি হোত, প্রতিভার স্ফুরণ বাধাপ্রাপ্ত হ'ত। সুতরাং তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী জানালেন। এই শিক্ষা শিল্প গড়ে তোলায় উৎসাহ যোগাবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা হ'ল—'বিশ্ববিদ্যালয়টি কারখানাগুলির নিকটে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তা হ'লে ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত—শিল্পাঞ্চল দূরে থাকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়নি।

(৫) স্ত্রীশিক্ষা : আচার্যদেবের কথায় বলি— 'বাংলার নবজাগরণের দিনে যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি বলে কেউ যে আছেন একথা তাঁরা একেবারেই ভুলে গেলেন। স্ত্রীজাতিকে গণ্ডমূর্খ ও অকেজো পুতুল করে রেখে আমরা সমাজের আধখানা অঙ্গকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু করেছি। স্ত্রীশিক্ষার স্থান তো কোথায়ও দেখছি না।'

ইংরেজ সরকারতো একেবারেই নিষ্ক্রিয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যশোহর-খুলনায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁর উদ্যোগে সংগঠন গড়ে ওঠে। তিনি ছিলেন তার সভাপতি। জাতি গঠনের ক্ষেত্রে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন।

(৬) জনসাধারণ : তিনি মনে করতেন শ্রমজীবী মানুষেরাই সমাজের মূলভিত্তি। তিনি বলেছেন—'জনসাধারণকে নিয়ে জাতি। জনসাধারণকে বাদ দিয়ে যা থাকে তা অন্য কিছু হ'তে পারে কিন্তু জাতি কোন কালেই নয়। জনসাধারণের শক্তির উপর ভিত্তি নেই বলে ভারতবর্ষে অনেক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

জাতি গঠনে জনসাধারণের যোগ্য ভূমিকার স্বীকৃতি তাঁর বক্তব্যে যথার্থভাবে প্রতিফলিত।

(৭) সেবাব্রত : বন্যায় ও দুর্ভিক্ষে জনসাধারণকে সেবা করার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন—এই সেবাব্রত দেশে একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। সমাজ সেবার আকাঙ্ক্ষা দেশের যুবকদের মধ্যে জেগেছে। এক অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের আগ্রহের ক্রমবর্দ্ধমান দেশপ্রীতি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া বাস্তবে এই সেবাব্রতের মধ্য দিয়েই স্থায়ী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তোলা যায়।

সেবাব্রতের গুরুত্ব তিনি শুধু মানবিক দিক থেকে চিন্তা করেননি ; তাঁর চিন্তা আরও গভীরে। এর রাজনৈতিক গুরুত্ব তাঁর চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে —এখানেই তাঁর মৌলিকত্ব।

(৮) রাজনীতি : বিলাতে যখন তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন India before and after the Mutiny বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তখনকার দিনে (১৮৮৫ খ্রীঃ) ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যে বৃটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিশেষ করে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ছিল অকুণ্ঠ। তাই ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে 'বিজ্ঞানীর বেশে বিপ্লবী' বলে চিহ্নিত করেছিল।

তিনি বলেছেন—"নরম বা গরম কোন দলের আমি নই। আবার নরমই হোক আর গরমই হোক যা কিছু আমার দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর করে দেয় তাই আমি পরম পবিত্র মনে করি।"

তবে ভিক্ষা করে রাজনীতি-স্বাধীনতা লাভ করা যায় না একথা তিনি উপলব্ধি করতেন। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন।

(৯) ব্যক্তি ও সমাজচেতনা : সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন সেই দৃঢ় বিশ্বাসেরই মূর্তরূপ।

বাঙালীর বিলাস প্রবণতার বিরুদ্ধে তাঁর জীবন যেন চ্যালেঞ্জস্বরূপ। জীবনে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা যুগোপযোগী মানসিকতার পূর্বাভাস। যে ব্যক্তি শিল্প গড়ে তুলবেন, তিনি যদি শৃঙ্খলা-পরায়ণ ও নিয়মানুবর্তী হন এবং বিলাসিতার প্রতি যদি তার মোহ না থাকে তবেই তিনি শিল্প গঠনে সফল হ'তে পারবেন।

তাই, তাঁর সমাজচেতনার মূর্ত প্রকাশ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। কথায় ও কাজে এমনিতর সমন্বয় দুর্লভ। তখনকার দিনে একশত বছরের পিছিয়ে পড়া সমাজকে এক বছরে অর্থাৎ অতিক্রত গড়ে তুলতে হ'লে এই সর্বতোমুখী এবং পরস্পর সম্পর্কিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সমানভাবে জোরদার করা প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হয়েছিল। তখনকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই এই অনুভবের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছিল। তাই মাত্র ছ'বছরের মধ্যে সাতজন মনীষী বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। এই সব দায়িত্ব পালনে মনীষীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আর বাংলার অগ্রগতির 'পর সারা ভারত নির্ভরশীল।

এই বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সমন্বিত মূর্তি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর সামগ্রিক সমাজচিন্তা তাঁরই প্রকাশ।

"...যে-দেশের লোক যত আলস্যপরায়ণ, সেই দেশের লোকমধ্যেই 'অদৃষ্ট' অধিক পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গবাসীদের 'কপাল' ও মুসলমানদিগের 'নসিব' উন্নতির কুঠার। 'অদৃষ্ট' কথাটি উদ্ভাবিত না হইলে অলসদিগের বিষম বিপদ উপস্থিত হইত।..."

[কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-এর "জীবন-আদর্শ" গ্রন্থ থেকে]

মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র

সুধাংশু বিশ্বাস

উনিশ শতকের বাংলাদেশ রত্নগর্ভা। এই শতকের প্রথমার্ধে আত্মজিজ্ঞাসা, দ্বিতীয়ার্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা ; প্রথম পর্বে সংঘাত, দ্বিতীয় পর্বে সমন্বয় ; প্রথম স্তরে আঘাত, দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি। রামমোহনের ধর্মান্দোলন, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষান্দোলন, বিদ্যাসাগরের সংগ্রামশীল চেতনা, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের দৃষ্টিগত ঐক্য ও বিরোধ সব মিলিয়ে দেখা যায় এ সময় যুক্তি ও মনীষার পথই প্রধান। আর দ্বিতীয়ার্ধে সৃষ্টিশীল অজস্র প্রতিভার আবির্ভাব —মধুসূদনে যার সূচনা, পরিণতি তার রবীন্দ্রনাথে ও প্রফুল্লচন্দ্রে।

প্রফুল্লচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি বিজ্ঞানী, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ্, বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে রাজনীতিবিদ্, সমালোচক, আদর্শ শিক্ষক, সত্যসন্ধ ও বহু কর্মযজ্ঞের পুরোহিত। কিন্তু এ-সবের উর্ধ্বে আমরা পাই মানুষ প্রফুল্লচন্দ্রকে। সিসেরো বলেছেন, "আমাদের মানুষ বলা হয় কিন্তু যাঁরা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রেখে যথার্থ শিক্ষিত তাঁরাই হলেন মানুষ।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মনুষ্যত্ব বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর জীবনের অসংখ্য ছোট বড় কর্ম সম্পাদনে, শুধু মাত্র জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় নয়।

কলকাতার হেয়ার স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হন। বাড়ী থাকাকালীন পিতার লাইব্রেরীর অসংখ্য পুস্তক পড়ে তিনি নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন। একবার নিজের ভাইদের নিয়ে বাড়ীর জমি চাষ করার সংকল্প করেন। তাঁর বড় দাদা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, মেজ দাদা নলিনীকান্ত ও ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র মিলে লংকা ও বেগুনের চাষ করেন এবং তাঁদের শ্রমে উৎপাদিত লংকা ও বেগুন যথারীতি সংসারের কাজে লেগে যায়। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র এ সবের ধারে গেলেন না। তিনি স্বতন্ত্রভাবে হলদির চাষ করেন। কারণ, তিনি জানতেন হলদির চাষ করা সহজ অথচ ইচ্ছামত হলদিকে গৃহস্থালীর কাজে লাগান যাবে না। তাঁর শ্রমের উৎপন্ন হলুদ সেই সস্তার বাজারে পাঁচ টাকায় বিক্রী হয়। অন্য তিন ভাইয়ের সজাগ দৃষ্টি ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের হলদি বেচা উপার্জিত পাঁচ টাকার উপর। ভাইয়েরা মিষ্টি খাওয়ার আবদার করলে প্রফুল্লচন্দ্র 'হবে, খাওয়াব,' ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যান। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি বাড়ীর প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষককে টাকা পাঁচটি দিয়ে বলেন, "স্যার, এটা আমার উপার্জিত টাকা। আপনি স্কুলের কোন গরীব ছাত্রকে এই টাকা দান করলে আমার শ্রম সার্থক হবে।" কিন্তু শিক্ষক মহাশয় বালক প্রফুল্লচন্দ্রের কথা বিশ্বাস না করে তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে প্রকৃত ঘটনা অবগত হন। এই

ঘটনা হচ্ছে বালক প্রফুল্লচন্দ্রের মনুষ্যত্ব স্ফুরণের প্রথম পদক্ষেপ।

একবার পুজোর ছুটিতে পাবনার এক পল্লী গ্রামে বেড়াতে যান প্রফুল্লচন্দ্র। থাকতেন নৌকোয়। চুল দাড়ি উস্কো-খুস্কো। লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরিহিত আচার্যদেবকে কেউ চেনেই না। তিনি জেলেদের সংগে, চাষীদের সংগে সুখ দুঃখের গল্প করেন খাস বাঙলায়। বিলেত ফেরত কিন্তু কথার মধ্যে একটিও ইংরেজী শব্দ নেই। সেই সময়ে একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রামে এলেন। তিনি আচার্যদেবের আগমনবার্তা শুনে ষ্টীমার থেকে নেমে তীরে উঠলেন। আচার্যদেব সান্ধ্য ভ্রমণে রত। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছুটে এসে আচার্যদেবকে প্রণাম করলে তিনি বল্লেন, 'সে কি!' "আজ্ঞে, আমি আপনার ছাত্র—অমুক সালে আপনার কাছে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছি," বল্লেন ম্যাজিষ্ট্রেট। "তা বাপু বেশ করেছ, কিন্তু তোমার এ কাজটা ভাল হল না।" 'কেন স্যার?' "এই দেখ, আজ দুদিন এখানে আছি। লোকেরা ভেবেছে আমি কোন মৌলবী, কি মৌলানা। তুমি প্রণাম করলে—এরা বুঝল আমি তোমার চেয়েও বড় হাকিম। এরা আমার কাছে এবার কত কি চাইবে—তার কি হবে?" জেলা শাসক বল্লেন, "বলুন স্যার, কি করতে হবে?" আচার্যদেব কালবিলম্ব না করে বল্লেন, "বেশ তো গ্রামে একটা হাসপাতাল করে দাও। ম্যালেরিয়ায় গ্রামটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।" উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনার ছয় মাসের মধ্যে পাবনার সেই গ্রামে হাসপাতাল স্থাপিত হয়। এই হলেন মানুষদরদী মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র।

মহামানব শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের মন্ত্রগুরু। তাঁর নাম ও বাণী ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের জপমালা। তিনি প্রায়ই বলতেন, "প্রফুল্ল যে কাজে হাত দেবে তাতেই সফল হবে।" তাঁর এই উক্তি ব্যর্থ হয়নি। প্রফুল্লচন্দ্র দু'বার হরিনাভি গ্রামে আসেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকে নিয়ে আসেন হরিনাভি দ্বারকানাথ ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে। ফেরবার সময় তাঁকে জল খাবার দেওয়া হয়। একখানা চন্দ্রপুলির একটুখানি ভেঙ্গে নিয়ে মুখে দিয়ে বল্লেন, "এগুলো সব বেঁধে দাও। নিয়ে যাব। সকালে ছেলেগুলো আসে, খুব আমোদ করে খাবে।" এই ছেলেগুলো হচ্ছেন তাঁর ছাত্রদল। এই হলেন ছাত্রদরদী মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি প্রায়ই বলতেন, "সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।"

এই ভীষ্ম পিতামহের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর জীবনী ও বাণী আমাদের চলার পথে পাঁচালী হোক। তাঁর প্রেমরসায়ন আমাদের সঞ্জীবিত করুক।

একশত পঁচিশ বছরের আলোকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দিলীপ নাথ

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে জাতির সংকট মুহূর্তে মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। এই মহাপুরুষের জীবন ও কর্মধারা স্বভাবতঃই সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্নতর। আপন আত্মিক, কর্মশক্তি ও সৃজনী প্রতিভার আলোকে এঁরা গোটা জাতির জীবনকে আলোকিত করেন। পিছিয়ে পড়া সভ্যতার অচলায়তন রথের চাকায় অমিত শক্তি সঞ্চার করে অল্পদিনে তাকে এগিয়ে নিয়ে যান পরবর্তী শতাব্দীর দোর গোড়ায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের জাতীয় জীবনে এরূপই একজন মহাপুরুষ। রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান—বিশ্বজন স্বীকৃত। কিন্তু তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ ও কর্মবীর, মহান দেশপ্রেমিক, ত্যাগী ও সেবাব্রতী, মহত্তম শিক্ষক ও সর্বোপরি একজন খাঁটি মানুষ।

কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজকে তিনি আপন কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। এখানেই যুবক প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর অধ্যাপনা ও বিজ্ঞান সাধনা একত্রে শুরু করলেন। পরাধীন দেশের নাগরিক তিনি। চারিদিকের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁর বিজ্ঞান সাধনা এগিয়ে চলল। দৃঢ় তাঁর মনোবল। লক্ষ্য তাঁর স্থির। হারিয়ে যাওয়া ভারতের বিজ্ঞান সত্তাকে পুনর্জাগরণের কঠোর সংকল্প তাঁর চোখে মুখে। অবশেষে সফল হলেন তিনি। তৈরী কোরলেন 'মারকিউরাস নাইট্রাইট'। বিশ্ব তথা উন্নত পাশ্চাত্য দেশ এই 'নাইট্রাইট' সম্বন্ধে এতদিন অজ্ঞ ছিল। তাঁর এই অভাবনীয় আবিষ্কারে সারা বিশ্বে তিনি খ্যাতিলাভ কোরলেন। পরিচিত হলেন 'Master of Nitritas' এই নামে। এর পর তাঁর গবেষণার ফসল হিসেবে একের পর এক মিশ্র পদার্থ আবিষ্কৃত হল। খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু তিনি অতৃপ্ত। এখনও অনেক কাজ বাকী। রাতদিন অসম্ভব পরিশ্রম করে চলেছেন। সারা ভারত তথা নেপালের গ্রন্থাগারগুলিতে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন তাঁর মনের পরশমণি। সফল হলেন তিনি। প্রকাশিত হল তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ—'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস'। তাঁর এই কালজয়ী সৃষ্টিতে—গর্বিত পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচীন ভারতের উন্নত ও মহান বিজ্ঞান সত্তাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল।

মূলতঃ বিজ্ঞানী হয়েও প্রফুল্লচন্দ্র নিজেকে সবসময় গবেষণাগারের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। দেশ ও জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে

বারবার তিনি এগিয়ে এসেছেন। পরাধীন জাতির নানা সমস্যা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। বিশেষ করে বাঙালীর চাকুরীর প্রতি মোহ, শ্রমবিমুখতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অনীহা—তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। তিনি তাঁর বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় বারবার এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বহু বাঙালী যুবক ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই পথপ্রদর্শক ও অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সামান্য মূলধন সম্বল করে তিনি গড়ে তুললেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'। স্বীয় প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও অধ্যবসায়ের ফলে সামান্য ভেষজ কারখানা বিশাল মহীরুহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। সততা ও দক্ষতার সহিত বাঙালী বড় ব্যবসা গড়ে তুলতে পারে—এর প্রমাণ তিনি রাখলেন।

ভারতের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর গৌরবময় ভূমিকা ছিল। তথাকথিত ঢক্কানিনাদে আপন প্রচারে অত্যন্ত চটকদার রাজনীতিবিদ তিনি ছিলেন না। আত্মপ্রচারে তিনি চিরদিনই বিমুখ। দেশের স্বাধীনতার জন্য নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি কাজ করে গেছেন। মহাত্মা গান্ধীকে তিনিই সর্বপ্রথম কোলকাতার মানুষের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন। প্রথমে ভিন্নমত হলেও পরে তিনিই গান্ধীজীর চরকার আন্দোলনকে বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। আবার তাঁকে দেখি বিজ্ঞানীর বেশে বিপ্লবী। বাঙলার সহিংস আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন এবং বিপ্লবীদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি।

দেশের আর্ত মানুষদের ত্রাণ ও সেবাকার্যে আজীবন লোকহিতব্রতী প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। বন্যার্ত, দুর্ভিক্ষ ও খরাপীড়িত আর্ত মানুষদের কাছে তিনি বারে বারে ছুটে গিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বন্যা ও খুলনার দুর্ভিক্ষে তাঁর অনবদ্য সেবাকার্যের কথা দেশবাসী কখনও ভুলবে না। তাঁর আহ্বানে সুভাষচন্দ্র, ডঃ মেঘনাদ সাহা ও আরও অনেকে উত্তরবঙ্গের সেবাকার্যে এগিয়ে এসেছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে তিনি পায়ে হেঁটে সকলের সাথে প্রতিটি আর্ত ও পীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির ন্যায় বিরল মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান জগতের মানুষ। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং আরও বহু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সুগভীর-ভাবে যুক্ত ছিলেন। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদজনিত কুপ্রথার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সবরকম বিভেদ ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে মুক্ত ও উদার পুরুষ।

অনেকেই বলে থাকেন প্রফুল্লচন্দ্রের উল্লেখ-যোগ্য অবদান হল—ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত স্থাপন। গভীর দূরদৃষ্টিতে তিনি বুঝেছিলেন যে পরাধীন বা স্বাধীনোত্তর ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য দরকার ফলিত ও রসায়ন বিজ্ঞানে নিরন্তর উন্নততর গবেষণা। তাঁর স্নেহের ছত্রছায়ায় একদল তরুণ বিজ্ঞানীর সৃষ্টি হল। এঁদের মধ্যে ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ সত্যেন বসু,

ডঃ জ্ঞান ঘোষ প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রফুল্লচন্দ্রই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতের বিশেষ করে বাংলার angry ও hungry generation-দের সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। বেকার যুবকদের চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে ছোটখাটো ব্যবসায়ে স্বনির্ভরতার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি শ্রমবিমুখতার জন্য বারবার তিরস্কার করেছেন। আবার পরম স্নেহে এদের কাছেও টেনেছেন। 'বাঙালীর অন্ন সমস্যার সমাধান'-এ এদের বিষয়ে অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। এখনকার সমস্যা আরও জটিল এবং ভিন্নতর। কিন্তু তাঁর মূল্যবান আলোচনা ও পরামর্শগুলি এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

কে যেন বলেছিলেন, 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি।' তাই প্রফুল্লচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন খাঁটি মানুষকে আমরা বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হই না। ভারতীয় মনীষার ধারক ও বাহক এই প্রবাদ পুরুষের প্রকৃত মূল্যায়ন আজও আমরা করতে পারিনি। দেশের সরকার এ বিষয়ে সমানভাবেই উদাসীন। আনন্দের কথা—দেশবাসী এবছর তাঁর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করছেন। আচার্যদেবের স্মরণ ও মননের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনাদর্শের উপর বিস্তৃত আলোচনা হওয়া একান্ত দরকার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর অসংখ্য বক্তৃতাবলী ও রচনাসম্ভার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য। বর্তমান প্রজন্ম ও আমাদের উত্তরপুরুষ যদি তাঁর জীবনাদর্শ থেকে কিছুমাত্র প্রেরণা লাভ করে—তবেই আচার্য-দেবের জন্মদিবস পালন সার্থক হবে।

খুলনার বন্যা ও দুর্ভিক্ষত্রাণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা

অমলেন্দু ঘোষ

খুলনার বন্যা ও দুর্ভিক্ষত্রাণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁরই সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত একদল স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা, কেবল মাত্র জেলা খুলনা তথা সারা বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র মানবতার ইতিহাসেই তা সকৃতজ্ঞ চিরস্মরণীয় ঘটনার মর্যাদা লাভ করে মহিমান্বিত হয়ে আছে। কিন্তু তিনি প্রকৃত সেবকের মতোই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মচরিতে আপন ভূমিকার কথা বলেছেন একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত প্যারাগ্রাফে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেনঃ "বন্ধুবর্গের অনুরোধে দুর্গতদের সেবাকার্যের ব্যবস্থা এবং দেশবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম। দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিল—যদিও গভর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে খুলনার এই (বন্যা ও) দুর্ভিক্ষকে স্বীকার করেন নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কুঞ্জলাল ঘোষ প্রভৃতি খুলনার জননায়কগণ আমাকে এই কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করেন; বরিশাল ও ফরিদপুর জেলা হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াও আমার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।"

(আত্মচরিত, ১৮ অধ্যায়)

এখন এই বন্যা (১৯১৭) এবং দুর্ভিক্ষের (১৯২০-২১) পটভূমি ও সূচনা, তার ভয়াবহতা, এবং তার প্রতিকারকল্পে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ত্রাণ-ব্যবস্থা ও স্থায়ী গঠনমূলক কর্মাদির বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে—বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের মানবসেবার আদর্শ কেবল মাত্র ল্যাবেরেটরির চার-দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নাঃ তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার চিরন্তন আদর্শের ব্যাপ্তিতে মর্যাদামণ্ডিত ও মহিমান্বিত হয়ে আছে।

পটভূমি ও সূচনাঃ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা এবং খুলনা সদর মহকুমার নিম্নভূমিতে খরা এবং বন্যার লবণাক্ত জলে ধানের ক্ষেত প্লাবিত হলো। সেটা ইংরেজি ১৯১৭ সনের কথা। ফলে, একাদিক্রমে তিন বছর—১৯১৮—১৯২০—ধানের উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তারই পরিণতি স্বরূপ খুলনা জেলার উক্ত সংশ্লিষ্ট অংশে, বিশেষত সুন্দরবন এবং মহকুমার উক্ত নিম্ন সমতল এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ভয়াবহ আকারে। ১৯২০ সনের শুরু থেকেই এই দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক কাহিনী প্রকাশিত হতে দেখা যায় স্থানীয় এবং কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলিতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে সকলেরই মনে হতে থাকে—এই শোচনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতির মোকাবিলা তথা প্রতিকারকল্পে কিছু একটা অবশ্যই

করা দরকার। এবং তা করতে হবে অবিলম্বেই। অতএব তার ব্যবস্থা ও আয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠলো।

প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ খুলনা-দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ছোট কমিটি গঠিত হলো। এই কমিটিতে ছিলেন ঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বি. এল., নগেন্দ্রনাথ সেন, হেমনাথ ব্যানার্জী, সুলতান মিয়া প্রমুখ খুলনার কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবী ; এবং রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (চেয়ারম্যান, খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি) ; কুঞ্জলাল ঘোষ, খুলনার খ্যাতনামা উকিল ; সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (কমলালয় লিমিটেড), রাসবিহারী দাস এবং আরো কয়েকজন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র— উক্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসেবে, এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন খুলনা/শ্রীপুরবাসী শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ., বি-এল.। কমিটি গঠিত হলো—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনাশ্রম ও বাসস্থান —সায়েন্স কলেজ অর্থাৎ ইউনিভারসিটি কলেজ অফ সায়েন্স-এর ঘরে।

এই কমিটি সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন— তৎকালীন রাজস্বমন্ত্রী বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সঙ্গে, এবং তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় খুলনা জেলার দুর্ভিক্ষ কবলিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপক এলাকার পরিস্থিতি কী মর্মান্তিক ও শোচনীয় এবং তাই ঐ এলাকাকে যেন অবিলম্বে সরকারের তরফ থেকে প্রচলিত সরকারী, 'ফ্যামিন কোড' (Famine code) অনুসারে 'দুর্ভিক্ষ /দুর্গত এলাকা' (famine area) হিসেবে ঘোষণা করা হয় ; কিন্তু কমিটি তাতে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু অন্য কোনো বিকল্প না দেখে 'একটি আবেদন' (an appeal) প্রচারিত হলো উক্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামে, এবং তা পাঠিয়ে দেওয়া হলো—স্থানীয় এবং বাইরের সমস্ত সংবাদপত্রের ঠিকানায়—ব্যাপক প্রচারের জন্যে। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—বোম্বে থেকে প্রকাশিত এবং স্যার মারমেডোর পেকথাল সম্পাদিত 'বোম্বে ক্রনীক্‌ল্' (*Bombay Chronicle* ; ed. by Sir Marmedore Pekthal) পত্রিকার কথা। ঐ আবেদনটি এই পত্রিকায় এবং আরো কয়েকটি পত্রিকায় বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রকাশিত হয়। উক্ত আবেদনটি সেকালে সকলের কাছেই বিশেষতঃ সহানুভূতিশীল ও দানশীল দয়ালু ব্যক্তিদের মনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়, এবং তাঁরা এই দুর্ভিক্ষে ঋষিকল্প আচার্যদেবের ডাকে মুক্ত হস্তে দান করেন। পরলোকগত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ হলেন 'জেনারেল সেক্রেটারী' বা সাধারণ সম্পাদক। রাসবিহারী দাস এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে আরো কয়েকজনের সাহায্যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করলেন, এবং আচার্যদেবের নির্দেশে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দান হিসেবে প্রাপ্ত টাকা-পয়সার উপযুক্ত হিসাবপত্র রাখার ব্যবস্থা করলেন। এই টাকা-পয়সা নিরাপদে রাখবার জন্যে 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' (National Bank of India) একটি 'অ্যাকাউণ্ট' খোলা হলো, এবং তার লেন-দেনগত পরিচালনা করতেন কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসেবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং।

স্থানীয় কমিটি তার অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকদের মারফৎ দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে চাল-ডাল, কাপড়-জামা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি দিয়ে

সাহায্যের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন সঙ্গে সঙ্গেই। তাছাড়া, কলকাতায় কেন্দ্রীয় কমিটি এবং খুলনায় জেলা কমিটিও স্থাপন করা হলো। বিভিন্ন জায়গায় বারোয়ারী রান্নাঘর খোলা হলো। সেকালে প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রত্যেকেই দেখেছেন, দুর্গতদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবীরা কত সুন্দরভাবে একত্রে ৫০০ জনেরও বেশী লোককে একসঙ্গে খাওয়ানোর কাজ করেছেন এবং সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

একথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণীয় যে, আচার্যদেবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ঐ দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজের ফল হয়েছিল আশাতীতভাবেই সন্তোষজনক। এবং বাংলার সমস্ত জেলার জাতি-ধর্ম-বয়স এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছেই ঐ দুর্ভিক্ষত্রাণের কাজ সন্দেহাতীতভাবেই আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছিল। আচার্যদেবের একাজের সুনাম দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশেও পোঁচেছিল। ফলে টাকা-পয়সা, কাপড়-জামা এবং অন্যান্য জিনিষপত্রাদি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে আসতে লাগলো আচার্যদেবের ভাণ্ডারে।

বাংলার এবং বাইরের সমস্ত ইস্কুল-কলেজ, বাংলার সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অফিস এবং বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স ও বাণিজ্য কেন্দ্র (Chambers of Commerce and Business Centres), বার লাইব্রেরি ও অন্যান্য সংস্থাগুলি (Bar Libraries and Other Associations) নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে কমিটি স্থাপন করলো এবং নিজেদের উদ্যোগে অর্থাদি ও জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করে সবকিছুই পাঠিয়ে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঠিকানায়—তাঁর স্থাপিত খুলনা দুর্ভিক্ষ ত্রাণফাণ্ডে (Khulna Famine Relief Fund)। এমনকি একাজে কলকাতার পতিতা মেয়েরাও নিজেদের উদ্যোগে কমিটি গঠন করলো, এবং ফাণ্ডে সংগৃহীত মোট অর্থের তুলনায় তারা বেশ মোটা টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছিল আচার্যদেবের হাতে। জনৈক লিয়াকৎ আলি কলকাতায় ও বাইরে পথে পথে ঘুরে টাকা-পয়সা ও কাপড়-জামা সংগ্রহের দল তৈরি করলেন, এবং সংগৃহীত অর্থ ও জিনিষপত্রাদি জমা করে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাণ্ডারে।

একাজে অজ্ঞাতনামা জনৈক ব্যক্তি এককভাবে ঘুরে ঘুরে কলকাতা ও বহরমপুর থেকে প্রচুর অর্থ ও জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন আচার্যদেবের হাতে। এই সংগ্রাহক/দাতার শর্ত অনুসারেই আচার্যদেব তাঁর নাম প্রকাশ করেননি, কিন্তু তাঁর মহত্তর দানের কথা উল্লেখ করতে আচার্যদেব কখনো ভোলেননি। পূর্বোক্ত রাসবিহারী দাস এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মিলে আচার্যদেবের নির্দেশে বাংলার কয়েকজন বদান্য জমিদারের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানালেন, এবং একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণীয় যে, তাঁরা বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন আচার্যদেবের ত্রাণভাণ্ডারে—যেহেতু আচার্যদেব স্বয়ং এই অর্থভাণ্ডারের এবং জিনিষপত্রাদি প্রকৃত দুর্গতদের মধ্যে বিতরণের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন এবং তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করেছিলেন সন্দেহাতীতভাবেই।

দুর্ভিক্ষত্রাণের কাজে প্রাপ্ত নগদ টাকা-পয়সা এবং জিনিষপত্রাদি সবকিছুই পাঠিয়ে দেওয়া হতো জেলা কমিটির (District Committee) কাছে—

প্রকৃত দুর্গতদের মধ্যে উপযুক্তভাবে বিতরণের জন্যে। স্বেচ্ছাসেবীদের দলে দলে কলকাতা ও খুলনা থেকে পাঠানো হলো দুর্গত এলাকায়—যাতে তাঁরা সেখানে গিয়ে প্রথমেই সরেজমিনে দেখতে পারেন পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে কতখানি ভয়াবহ এবং দুর্গত ত্রাণের কাজে কী পরিমাণ অর্থ ও জিনিষপত্রাদি লাগবে, তার প্রাথমিক হিসেবপত্র প্রত্যক্ষভাবে বুঝে নেবার জন্যে। তাঁদের দেওয়া রিপোর্ট সরাসরি জমা দেওয়া হতো প্রেসিডেন্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে—তাঁর উপযুক্ত বিবেচনা ও দ্রুত প্রতিকারের জন্যে। কাটিপাড়ার সূর্যকান্ত মিত্র এবং রাড়ুলি-কাটিপাড়াবাসী তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে খুলনার রাস্তাঘাট চেনা আরো কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীদের আচার্যদেবের প্রত্যক্ষ নির্দেশে পাঠানো হতো প্রতিটি দুর্গত অঞ্চলে ও এলাকায় সরেজমিনে অভিজ্ঞতালাভের জন্যে। এইরকম কাজের ফলেও ১৯২১ সনে ক্রমে যখন দেখা গেল আচার্যদেবের অর্থভাণ্ডারে টান পড়েছে, তখনি তাঁর পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুসারে বাছাই করা এক প্রতিনিধিদলকে বোম্বে পাঠানো হলো অর্থ সংগ্রহের আশায়। প্রথমেই পাঠানো হলো নগেন্দ্রনাথ সেনকে। নগেন্দ্রবাবু প্রায় একমাস পরে ফিরে এলেন কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে। কিন্তু চাহিদাও প্রয়োজনের তুলনায় সেই অর্থ আদৌ যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু সংকটকালীন এই দানের গুরুত্ব যে অসামান্য সেকথা আচার্যদেব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আচার্যদেব আবার গোপনে কমিটির অজ্ঞাতসারেই আরেক-জনকে পাঠালেন বোম্বেতে—প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যে। এই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তখন মাত্র এম. এস্-সি. ক্লাসের ছাত্র। এরকম গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়ে তিনি দারুণ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু আচার্যদেবের আদেশ তাঁর কাছে একাধারে শিরোধার্য এবং তা পালন করার সুযোগ পাওয়া মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে মনে তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন, এবং তাই অসম্মতি প্রকাশ করেননি। তার এরকম আনুগত্যের কথা আচার্যদেবেরও অজ্ঞাত ছিল না বলে তাকেই প্রফুল্লচন্দ্র নির্দেশ দিয়েছিলেন,—আর কাউকে নয়। অতঃপর ঐ ছাত্রটি আচার্যদেবের নির্দেশ মতো ৩-৪ দিনের মধ্যেই বোম্বে রওনা হয়ে গেলেন। আচার্যদেব স্বয়ং তাঁকে রেল স্টেশন পর্যন্ত পোঁছে দিয়েছিলেন, এমনই ছিল তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান এবং সস্নেহ ভালোবাসার টান। আচার্যদেব তাঁকে সংশ্লিষ্ট কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ ছাড়াও একখানি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন যেখানে ও যাঁর কাছে যেতে হবে তাঁর নামে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা এরকম চিঠিপত্রাদি অনেকেই যত্ন করে রাখেননি বলে পরবর্তীকালে তাঁরাও যেমন আপশোষ করেছেন, আমরাও তেমন সে-সব মূল্যবান বস্তু দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এরকম ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আচার্যদেবের কিছু কিছু রচনা সংশোধনকারী ও সমাজসেবী রতনমণি চট্টোপাধ্যায় মশায়ই বোধহয় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম—যাঁর সংগ্রহে সম্ভবত শতাধিক চিঠিপত্র আছে বলে অনুমান করা যায়—যখন দেখা যায় তিনি তাঁর সম্পাদিত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা'

(১৯৬৭ মে/১৩৭৪ সাল) বইখানিতে অন্তত ৪১ খানি চিঠিপত্র প্রকাশ করেছেন এবং বঙ্গভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

যাই হোক, কেবলমাত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরই সন্দেহাতীত সততা ও তাঁরই দেওয়া পরিচয়পত্রের জোরে ঐ ছাত্রটি বোম্বে থেকে এবার বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঐ ছাত্রটি সেবার বোম্বেতে ছিলেন প্রায় ৩ মাস, এবং নগদ অর্থ পেয়েছিলেন প্রায় ৭২ হাজার টাকা, আর বস্ত্রাদি পেয়েছিলেন ১০৮ বেল। এই ১০৮ বেল বস্ত্রাদি পাওয়ার ব্যাপারে স্যার ইব্রাহিম রহমতুল্লার (মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেণ্ট) কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিঠির প্রভাবেই রহমতুল্লা সাহেব নিজে উদ্যোগী হয়ে বোম্বে ও শহরতলির প্রতিটি মিল থেকে ১ বেল করে মোট ১০৮ বেল কাপড় সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন আচার্যদেবের ত্রাণভাণ্ডারের জন্যে। 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল'-এর সম্পাদক স্যার পেকথাল ও তাঁর স্ত্রী (Sir Pekthal and Mrs. Pekthal) তাঁদের পত্রিকায় এই দুর্ভিক্ষত্রাণে দাতাদের নামধাম ও দানের পরিমাণের কথা আচার্যদেবের স্বীকৃতিসহ বিশদ সংবাদ প্রকাশ করেও যথেষ্ট সাহায্য করেন। ওয়াদিয়া চ্যারিটি ফাণ্ড (Wadia Charity Fund) দান করেন নগদ ৫ হাজার টাকা। শ্রীমতী পেকথাল-এর পরামর্শ মতো প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহের জন্যে "দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের কঙ্কালসার ও প্রায়-নগ্ন চেহারার আলোকচিত্রাদি" দেখানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল—স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে এবং প্রদর্শনী মঞ্চগুলিতে, এবং তারই ফলে এবারের যাত্রায় ঐ ছাত্রটির পক্ষে আগের ব্যক্তির (নগেন্দ্রনাথ সেন) চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি টাকা-পয়সা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। ঐ ছাত্রটি অল্প কিছু দিনের জন্যে বোম্বের এক হোটেলে থাকার পর চলে আসেন শান্তিপুরের জগদীশ মৈত্রের বাড়ীতে (তখন ছিলেন বোম্বেতে)। এই জগদীশবাবুও আচার্যদেবের ঐ ছাত্রটিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কাজে পৃথকভাবে অফিসের জায়গা দিয়ে, টাইপরাইটার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম দিয়ে, এবং অন্যান্যভাবে যথেষ্ট সাহায্য করেন সক্রিয় আন্তরিকতার সঙ্গেই।

ত্রাণকাজের বণ্টন ব্যবস্থা ঃ বাংলার মানুষ বিশেষত খুলনাবাসীরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে—বিনোদ ব্রহ্মচারীর স্থাপিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুটি কেন্দ্রের কাজে। এই কেন্দ্র দুটির একটি স্থাপিত হয়—সাতক্ষীরা মহকুমার আশাশুনি গ্রামে, এবং অপরটি স্থাপিত হয় খুলনা শহরের বিপরীত দিকের একটি গ্রামে—ত্রাণকাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে। এই সেবাশ্রম সংঘের পরিচালিত কেন্দ্র দুটির অধীনে দুর্গত এলাকাগুলিতে আরো কয়েকটি ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়—স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের সক্রিয় আর স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য নিয়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে তাঁর বাছাই করা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী নিয়মিতভাবে যেতেন ঐসব ত্রাণ কেন্দ্রগুলির কাজ-কর্ম দেখাশোনা করতে, বিশেষত—আশাশুনি, পাইকগাছা, বুধহাটা, বেতকাশী, সাহাপাড়া, বড়দল, আমাদি, বাহাদুরপুর প্রভৃতি স্থানে—এবং তাঁরা তাঁদের সরেজমিন অভিজ্ঞতার রিপোর্ট সরাসরি জানাতেন আচার্যদেবকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলেই দেখেছেন বিনোদ ব্রহ্মচারীর সেবাশ্রম সংঘের সাধুরা কী আশ্চর্য দয়ামায়া, সহানুভূতি, আর

সহযোগিতা দিয়ে দুর্গতদের মধ্যে এই ত্রাণকাজ সমাধা করেছিলেন তার তুলনা হয় না, তা কোনদিন ভোলা যায় না। জনৈক রমেশচন্দ্র সাধু, বরিশাল-বাসী, যদিও তিনি আপাতদৃষ্টে সাধু ছিলেন না, কিন্তু যে অতুলনীয় মানবতাপূর্ণ কাজ তিনি করেছিলেন, ত্রাণ কেন্দ্রগুলি স্থাপনে ও সংগঠনে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, দুর্গতদের যেভাবে সেবা করেছিলেন, খুলনাবাসী মাত্রেই সেকথা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করবে। তবে সেই সঙ্গে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সেবাকাজ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এবং এই সমস্ত বিনীত ও মহান সেবাকাজের মূল প্রেরণাই ছিলেন জীবন্ত ঋষিকল্প আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

ত্রাণ-পরবর্তী গঠনমূলক কাজকর্ম : দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি এবং তার উপযুক্ত প্রতিকারমূলক সেবা-কর্মাদির কাজ শেষ হয়ে গেলে আচার্যদেব হাতে নিলেন গঠনমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা। তিনি দুর্গতদের মধ্যে তাঁত ও হাজার হাজার চরকা, সুতো কাটার উপযোগী তুলো ইত্যাদি বিতরণ করলেন—তাঁরই সংগঠিত ত্রাণকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে। এইভাবে প্রতিটি দুর্গত পরিবার মাসিক প্রায় ৩০ টাকার মতো উপার্জনের সুযোগ পেলো। তাদের চরকায় বোনা সুতো তখন পাক্ষিক ও মাসিকভাবে সংগ্রহ করা হতো, এবং হাতে কাটা তাঁতের সাহায্যে তাঁতিদের দিয়ে বোনানো হতো, কাপড়-জামা, গামছা, চাদর এবং আরো অন্যান্য নানা জিনিষ-পত্রাদি—যা বিক্রিও করা হতো যথাসময়ে, এবং সেইসব বিক্রীত অর্থাদি দুর্গতদের সেবায় উপযুক্ত-ভাবেই খরচ করা হতো।

অতঃপর ১৯২৩ সনের শেষের দিকে এই দুর্গতদের সেবার কাজের ভার নিলেন খাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'সংকটত্রাণ সমিতি'। এবং এসব কথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতের ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণের পাতায় লিখে রেখেছেন সমস্ত মনপ্রাণভরা আন্তরিকতা দিয়ে এবং মমতাপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ ভাষায়—যার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও কার্যকরী।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতের বাংলা সংস্করণে (১৯৩৭) ১৮ সংখ্যক অধ্যায়ের ('বাংলায় বন্যা—খুলনা-দুর্ভিক্ষ—উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা') উপসংহারে লিখেছেন : "বাংলা দেশে প্রায়ই যেসব বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহা হইতে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। আমাদের জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ কি এবং জাতীয় জীবনের বিকাশের পথে এই বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে আমরা কিরূপে সংগ্রাম করিতে পারি, তাহা এইসব বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট বন্যার ধ্বংসলীলা ও তজ্জনিত অপরিমেয় ক্ষতি লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতি সম্বন্ধে হাস্যকর বিবরণ প্রকাশ করেন, এবং একটি নিখিলবঙ্গ সাহায্য ভাণ্ডার খোলাও প্রয়োজন মনে করেন না। গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের সরকারী দস্তুর মাফিক সাহায্য-কার্যের বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে সাহায্য-কার্যের জন্য প্রদত্ত অর্থের কতটা অংশ বড় বড় কর্মচারীদের মোটা মাহিনা ও গাড়ি খরচা বাবদ ব্যয় হইত ? খুব সম্ভব আসল কাজ অপেক্ষা পরিদর্শনের কাজেই বেশী টাকা লাগিত।

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজই অধিকতর স্বল্প ব্যয়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়। কেন না সেখানে সরকারী লালফিতার দৌরাত্ম্য নাই।"

এই বন্যা ও দুর্ভিক্ষ বাংলার যুবকদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপনে, হিন্দু-মুসলমান মিলন-সমস্যার সমাধানে এবং ভবিষ্যৎ যুক্ত ভারতের স্বপ্ন ইত্যাদি বিষয়ে যেসব সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল, সেই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মন্তব্য ক্রান্তদর্শী ঋষিবাক্যের মতোই গভীর ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। আচার্যদেব বলেছেন, "বন্যা বাংলার যুবকদিগকে নিয়মানুবর্তিতা ও দৃঢ় সংকল্পের শিক্ষা দিয়াছে। ইহা হাতে-কলমে আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের কাজ শিখাইয়াছে। পূর্বে বন্যার সময়, সাহায্যকার্য তিন সপ্তাহ বা একমাসের বেশি স্থায়ী হইত না, ইহা কতকটা প্রাথমিক সাহায্য স্বরূপ ছিল। বন্যার ভীষণতা একটু কমিলেই সাহায্যকার্য বন্ধ করা হইত, এবং হতভাগ্য অধিবাসীদের নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইত। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা হইত না। কিন্তু বন্যার সম্বন্ধে একটা খুব বড় কথা এই যে— হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যা এই বন্যা সেবাকার্যের মধ্য দিয়া আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা এই মিলন সম্ভবপর মনে করেন না, তাহাদিগকে আমি জানাইতে চাই যে, বন্যাপীড়িতদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই ছিল মুসলমান, এবং যাহারা সাহায্য-কার্য করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯ জনই ছিল হিন্দু এবং আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, কোন হিন্দুই মুসলমান ভ্রাতাদের সাহায্যের জন্য যে সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি করে নাই। রাজনৈতিক প্যাক্ট ও আপোষ সফল হইতে না পারে, কিন্তু এই আন্তরিক সেবা ও সহানুভূতির দৃঢ় ভিত্তির উপর যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে, তাহার ক্ষয় নাই। এই বন্যার মধ্য দিয়া আমরা ভবিষ্যৎ যুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু, বিভিন্ন ভাষা, বিচিত্র রকমের বেশভূষা, বিভিন্ন ধর্ম এবং বিভিন্ন রকমের মতামত থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ যে একটি অখণ্ড দেশ তাহা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার কোন অংশে কোন বিপদ বা বিপত্তি ঘটিলেই সমস্ত অঙ্গই গভীর আন্তরিকতা ও সমবেদনার সঙ্গে তাহাতে সাড়া দেয়।" (আত্মচরিত, ১৮ অধ্যায়)

খুলনার বন্যা ও দুর্ভিক্ষত্রাণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই মহান ভূমিকা—এদেশের প্রাকৃতিক সংকটে ও তার ত্রাণকর্মে (ভবিষ্যতে তেমন ঘটনা ও প্রয়োজন না হওয়াই কাম্য) আমাদের সকলকেই চিরকালের মতো সক্রিয় প্রেরণাদায়ী আদর্শ হিসেবে কাজ করবে বলেই বিশ্বাস করা যায়।

---

* **তথ্যসূত্র ও স্বীকৃতি** : ১। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সংগঠিত খুলনার বন্যা ও দুর্ভিক্ষত্রাণ কাজে অংশ-গ্রহণকারী কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দু'জন স্বেচ্ছাসেবীর কাছ থেকে বর্তমান প্রবন্ধের মূল উপকরণ সংগৃহীত (১৯৬১-৬৫)। এখন দু'জনেই পরলোকগত, তাই নাম জানাতে চাই : একজন খুলনা/বাগেরহাটবাসী সমরেন্দ্র নাগ, ডাকনাম ষষ্ঠীবাবু। তিনি যখন দমদম জংশনের হরেকৃষ্ট

শেঠ লেনে থাকতেন, বর্তমান লেখক তখন পার্শ্ববর্তী পাড়া সাতপুকুর লেন বা সেভেন ট্যাঙ্কস লেনের বাসিন্দা। এই সময়েই ষষ্ঠীবাবুর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ; সেটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশত-বার্ষিকীর বছর (১৯৬১), এবং সেই উপলক্ষে একখানি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের কাজে সম্পাদক (ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য) এবং অন্যান্য লেখকদের কাছে ঘোরাঘুরির মতো কষ্টসাধ্য কাজটি ষষ্ঠীবাবুই করেন তাঁর সেই বৃদ্ধ বয়সেই। তখনি পরিচয় সূত্রেই তাঁর কাছ থেকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষত্রাণে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে রাখি, এবং বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশ উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় জন—কুঞ্জলাল ঘোষ (১৮৯৪-১৯৬৬), খুলনার বিশিষ্ট আইনজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি যখন দেশত্যাগ করে সোদপুর/HB-Town-এর বাসিন্দা, বর্তমান লেখক তখন দমদম/সাতপুকুর লেন ছেড়ে মধ্যমগ্রামে দু'বছর (১৯৬২-৬৪) থেকে ২৬ জুলাই, ১৯৬৪ তারিখে আসেন উক্ত এইচ-বি টাউন-এরই বাসিন্দা হয়ে। কুঞ্জলালবাবু ছিলেন খুলনার রাড়ুলি-কাটি-পাড়ার কাটিপাড়াবাসী, এবং কাটিপাড়াবাসী কানাইলাল ঘোষের ২য় ও কনিষ্ঠা কন্যা—বর্তমান লেখকের দিদিমা শতদলবাসিনী বসুর (স্বামী মণীন্দ্রকুমার বসু, সনাতনকাটি / খুলনা) জ্ঞাতি কাকা। সেইসূত্রে কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে লেখকের যাতায়াত ছিল দিদিমার সঙ্গে। তাছাড়া, লেখকের পিতা সুধীরকুমার ঘোষ (১৯০৮-৬৭) তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কো-অপারেটিভ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। কুঞ্জলালবাবু তখন আমাদের HB-Town-এর ভাড়াবাড়িতে আসতেন এইচ-বি টাউনের ক্রেতা-সমবায় বিপণির উন্নতিকল্পে পরামর্শের জন্য। তাছাড়া, আমার ঠাকুর্দার (৺হরিপদ ঘোষ) সঙ্গে বিশেষ পরিচয় থাকায়, তাঁর ছেলে বলেও আমার পিতার সঙ্গে, এবং জ্ঞাতি ভাইঝি বলে আমার দিদিমার সঙ্গেও কুঞ্জলালবাবু দেখা করতে আসতেন—সকালে বা বিকেলের দিকে বেড়ানোর সময়ে। এই সময়ে দিদিমার মাধ্যমে প্রস্তাব করে তাঁর কাছ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষত্রাণে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করি এবং এতদিনে তা কাজে লাগানো গেল বলে কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর উদ্দেশ্যে।

২। কাটিপাড়াবাসী ৺সূর্যকান্ত মিত্রের পরিবার-ভুক্ত লোকজনও আরো কিছু তথ্যাদি দিয়ে এবিষয়ে সাহায্য করতে পারেন বলে শুনেছি উক্ত ষষ্ঠীবাবু ও কুঞ্জলালবাবু দু'জনের কাছেই। যোগাযোগের অভাবে একাজটি এখনো করা হয়নি, শীঘ্রই তা করার জন্যে সচেষ্ট আছি।

৩। এছাড়া, দ্রঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'আত্মচরিত'—ইংরেজি (২য় খণ্ড, ১৯৩২-৩৫) ও বাংলা (১ম খণ্ড, ১৯৩৭) সংস্করণ। অ.

বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলার পশ্চাতে

সংকলক

স্কুলে পড়বার সময় সাহিত্য বিশেষ করে ইতিহাস পাঠের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল প্রবল কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর কলকাতার মেট্রোপলিটন কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজ) এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হ'ন। তখন প্রত্যেক ছাত্রকেই কলা ও বিজ্ঞান বিষয় একই সাথে পড়তে হ'ত। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া আর কোথায়ও রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী ছিল না। ফলে তাঁদের প্রেসিডেন্সীতে যেতে হ'ত ল্যাবরেটরীর ক্লাশের জন্য। তখন পেডলার সাহেব ছিলেন এই ল্যাবরেটরীর দায়িত্বে। তাঁর রসায়ন বিষয় বোঝানোর ক্ষমতা বিশেষ করে তাঁর নিখুঁত পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া ১৮৭৬ খ্রীঃ ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতায় Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নিয়মিতভাবে Chemistry, Physics এবং Botany বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হ'ত। ডিগ্রীলাভে ইচ্ছুক বিজ্ঞানের ছাত্ররা শ্রোতা হিসাবে এখানে উপস্থিত থাকতেন। এই প্রতিষ্ঠান সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেনি। প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় এখানে নিয়মিত যেতেন। রসায়ন পাঠে আগ্রহ গভীরতর হয় এখানকার বক্তৃতা শুনে।

পরে 'গীলক্রাইষ্ট' বৃত্তি লাভ করে তিনি বিলাতে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হ'ন। ১৮৮৫ সালে বি. এস-সি. পাশের পর ১৮৮৮ খ্রীঃ ডি. এস-সি. উপাধিলাভ করেন। এরপরই তিনি এডিনবরা কেমিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। এ এক দুর্লভ সম্মান—ভারতবাসীর পক্ষে। এই কয় বছরে আদর্শ শিক্ষক অধ্যাপক ক্রামব্রাউন এবং প্রতিভাবান সতীর্থদের সান্নিধ্যলাভ করে গবেষণায় এবং ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে একান্তভাবে উৎসাহিত হ'ন।

তখন ইউরোপে আধুনিক শিল্পের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে এবং দেশে দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামান্য পুঁজি নিয়ে যাত্রা শুরু করে অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সব বাধা অতিক্রম করে তাঁরা বিরাট বিরাট কারখানা গড়ে তুলেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'আত্মচরিতে' এমনিতর বহু ব্যক্তির কর্মজীবনে দৃষ্টান্ত বারে বারে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি উপলব্ধি করেন রসায়ন শিল্প গড়ে তোলার গুরুত্ব। তিনি 'আত্মচরিতে' বলেছেন—রসায়ন শাস্ত্র অর্থকরী বিদ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলকেই মানিতে হইবে। কেননা সকল প্রকার ব্যবসায়ের মূলে রাসায়নিক তত্ত্ব নিহিত আছে।

জার্মান দেশ ভ্রমণ করে তিনি মন্তব্য করেন—"আমি সম্প্রতি জার্মান দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে সেই পুণ্যভূমির অপরূপ কথা সবসময় কীর্তন করিতে কার না অভিলাষ হয় ?"

ইউরোপের যন্ত্রশিল্প এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছেন এক একজন ব্যক্তি কি বিপুল বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে কাজ করেছেন এবং শেষে আপনার অক্লান্ত সাধনার ফল জগৎকে দান করে শিল্পজগতে যুগান্তর এনেছেন। এই ইতিহাস তাঁর একক উদ্যোগে শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁকে একান্তভাবে অনুপ্রাণিত করে।

তাঁর এই ইউরোপ ভ্রমণ, রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরীতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে দীর্ঘদিন গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং শিল্প বিকাশে রসায়নের গুরুত্ব তাঁর মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। তাই তিনি 'আত্মচরিতে' বলেছেন—প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করিয়া এইসব চিন্তা আমার মনকে বিচলিত করিয়াছিল।

কিন্তু শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন ? সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"বাংলার সর্বত্র প্রকৃতির যে অজস্র দান ছড়াইয়া আছে তাহাকে শিল্পের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যায়।"

শুরু করলেন পরীক্ষা। লেবুর রস বিশ্লেষণ করে তা থেকে সাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করলেন কিন্তু কলকাতার বাজারে লেবু প্রচুর পরিমাণে ও সস্তায় পাওয়া যায় না। ফলে এই এসিড বিক্রী করে লাভ করা সম্ভব হ'ল না। পরিত্যক্ত হ'ল এ চেষ্টা।

তারপর ? আবার অনুসন্ধান। উদ্দেশ্য—তাঁর সময়ের ফাঁকে অল্প মূলধনের ভিত্তিতে কিছু করা যায় কিনা। চেষ্টা চলল কয়েকবার। সুবিধা হ'ল না। তা হ'লে কি রণে ভঙ্গ ? নিশ্চয়ই নয়। শিল্প গড়ে তোলা তো জাতির তাগিদ—স্বদেশী হাওয়া ধীরে ধীরে বইতে শুরু করেছে। এই তো স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ। যাঁরা জাতির অগ্রদূত তাঁরাই তো জাতির চেতনার মূর্ত প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাই, চলল সন্ধান—শেষে ভেষজ বা ঔষধ সংক্রান্ত দ্রব্য প্রস্তুত করাই উপযোগী মনে করলেন। এবার কলকাতায় ওষুধের দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে খবর নিলেন—জানলেন বিদেশী ওষুধ আমদানীকারকদের কাছ থেকে বিলাতী ওষুধ আমদানীর পরিমাণ। কিন্তু দেশী ওষুধের বাজার নেই বললেই চলে—ক্রেতারা তো বিলাতী ওষুধের পর ভরসা করেন। নেই কোন অভিজ্ঞতা—নেই কোন পথ-প্রদর্শক। তিনি লক্ষ্য করলেন, বাংলার রাসায়নিক শিল্পের বিশেষ বিকাশ হয়নি। তাই সালফেট অব আয়রন (হীরাকস) নিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রচুর কুচা লোহা বিনা পয়সায় পাওয়া যেত। তাই সংগ্রহ করে কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি প্রয়োজনীয় সালফিউরিক এসিড কলকাতার একচেটিয়া উৎপাদনকারী ডি. ওয়ালডির নিকট থেকে কিনতেন। তখন সালফিউরিক এসিড অতীব প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ। কোন দেশের শিল্পোন্নতির অন্যতম মাপকাঠি হ'ল—সেই দেশে উৎপাদিত সালফিউরিক এসিডের পরিমাণ। তাই প্রফুল্লচন্দ্র মনস্থ করলেন, সালফিউরিক তৈরীর কাজে হাত দেবেন।

কলকাতার ৪/৫টি কারখানায় দৈনিক মোট দশ হন্দরের বেশী এসিড তৈরী হ'ত না। বিদেশ থেকে এসিড আমদানী করা খুব ব্যয়সাধ্য ছিল। ফলে এদেশেই এসিডের কারখানাগুলি বিশেষ কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'ত না। বাজারের সুযোগ আছে দেখে এই এসিডের কারখানা গড়ার ইচ্ছা আরও জোরদার হ'ল। মিলল অভাবনীয় সুযোগ—আচার্য রায়ের স্বগ্রামবাসী মোক্তার যাদবচন্দ্র মিত্রের ঐ রকম একটা কারখানা ছিল। তিনি এটি প্রফুল্লচন্দ্রকে ১০০০ টাকায় বিক্রী করে দিলেন। এত টাকা তাঁর কাছে ছিল না। তাই বাকী টাকার জন্য হ্যাণ্ড নোটে সই করলেন। এই কারখানাটি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রায় ১০ কি. মি. দূরে। কিন্তু এই কারখানা চালু করার জন্য আরও মূলধন দরকার। আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। তা এখনই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্র এই কারখানাটি ৩০০ টাকায় বিক্রী করে দেন।

এবার তাঁর লক্ষ্য হ'ল ক্যালসিয়াম সুপার ফসফেট উৎপাদন। সেজন্য নিকটবর্তী কসাইখানা থেকে কিছু হাড়-গোড় এনে ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে তাঁর বাড়ীর ছাদে শুকোতে দেন। প্রতিবেশীরা আপত্তি জানান। তখন তাঁর এক বন্ধু মানিকতলায় তাঁদের ভাড়া করা একখণ্ড জমি এই পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করার জন্য তাঁকে দেন। ইটের পাঁজার মত স্তূপীকৃত হাড় মাঝ রাতে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো শুরু হ'ল। পুলিশ সন্দেহ করে ছুটে এল—জিজ্ঞাসা করল 'ইয়া ক্যা লাশ জ্বলতা হায় ?' তাদের দেখানো হ'ল শুধু হাড়ই পোড়ানো হচ্ছে। পুলিশ চলে গেল। হাড়ের ভস্ম সালফিউরিক এসিডযোগে সুপার ফসফেট অব লাইমে পরিণত হ'ল। তারপর সোডার প্রতিক্রিয়ায় ফসফেট অব সোডা হ'ল। কিন্তু বেশী দিন এ উৎপাদন করা সম্ভব হ'ল না।

এরপর বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার কিছু ওষুধ তৈরীর কাজে মন দিলেন। এগুলি সহজেই তৈরী করা যায়। ঘুরে ঘুরে পুরানো শিশি বোতল সংগ্রহ করলেন। ওষুধের কারখানা খুলবেন—বহু চিন্তার পর 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নাম দেওয়াই স্থির করলেন। ১৮৯২ সালে আরও দু'জনকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রস্তুত ওষুধগুলি ইউরোপীয় কায়দায় বোতলে পুরে লেবেল এঁটে প্যাক করা হোত।

একদিন প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ কার্তিক বসু বটকৃষ্ণ পালের দোকানে চেয়ারে বসে রোগী দেখছেন। লক্ষ্য করলেন—সাদা গলাবন্ধ কোট পরনে, হাতে একটি ছোট ব্যাগ একজন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে যাচ্ছেন। কাউণ্টারে তিনি যেন ব্যাগ থেকে কি বের করে দেখালেন। মনে হ'ল দোকান থেকে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না বলেই যেন কিছুটা বিষণ্ণ মনে চলে যাচ্ছেন তিনি।

পরক্ষণে ডাঃ বসু জানতে পারলেন ইনি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে এনে এখানে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। ডাঃ রায় বললেন, অবসর সময়ে নিজের ঘরে তিনি যে ওষুধ তৈরী করেন তাই বিক্রী করতে এসেছিলেন। এঁরা রাখতে চান না। দু'টী ওষুধ—সিরাপ বাসক—কাশির ওষুধ আর অজীর্ণের ওষুধ একোয়াটাইকোটিস। ডাঃ বসু

ওষুধ দু'টী দেখলেন। ডাঃ বসু ওষুধ কোম্পানীর মালিক ভূতনাথ পালকে ওষুধ দু'টী রাখতে বললেন। ডাঃ বসু প্রেসক্রিপশন করবেন—এই ওষুধের। দু'দিনেই শেষ হয়ে যাবে। সত্যিই তাই। আবার প্রফুল্লচন্দ্র এক ডজন ওষুধ পাঠালেন। তাও দিতে না দিতে ফরসা। একা ডাঃ বসু যা প্রেসক্রিপশন করছেন তার চাহিদা বেঙ্গল কেমিক্যালের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হ'ত না।

এই সময়ে একদিন তাঁর সতীর্থ ডাঃ অমূল্যচরণ বসু তাঁর নতুন প্রচেষ্টার কথা শুনে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁর মনে খুব স্বদেশানুরাগ ছিল। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি তখন বেশ সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি খুব উৎসাহী লোক ছিলেন। সাগ্রহে তিনি ডঃ রায়ের সঙ্গে যোগ দিলেন। দেশে কেমিক্যালস তৈরী করার কারখানা করতে হবে। দেশীয় গাছ-গাছড়া দিয়ে এতকাল যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলল, এখন তাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। দেশীয় উপাদানে নতুন নতুন ওষুধ তৈরী করতে হবে। কথাগুলি ভাল লাগল ডাঃ বসুর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ীতে দু'খানা ঘর। একটি ঘরে তিনি থাকেন। আর একটি ঘরে হাঁড়ি-কড়া, শিশি-বোতল, বকযন্ত্র, লেবেল, আঠা প্রভৃতি। এইতো তখনকার বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল-এর কারখানা। এখানে বকযন্ত্রে যোয়ানের আরক তৈরী হয়। ওখানে উনুনে বাসকের সিরাপ সিদ্ধ হয়; শিশিতে ভর্তি করে ছিপি এঁটে বাজারে পাঠানো হয়। কিন্তু এই আয়োজনে কাজ হবে না। কারখানা-বাড়ী বড় হওয়া চাই।

সারাদিনের চেষ্টায় মাল তৈরী হয়েছে বটে কিন্তু বোতলে ভরা, লেবেল লাগানো এবং প্যাক করা বাকি। বিকেলে ডঃ রায় কলেজ থেকে ফিরেছেন। দুই বন্ধুতে লেগে গেলেন ওষুধ ভর্তি করে লেবেল লাগাতে। আকাশে অঝোরধারে বৃষ্টি নেমেছে। বাড়ির ছাদ ফাটা। ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে মেঝেতে। উঁচু টেবিলের উপর বোতল-শিশি রেখে সেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করলেন তাঁরা। এইভাবে দুঃখ-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তাঁরা ভারতের ভেষজ শিল্পের গোড়াপত্তন করে চলেছিলেন। কত কষ্ট করে তখন কাজ চালাতে হ'ত তার একটি দৃষ্টান্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করেছেন—'ডাক্তার অমূল্যচরণ একশত পাউণ্ড সিরাপের অর্ডার সংগ্রহ করিয়াছেন। এত বড় অর্ডার আর কখন পাই নাই। সমস্যা হইল—এই পরিমাণ সিরাপ প্রস্তুতের জন্য যে দুই মণ চিনি লাগিবে তাহা লইয়া। তৎকালে আমরা দু'জন যাহা কিছু অর্থসংগ্রহ করিতাম তাহা মাসের প্রথমে নানাবিধ কাঁচামাল ক্রয় করিবার সম্ভাব্য ব্যয়-স্বরূপ সরাইয়া রাখিতাম। আর আমার সংসার নির্বাহ হইত প্রতিদিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে। সকালে এক বোতল যোয়ানের আরক বিক্রী হইলে হাঁড়ি চড়িবে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। যাহা হউক একত্রে দুই মণ চিনি কখন ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবি নাই। আমার ভাই তখন অবৈতনিক বাজার সরকার। একটি বিলের পাওনা আদায় করিবার জন্য সে ইতিপূর্বে বারংবার ডাঃ আর. জি. করের ঔষধালয়ে হানা দিয়াছিল। দোকান আমাদের কারখানা হইতে দু'মাইল উত্তরে। আমার ভ্রাতাকে পদব্রজে সেই দোকানে যাইয়া তথা হইতে বড় বাজারে চিনির আড়তে (অন্ততঃ

তিন মাইল দূরে) গিয়া চিনি সংগ্রহ করিয়া কারখানায় ফিরিতে হইবে, যাহাতে কলেজ হইতে ফিরিয়া আমি সিরাপ প্রস্তুত অবস্থায় পাইতে পারি। তখন গ্রীষ্মকাল ; এত পথ পদব্রজে ভ্রমণ করা সম্ভব নয় বিবেচনা করিয়া আমি ভাইকে পরামর্শ দিলাম খানিকটা পথ ট্রামে যাইতে। কিন্তু তাহাতে আবার আরেক বিপত্তি। ট্রামের ভাড়া পাঁচ পয়সা। অনেক চেষ্টা করিয়া চার পয়সা যোগাড় হইল ; আর এক পয়সার কি হইবে ? শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যবস্থা হয়। (১৮৯৩—৯৪)

লোকের অভাব ছিল কিন্তু অভাব ছিল না উৎসাহের। আচার্য রায়ের চোখে স্বপ্ন—তাঁর ছাত্রেরা শুধু টেস্টটিউব নেড়েই কেমিষ্ট্রির পাঠ শেষ করবে না। লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলবে বড় কারখানা। পরাধীন ভারত শিল্প-সম্পদে উন্নত হবে।

আচার্য রায় বলেছেন—'ডাঃ বসুর সহযোগিতা খুবই মূল্যবান হইল। তিনি যে কেবল ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে আথিক সাহায্য করিলেন তাহা নয়, কারখানার প্রস্তুত ওষুধগুলি যাহাতে ডাক্তারদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারে তাহার জন্যও চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষুধ বাজারে বেশ চলিতে আরম্ভ করিল। তবুও দোকানদারেরা গ্রাহকদের এই বলিয়া নিন্দা করিতে ত্রুটি করিতেন না যে, তাঁহাদের দেশী জিনিষের উপর আস্থা নাই। ইতিমধ্যে ডাঃ অমূল্যচরণ বসু জোর প্রচার কার্য করিতে লাগিলেন। ফলে শহরের নামকরা চিকিৎসকেরা স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তুত এটকিন্স সিরাপ, সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অব লাইম্, টনিক গ্লিসেরোফসফেট, প্যারিস কেমিক্যাল ফুড প্রভৃতিও ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অমূল্যচরণ আমাদের ব্যবসায়ে নতুন পথ প্রদর্শন করিলেন। কয়েকজন কবিরাজের সাথে পরামর্শ করিয়া আয়ুর্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী সংগ্রহ করিলেন। কালমেঘের সার, কুর্চির সার, প্রভৃতি ভেষজের প্রস্তুত প্রণালী তিনি আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। এখন কেবল আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহাদের ভেষজ শক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে এবং ডাক্তারদের দ্বারা উহা ব্যবহার করাইতে হইবে। অমূল্যচরণ নিজে ঐ সব দেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিয়া পথ প্রদর্শন করিলেন। আমাদের নবপ্রবর্তিত দেশীয় ভেষজ এইভাবে নিজের গুণে সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল।'

ভেষজ শিল্পে প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঔষধ উৎপাদনে নবদিগন্ত উন্মোচিত হ'ল। প্রাচীন গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সারা পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। বৃটিশ ফার্মাকোপিয়া এই ঔষধ নির্মাণ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হ'ল। এক্ষেত্রে নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হ'ল।

এখানে লক্ষণীয় যে বাংলায় তখন রাজা-মহারাজা-জমিদারের অভাব ছিল না। কিন্তু এই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে আদৌ উৎসাহ প্রকাশ করেননি।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত। ডাঃ বসু প্লেগে মারা গেলেন। এর কিছু দিন আগে অক্লান্ত কর্মী

রসায়নে এম. এ. সতীশচন্দ্র সিংহও অকালে পরলোক গমন করেছেন। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষে এই আঘাত সহ্য করা কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এখন তো তাঁর একার পক্ষে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কারখানা পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব নয়। তখন বাধ্য হয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালকে জনসাধারণের দায়বদ্ধ সংস্থায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তখন মূলধন প্রায় হাজার তিনেক টাকা।

তাই ১৯০১ সাল ১২ই এপ্রিল প্রায় দশ বছর পরে—ডঃ রায়, চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী, ভূতনাথ পাল, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, অমূল্যচরণ বসু ও সতীশচন্দ্র সিংহের বিধবা পত্নীদের অংশীদার করে স্থাপন করলেন একটি অংশীদার দায়বদ্ধ সংস্থা ; যার নাম দেওয়া হ'ল বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। পুরানো কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত মালপত্র ও সম্পত্তি কিনে নেওয়া হ'ল। এক বছরের মধ্যে মূলধনের পরিমাণ হ'ল, ২৩,৫০০ টাকা। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুকে সংস্থার ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হ'ল। ৯১, আপার সার্কুলার রোডের কারখানায় জায়গার অকুলান হয়। তখন মানিকতলায় প্রায় দশ বিঘা জমিতে সালফিউরিক এসিড তৈরী করবার কাজ শুরু হয়। ১৯০৫ সালে জমির দখল নেওয়া হয়। ১৯০৭ সালে উৎপাদন শুরু হয়।

এইভাবে দীর্ঘ প্রায় এগার বছর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পরবর্তী কালে প্রথম স্বদেশী ভেষজ শিল্প হিসাবে সারা ভারতে তথা সারা এশিয়ায় খ্যাতিলাভ করে। জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে—যখন বাংলার জাতীয় জাগরণকে পর্যুদস্ত করার জন্য বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র কার্যকরী করতে তৎপর—তখন স্বাদেশিকতার জোয়ার বাংলার মনোজগতে প্লাবনের সৃষ্টি করে—এই পটভূমিকায় আচার্য রায়ের শিল্প গড়ার দৃঢ়সংকল্প, অক্লান্ত চেষ্টা, ডাক্তারদের স্বদেশপ্রীতি সম্মিলিতভাবে স্বদেশী শিল্প গড়ার দিগন্ত উন্মোচন করে। স্বদেশী শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে আচার্য রায় দিলেন সফল নেতৃত্ব—বাঙ্গালী তথা ভারতের জাতীয় চেতনায় শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ সঞ্চারিত হ'ল।

কোনও ক্ষোভ নেই

দেবপ্রসাদ ঘোষ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সম্বন্ধে যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে এটা আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না যে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্যায়ন এবং আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়ে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতেই। প্রকৃতপক্ষে আমরা লক্ষ্য করছি এখনই এর বীজ রোপণ করা হয়ে গেছে এবং হয়ত অঙ্কুরিতও হয়েছে। এটা সঠিকভাবে পরিচালিত ও ফলপ্রসূ হ'লে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্র, যুবক ও গবেষকদের প্রেরণা যোগাবে।

তাঁর জীবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হচ্ছে বা হওয়ার মুখে সেগুলি মোটামুটি এই ঃ (১) ছাত্রজীবন (২) প্রাচীন ভারতের রসায়নের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণাপ্রসূত রচনা (৩) নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণা (৪) আদর্শ শিক্ষকরূপে ভারতে ব্যাপকভাবে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিস্থাপন (৫) ভারতে প্রথম রাসায়নিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা (৬) শিক্ষা প্রচার (৭) বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্তত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়া (৮) বাঙ্গালীকে শুধু চাকুরীর মোহ থেকে মুক্ত করে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করা (৯) সমস্ত সামাজিক কূপমণ্ডুকতার (জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা ইত্যাদি) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা (১০) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করা ইত্যাদি।

আমি কিন্তু এখানে তাঁর জীবনের অন্য কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে রাজকীয় গ্রন্থাগার থেকে কিছু পুঁথি আবিষ্কার করেন, যার থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কিছু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে কিছু 'চর্য্যাপদ'। এখন এই 'চর্য্যা' শব্দটি আধুনিক বাংলা ভাষার 'চর্চ্চা' শব্দটির প্রায় সমার্থক কিন্তু 'চর্য্যা'র একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে যেটা চর্চ্চায় নেই। একটি উদাহরণ দিলে পার্থক্যটি পরিস্ফুট হবে। এক পরীক্ষায় 'সত্যবাদিতা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করতে বলা হোল। যার রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হোল সে পুরষ্কৃতও হোল। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে সে তার জীবনে সর্বদা, সর্ব অবস্থাতেই, সত্যভাষণে অটুট থাকবে। বরং এটা খুবই সম্ভব যে অন্য একজন পরীক্ষার্থী যে এই প্রবন্ধ রচনায় উৎকর্ষতা দেখাতে পারেনি সে শত প্রলোভনেও সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হবে না। এখন এই দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী সম্পর্কে বলা যায় যে সে সত্যের চর্য্যা করে এবং প্রথমজন করে চর্চ্চা। আধুনিক যুগেও

গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী সঙ্ঘে প্রচলিত আছে নৃত্য ও কৃত্য, কৃত্য অর্থাৎ করণীয় বা পালনীয়—'ষোল পণ' 'সতের মানা'। কিন্তু সেখানেও 'কৃত্য ছাড়া নৃত্য নয়' কিন্তু 'নৃত্য ছাড়া কৃত্য হয়' অর্থাৎ সৎকর্মগুলি শুধু আলোচনা, গবেষণা ইত্যাদি পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্য্যালোচনা করলে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে তাঁর জীবনদর্শন কখনই শুধুমাত্র চর্চ্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিষ্ঠিত ছিল চর্য্যার উপর। তাঁর বিশাল হৃদয় যখনই কোনও নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষের দুঃখে বিগলিত হোত তখন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কর্ম বিশেষ-ভাবে অনুধাবন করলে এই সত্যই প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে যে এই বেদনাবোধ ও সহানুভূতি তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হচ্ছে। যেদিন বিজ্ঞান কলেজে সকলে অবাক হ'য়ে দেখলো যে তাঁর নিজের পরণে যে কোট তাঁর বেয়ারার পরণেও হুবহু তারই জুড়ি এবং এই ব্যাপারে সবার অনুসন্ধিৎসাকে 'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে এড়িয়ে গেলেন তখন আমাদের কোনও সন্দেহই থাকে না যে শুধু মাত্র চর্চ্চা নয়—চর্য্যাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম এবং প্রধান উপাদান। তাঁর জীবনে এই চর্য্যার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে এবং আশা করবো যাঁরা তাঁর জীবন, কর্মকাণ্ড ও জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করবেন তাঁরা এদিকটা উপেক্ষা করবেন না।

আমরা তাঁর স্বগ্রামবাসী এবং বয়সেও পরিণত বলে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার এবং সান্নিধ্যের সুযোগ আমাদের অনেক এসেছে। স্বভাবতঃ সেই স্মৃতি বিশেষ মধুর। ইংরাজীতে যাকে বলে Nostalgia বাংলায় তাকে বলা চলতে পারে 'স্মৃতিবিলাস'—এই বয়সে এখন এটাই পেয়ে বসেছে আমাকে।

আচার্যদেব প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে কলকাতা থেকে বজরায় করে দেশে আসতেন—সঙ্গে তাঁর সেবক অরবিন্দ সরদার এবং আরও দু'একজন থাকতেন। একবার মেঘনাদ সাহাও এসেছিলেন —মনে পড়ছে। গ্রামে এসে তিনি বাড়ী না থেকে সাধারণতঃ স্কুলেই থাকতেন। স্কুলে ঢুকেই বারান্দা দিয়ে ডান দিকে অর্থাৎ কপোতাক্ষের দিকে একতলার সামনের ঘরটাই ছিল তাঁর ঘর। আসার সময় তিনি প্রচুর পরিমাণ বেঙ্গল কেমিক্যালের সিরাপ নিয়ে আসতেন আর বাঁকার ঘোষদের কাছ থেকে আসতো দই। এই দুটো দিয়ে তৈরী হোত সরবৎ—বিশাল বিশাল মাটির জালায় সেগুলো রাখা হোত এবং দীয়তাং ভুজ্যতাং চলতো অবশ্য এক্ষেত্রে ভুজ্যতাং নয় পীয়তাং। আমাদের কিন্তু উৎসাহ ছিল অন্য ব্যাপারে—এখানে আমরা বলতে বালখিল্য দল—স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীদ্বয়ের ছাত্রবর্গ। আমরা ঢুকতাম তাঁর ঘরে কোন ভয় বা সঙ্কোচ না করে। এখানে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে গ্রামের প্রভাবশালী লোকরা—যাঁদের আমরা বিশেষ ভয় করতাম—তাঁরা কিন্তু আচার্যদেবকে বেশ ভয়ই করতেন। তাঁর ঘরে ঢোকার মুখেই দরজার দুপাশে থাকতো দুটি বড় বড় বস্তা যা ভর্তি থাকতো মুড়ির মোয়ায়। প্রথম অবস্থায় এগুলি এত উঁচু হোত আমরা দৃষ্টিপথে এর নাগাল পেতাম না—হাত উঁচু করে

এগুলো আহরণ করতে হোত। একবার মনে আছে ১৯২৭/২৮ খ্রীস্টাব্দ। আমি আর সহপাঠী রাডুলীর সতু* ঢুকলাম ওঁর ঘরে। এই সতু ছেলেবেলায় খুবই দুষ্টু ছিল—তার মাথায় নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি ভর করতো—তবে মনটা ছিল খুবই ভাল। আমরা ঢুকতেই আচার্যদেব বললেন—'খা খা মোয়া খা'। আমরাও মোয়া নিলাম কিন্তু যখন খেতে যাব সতু হঠাৎ বললো, 'এই দাঁড়া খাসনে'; এই বলে আচার্যদেবকে তাক করে মোয়া ছুঁড়লো আর আমাকে বলল 'তুইও ছোঁড়'। আমি তো হতবাক; দারুণ ভয় করছে। কিন্তু অবাক হ'য়ে দেখলাম তিনিও খুব মজা পেয়েছেন এবং আমাদের দিকে তাক করে সেই মোয়া ছুঁড়লেন। সতু তখন কানে কানে আমাকে বললো "এই দ্যাখ, মোয়াগুলোতে বেশ আঠা আঠা আছে—বুড়োর দাড়িতে আটকাতে হবে—পারবি।" অবশ্য আমাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি কিন্তু আচার্যদেবও এই খেলায় খুব মজা পাচ্ছিলেন—তখনকার মত শিশুতে পরিণত হ'য়েছিলেন। এ ঘটনাটা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে বর্তমানকালে অনেক হৈচৈ করে শিশু দিবস পালিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের নিয়ে নেতাদের সাথে হলে/বাগানে পরিচিত করান হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা চর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু আচার্যদেবের শিশুপ্রীতি ছিল চর্যা।

এবার আচার্যদেবের আর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছি—যেটা যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সবাই লক্ষ্য করেছেন কিন্তু এটা নিয়ে কমই আলোচনা হ'য়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর রহস্যপ্রিয়তা ও সরসতা। কয়েকটা ঘটনার কথা লিখছি। আমাদের গ্রামে একজন ঋষিপ্রতিম অধ্যাপকের ভাই দেশে থাকতেন এবং গ্রামে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন গ্রাম্য দলাদলিতে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষীয় লোকরা তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা করে আচার্যদেবের মনটা বিষিয়ে দেয়। একবার তিনি গেছেন কলকাতায় আচার্যদেবের সাথে দেখা করতে, ঘরে ঢোকার সাথে সাথে আচার্যদেব তাঁকে বললেন, 'ওহে বীরেন—একই গাছে কি টক মিষ্টি দুরকম আমই ফলে।' তিনি তো হতভম্ব। আচার্যদেবের সাথে তখন আর সবাই কিন্তু হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে।**

একবার আচার্যদেব গ্রামে গেছেন। বাকী খাজনার দায়ে তখন ওঁদের পৈত্রিক জমিদারী নিলাম। গ্রামের প্রধানরা তখন তাঁকে অনুরোধ করলো একটা ব্যবস্থা করতে। উনি বল্লেন—"এবার না হয় বাঁচালাম কিন্তু ভবিষ্যতে যে আবার এটা নিলামে উঠবে না তার নিশ্চয়তা কি? তার চেয়ে আমি বলছি—যদি এরা সবাই বড়দা জ্ঞানেন্দ্রমোহন বা তাঁর ছেলের নামে লিখে দেয় তাহলে আমি ব্যবস্থা করি। তিনি বা তাঁর ছেলে তো জমিদারী ভোগ করতে আসছেন না।" এখানে উল্লেখযোগ্য যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন কলিকাতার ভবানীপুরে থাকতেন এবং ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে ওকালতি করতেন। খবরটা সব শরিকদের জানান হোল। ওঁর ছোট ভাইয়ের ছেলে চারুদা বল্লেন—'আমি মার মতামত জেনে আসি।' একটু পরেই এসে বল্লেন—'না, মার মত নেই।' আচার্যদেব তখন হাসতে হাসতে বল্লেন—'চারু ঢের ঢের স্ত্রৈণ দেখছি কিন্তু তোমার মত মাতৃৎণ আর একটাও দেখিনি।'** আর একদিনের কথা

—বোধহয় ১৯৩০ বা ৩১ খ্রীস্টাব্দ। আচার্যদেব প্রতি বৎসরের মত সেবারেও গ্রামে এসেছেন। বিকেলে খেলার মাঠের মাঝখানটায় আমরা বসে—অল্প কয়েকজন। গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠিত লোক আমার পরিচয় দিলেন বাবা ও ঠাকুরদার নাম বলে। আচার্যদেব আমার গালে চড় মেরে বল্লেন—'তোরা কি সব চুরি করে জন্মেছিলি।'

আমাদের মত যাদের তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি—দূর থেকে দেখে বা ছবি দেখেই যাদের তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করতে হয়েছে তাদের কাছে এই ব্যাপারটা আদৌ বোধগম্য নয়। তাঁর চেহারায় জৌলুষ ছিল না। নিজের পরিধেয় সাধারণ—বরং সাধারণের চেয়ে কিছুটা নীচু স্তরের। ভাল করে চুল-দাড়ি সুবিন্যস্ত করে ফিটফাট থাকার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এ ব্যাপারে তাঁর সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের সাথে তুলনা করলে এটা আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর চোখ ও হাসিতে তাঁর পূর্ণ বৈশিষ্ট্য দীপ্ত হ'য়ে উঠতো। একটি ঘটনা—যতদূর মনে পড়ছে—১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ। আমি সবে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি এবং আচার্যদেবের বিশেষ পরিচিত একজনের সাথে তাঁর বিজ্ঞান কলেজের ঘরে বসে আছি। ভীড় নেই তবে আরও দু-একজন আছেন। এমন সময় ঘরে আবির্ভাব হোল একজনের—পরে জানলাম তিনি আমাদী গ্রামের 'নৃপেন রায়চৌধুরী'। তিনি এসেই একটা কাগজ ধরে আচার্যদেবকে বল্লেন—'এইখানটায় ৬ কেটে ৮ করে সই করে দেও।' উনি বল্লেন—'কেন কি ব্যাপার' নৃপেনবাবু বল্লেন "ব্যাপার আবার কি, তোমাদের বেঙ্গল কেমিক্যালের মাপ আর কবিরাজের মাপ আলাদা। তুমি আমার বৌ-এর চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ মকরধ্বজ লিখে দিয়েছিলে এখন কবিরাজ বলছে—তাতে কম পড়বে।" এখানে জানা দরকার—তখন বেঙ্গল কেমিক্যাল মকরধ্বজ তৈরী করতো। তখন আচার্যদেব বল্লেন—'ও এই ব্যাপার—তা ৬ কেটে ৮ করে নে।' নৃপেনবাবু সাথে সাথে ৬ কেটে ৮ করে বল্লেন—'ন্যাও এইবার সই করো।' উনি বল্লেন, 'সই করতে হবে না—এতেই চলবে'। নৃপেনবাবু বল্লেন 'তাহলে বাস ভাড়ার পয়সা দেও—যাতায়াতের।' আমরা বিশেষভাবে আমিতো অবাক। এই লোকটা আচার্যদেবকে তুমি তুমি করছে আর কি হম্বিতম্বি। তখন উনি আবার বল্লেন—'যা এটা নিয়ে যা এতেই হবে। আর না হ'লে কি হ'য়েছে।' তখন নৃপেনবাবু হঠাৎ গরম হয়ে বল্লেন 'কি হয়েছে? তুমি জান? এখনই ওষুধ না পড়লে আমার বৌ মরে যাবে।' তখন আচার্যদেব বল্লেন—'আমার এই সইটুকু না হলে যদি তোর বৌ মরে তো মরুক।' আমি কিন্তু তখন আচার্যদেবের কথায় রহস্যের আভাষ পাচ্ছি। কিন্তু নৃপেনবাবু একদম ক্ষেপে গেলেন। 'কী বৌ মরুক। নিজের বিয়ে করার মুরোদ হোল না—এখন বলে বৌ মরুক।' উনি হাসতে হাসতে বল্লেন—'বিয়ে যে করিনি সেটা ঠিকই কিন্তু কেন?' নৃপেনবাবু বল্লেন, 'বিয়ে করনি খেতে দিতে পারবে না বলে।' আচার্যদেব তখন অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন—সবার দিকে তাকিয়ে বল্লেন 'এই তোরা সব শোন নৃপেন কি বলে—আমি নাকি খেতে দিতে পারবো না বলে বিয়ে করিনি।'

সেই হাসি—নিস্তব্ধ অবস্থায় চোখ বুজলে এখনও আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অতীন্দ্রয়লোকে নিয়ে যায়—Wordsworth-এর Daffodils-এর স্মৃতির মতো। প্রচলিত আছে—মহাত্মা গান্ধীর হাসির জাদু—শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর, Lord Mountbatten যার উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধার সাথে। আমাদের সেই জাদুতে মুগ্ধ হবার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু তার জন্য মনে কোনও ক্ষোভ নেই—আচার্যদেবের হাসির ফোয়ারায় অবগাহন করেছি—সেই স্মৃতি—যতদিন বেঁচে থাকবো—সব ইন্দ্রিয় যদি লুপ্ত হ'য়ে যায় যাক শুধু স্মৃতি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলেই হোল—তার অবগাহনেই পরিপূর্ণ আনন্দ।

* সতু অর্থাৎ সত্যেন্দ্র রায়চৌধুরীর কথা স্মরণীয় এইজন্য যে আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সতু তাঁর দমদমাস্থিত বাড়ী, পুকুর এবং জমি থেকে প্রায় এক বিঘা জমি সম্মিলনীকে দান করতে চায়। এবং সেই ব্যাপারে একদিন আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সাধনবিন্দু ঘোষ (খনু), কমল বোস এবং আমাদের আরও কয়েকজনকে নিয়ে সতু সেই জমি দেখিয়ে সেখানে গঠনমূলক কিছু করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তখন তখনই সেটা করার সুযোগ না থাকায় আমরা পরে এটাকে গ্রহণ করার কথা বলি। দুঃখের কথা কিছুদিন আগে সতু আমাদের ছেড়ে চলে গেছে—পরলোকে।

** রাড়ুলী স্কুলের হেড মাষ্টার ৺নিশিকান্ত দাস কর্তৃক খুলনা সম্মিলনী প্রকাশিত আচার্যদেবের শতবার্ষিকী সংখ্যায় স্মৃতিচারণ।

*** লেখকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺শচীন্দ্রনাথ ঘোষের মুখে শোনা।

রাড়ুলীর ইতিকথা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দুলালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাড়ুলী গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী উন্নতির মূল উৎস ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, তাঁর পরিবার এবং সমসাময়িক বহু গ্রামবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও নিষ্ঠা। আচার্যদেবের পিতার প্রচেষ্টায় ১৮৫৭ সালে রাড়ুলীতে বালকদের জন্য একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একই সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যতদূর জানা যায় এই বালিকা বিদ্যালয়ই ছিল যশোহর ও খুলনা জেলার সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়। এই বালিকা বিদ্যালয় পরে আচার্য রায়ের মায়ের নামানুসারে 'ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়' এবং বালকদের এই বিদ্যালয় পরে আচার্য রায়ের পিতার নাম সহযোগে 'আর. কে. বি. কে. হরিশ্চন্দ্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' নামে পরিচিতি লাভ করে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ না থাকায় বহুবছর যাবৎ হরিশ্চন্দ্রের ও গ্রামের মিত্র বাবুদের বাড়ীতেই পড়াশুনা চলত। সম্ভবতঃ ১৯১৩ সালে বাষট্টি হাজার টাকা খরচ করে ছেলেদের জন্য বিদ্যালয়ের অতি মনোরম নিজস্ব দ্বিতল গৃহ নির্মিত হল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ছাত্রাবাস এবং প্রধান শিক্ষকের বাসগৃহ। কাটিপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট কনট্রাক্টর কেশবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকেই এই বিদ্যালয়ের মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করে দেন। শিক্ষা মানুষকে সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন নতুন জীবনে উন্নীত করে। এই বিদ্যালয় তাই প্রতি বছর কেবল কৃতি ছাত্র তৈরী ক'রে ক্ষান্ত থাকেনি—এই প্রান্তের জনসমাজে একটা নতুন আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ রচনা করতে সাহায্য করেছিল।

এই গ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য পূবদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মনীন্দ্র-কুমার রায়চৌধুরীর বিশেষ প্রচেষ্টায় তাঁরই নিজ জমিতে তাঁর পিতার নামে 'পার্বতীনাথ ফ্রী প্রাইমারী স্কুল', তেমনি গ্রামের পশ্চিম দিকে নাথ পাড়ার এক প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ভাটপাড়া লোয়ার ফ্রী প্রাইমারী স্কুল'। এই দু স্কুলের দু শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অশেষ যত্ন নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তাঁদের কথা কোনো ছাত্রই জীবনে ভুলবে না।

বৃটিশ শাসনকালে অবিভক্ত বাংলাদেশে সমবায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে সারা বাংলাদেশ জুড়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এই সমবায় প্রকল্পের ব্যাপারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁর মধ্যম ভ্রাতা রায়সাহেব নলিনীকান্ত রায়চৌধুরীর প্রচেষ্টা ও অবদানের কথা আজকের গ্রামের মানুষেরা হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন। আচার্য রায় ও তাঁর এই অগ্রজ

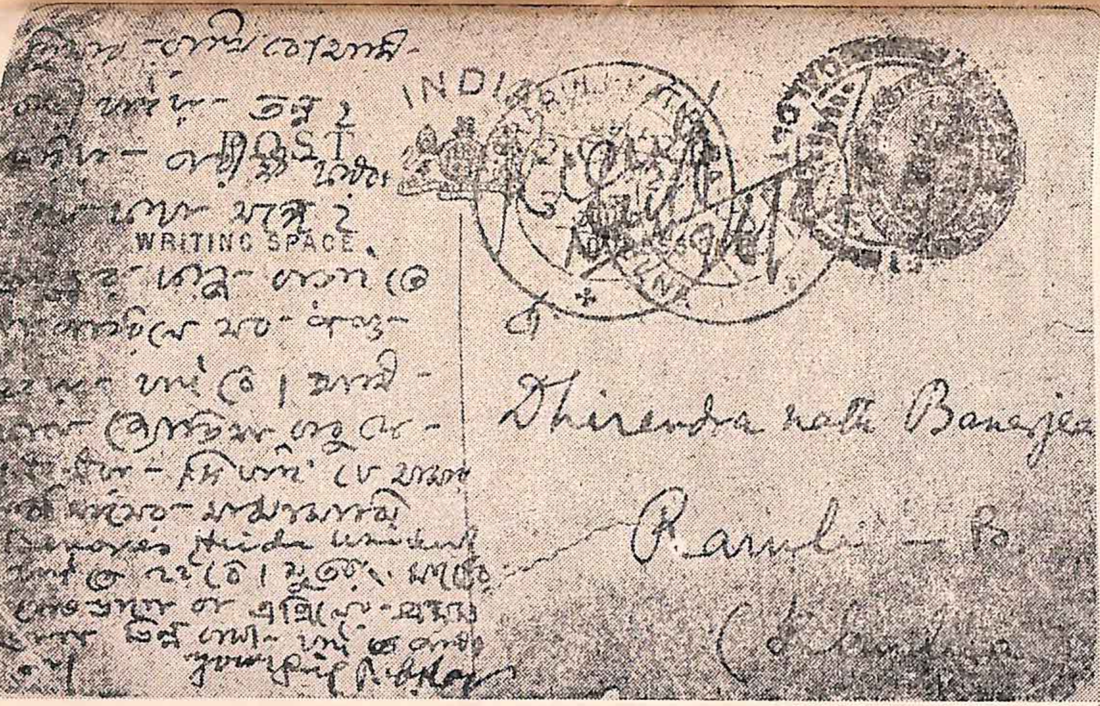
বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—সমবায় ভিত্তিক প্রচেষ্টাই জনগণের সার্বিক কল্যাণের প্রকৃতপথ উন্মুক্ত করতে পারে। তাই প্রধানতঃ তাঁদেরই প্রচেষ্টায় গ্রামে আনুমানিক ১৯২৩ সালে 'সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ' রেজিষ্ট্রীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলায় এই ব্যাঙ্কের স্থান বোধহয় দ্বিতীয়। রাড়ুলীর এই ব্যাঙ্কের প্রথম সভাপতি রায়সাহেব নলিনীকান্ত রায়চৌধুরী ও প্রথম সম্পাদক তাঁরই মধ্যম পুত্র অবনীকান্ত রায়চৌধুরী এবং যুগ্ম সহসম্পাদকদ্বয় আমার পিতা ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন বিহারী চক্রবর্তী। রায়সাহেবের মৃত্যুর পর অবনীকান্ত ও ধীরেন্দ্রনাথ যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। এই ব্যাঙ্ক রেজিষ্ট্রেশনের অল্পদিনের মধ্যেই আমার পিতা নিজ জমিতে আপন তত্বাবধানে ইট কাটিয়ে ও ঐ ইট পুড়িয়ে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্ব ও তত্বাবধানে রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অতি মনোরম ও মজবুত নিজস্ব বাড়ী এবং পাশেই অডিটরের কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাঙ্কের জন্য জমি দেন কৈলাসনাথ দাস। জেলা শহর থেকে ৪০/৪৫ মাইল দূরে এমন একটা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু পরিচালনা তখনকার দিনে একটা সুদক্ষতার পরিচয় বহন করে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই ব্যাঙ্কের অধীনে আঠার শ'-এরও বেশী রেজিষ্ট্রীকৃত সমবায় সমিতি বিদ্যমান ছিল এবং আজও এই ব্যাঙ্ক ভালভাবে চলছে।

আবার ঐ একই সময়ে রাড়ুলীতে 'পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক' নামে আর একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরও বহু বছর যাবৎ এই ব্যাঙ্ক চালু ছিল। একই গ্রামে তু-তুটো ব্যাঙ্ক বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে—এটা আজকের দিনে ভাবতেও যেন কেমন লাগে!

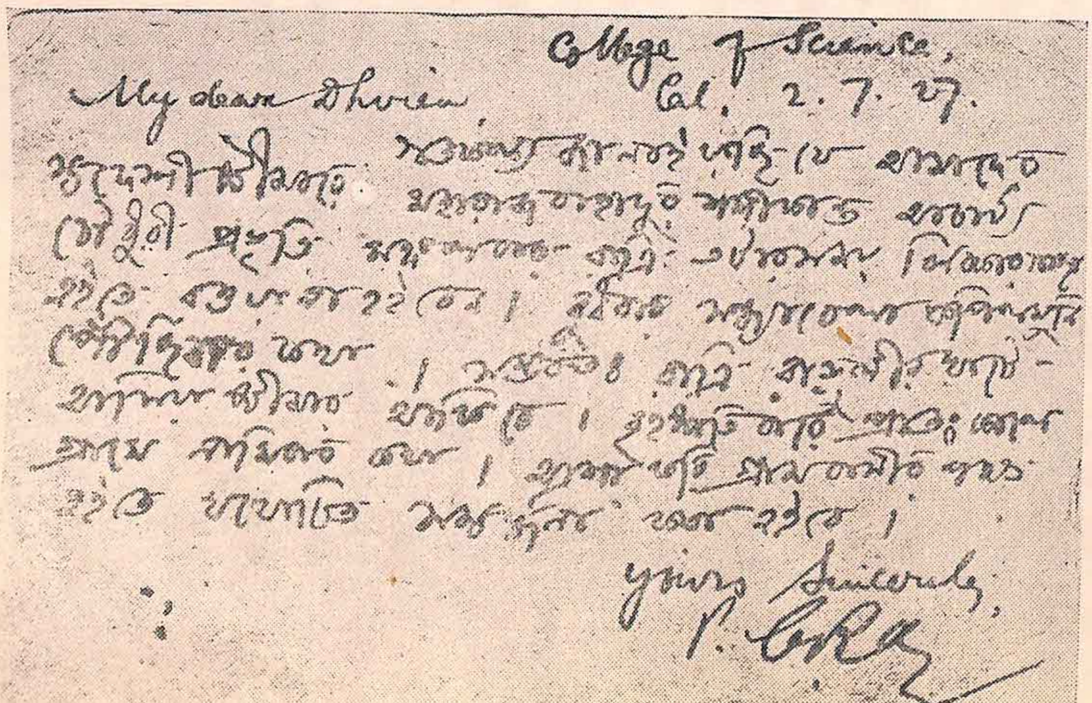
ঐ দ্বিতীয় দশকেই রাড়ুলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Poor Fund' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান। গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে রান্নার আগে একমুষ্টি চাউল আলাদা করে উঠিয়ে রাখতে হত। তা-ছাড়া গ্রামবাসীরা যথাসাধ্য নগদ টাকা-পয়সা ও বস্ত্রাদি দান করতেন এই প্রতিষ্ঠানকে, পরে তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিলি বিতরণ করা হত। আর এই সংগ্রহের সিংহভাগ আশাশুনিস্থ 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হ'ত। এছাড়া এই Poor Fund হ'তে নিয়মিতভাবে বস্তা বস্তা চাউল খরিদ করে ঐ সেবাশ্রম সংঘকে দেওয়া হ'ত। এই ব্যাপারে আচার্যদেব ও আমার পিতার ভূমিকা সম্পর্কে এখানে কিছু জানালে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৭।১২।১৯২৮ তারিখে 'বড়দল হাটের' বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাঙ্গীলাল রাধাকিষণ তৎকালীন 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'-এর হেড অফিস ২৪।৩, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতায় চাউলের দাম বাবদ ঐ সংঘের কাছে প্রাপ্য টাকার তাগিদ দিয়ে একখানি পোষ্টকার্ড লেখেন। এই পত্র পাইবামাত্র ১৯।১২।১৯২৮ তারিখে মির্জাপুর স্ট্রীট হ'তে উক্ত সংঘের কর্তৃপক্ষ চিঠিখানি Science College-এ আচার্যদেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। আচার্যদেব ২০।১২।১৯২৮ তারিখেই ঐ একই পোষ্টকার্ডের পেছনে আমার পিতা ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন—"My dear Dhiren, এই পত্র পড়িলেই শীঘ্রই সমস্ত বুঝিবে। আশা করি টাকাটা যত সত্বর পার দিয়া দিবে। ননী শীঘ্রই খসড়াটা যথাবিহিত দেখিয়া শুনিয়া দিবে। উদ্বিগ্ন

হইবে না।” আচার্যদেবের পোষ্টকার্ডে লিখিত এই নির্দেশ এখনও আমার কাছে রক্ষিত আছে। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আমাদের ঐ প্রান্তের দরিদ্র গ্রামবাসীদের সেবার জন্য আচার্যদেব এবং আমার পিতা ভারত সেবাশ্রম সংঘের সঙ্গে কত নিবিড়-ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রাড়ুলীতে চরকায় সূতা কাটার প্রচার প্রবর্তন হ'ল। এ বিষয়ে আচার্যদেবের উদ্দেশ্য ছিল (১) বিদেশী জিনিষ বর্জন করে দেশী বস্ত্রের চাহিদার ব্যাপারে স্বনির্ভর হওয়া ও (২) গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ বা ছেলেমেয়েদের অবসর সময়ে চরকায় সূতা কেটে কমপক্ষে দৈনিক একআনা বা দুইআনা রোজগারে সমর্থ করে তোলা। এই চরকার প্রচলন ব্যাপারে কপোতাক্ষ নদীর তীরে রাড়ুলীর বটতলা ঘাটে একটা অফিস ঘরও তৈরী হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আচার্যদেবের নির্দেশে তাঁর অনুগত ছাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ রাড়ুলীতে চরকার প্রচলন ব্যাপারে দীর্ঘ ছয় মাসের উপর অবস্থান করেন। এছাড়া সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তও রাড়ুলীতে বৎসরকাল এই ব্যাপারে অবস্থান করেন। আরও যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি চরকা প্রচলন ব্যাপারে এই গ্রামে বেশ কিছুদিন যাবৎ অবস্থান করেন তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, ভূতপূর্ব মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে গ্রামে চরকায় সূতা কাটার ব্যাপারে মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হ'ত। বিদেশী জিনিষ বর্জন, স্বনির্ভর বস্ত্রের উৎপাদন ও স্বাধীনতা অর্জন ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে আচার্যদেবের ভূমিকা ও অবদান, তাঁর মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও আদর্শ শিক্ষাবিদের পক্ষে বিরল দৃষ্টান্ত। এই চরকা প্রচলন ব্যাপারে আচার্যদেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, জন্মভূমির প্রতি তাঁর টান আর এই সব ব্যাপারে আমার পিতার সক্রিয় ভূমিকার বিষয়ে Science College হ'তে ২৫/২/১৯২২ তারিখে লেখা আর একখানি পোষ্টকার্ডের কিয়দংশ—“My dear Dhiren, তোমার পত্র পাইলাম। সূতা যে পরিমাণে তৈয়ারী হইবে ঠিক সেই পরিমাণে ইহার খরচ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁতে সেই পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী করিতে হইবে। জমিতে দিলেই মুস্কিল বাধিবে। এখানে মোটা সূতার আদৌ বাজার নাই। যাহা হউক আপাততঃ সূতা জমা হউক। তোমরা যে এতগুলি তাঁত বসাইয়াছ সেগুলিতে কি কাজ হইতেছে না? আমরা এখানে চরকার উপযোগী লম্বা আঁশওয়ালা (long stapled) তুলা ৪॥. বা ৫ মণ এক গাঁইট পাঠাইতেছি। আর তানার উপযোগী এক গাঁইট সূতাও পাঠাইতে প্রস্তুত। তবে কত নম্বর হইলে ভাল হয় জানাইবে। হাত নাগাত যত সূতা পাইয়াছ তাহার পরিষ্কার হিসাব রাখিবে। আমি বাড়ী যাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিব। ফলকথা সঙ্গে সঙ্গে তাঁতের কাজ গড়াইতে না পারিলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে। পাইপের জন্য কত লাগিবে হিসাব করিয়া রাখিবে। তোমার প্রেরিত Pass Book পাইলাম।” এই সব চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আজ আমরা বুঝতে পারি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কিভাবে জীবনের শেষ দিন



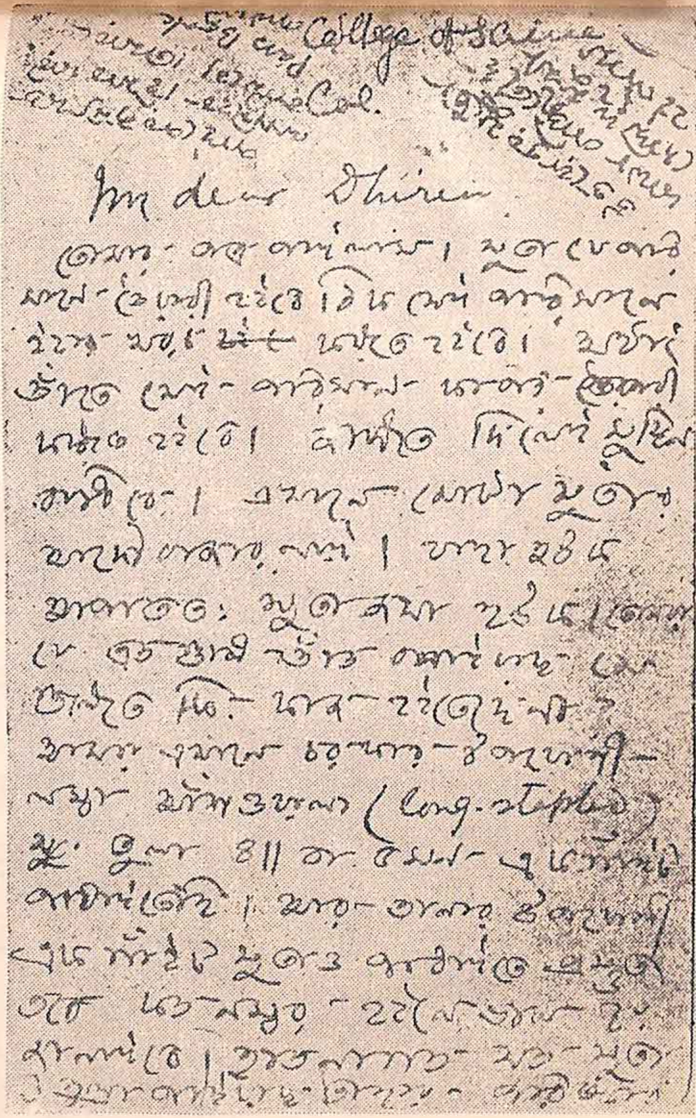
Dhirendra nath Banerjee



College of Science,
Cal. 2. 7. 27.

My dear Dhiren

Yours sincerely,
P. C. Ray



My dear Dhiren

রাষ্ট্রীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 25.2.22 এবং 2.7.27 তারিখে লেখা আচার্যদেবের দুইখানা চিঠি

পর্যন্ত দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, স্বাধীনতা অর্জন ও দরিদ্র সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৯১৫ সালে আচার্যদেবের বহির্বাটীতেই 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠাগারে ১৯৪৭ সালে নানাভাষায় মূল্যবান পুস্তকের সংখ্যা ছিল প্রায় পনের হাজার। বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত আচার্যের পিতা হরিশ্চন্দ্রের হাতে লেখা কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল এই পাঠাগারে। এই পাঠাগার সৃষ্টির সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের প্রকাশিত ইংরাজী ও বাংলা সকল দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকারই গ্রাহক ছিল এই পাঠাগার। এখানে বঙ্গদর্শন, সমাচার দর্পণ, সবুজ পত্র প্রভৃতি নানা পুরণো মাসিক পত্রিকার সংগ্রহ ছিল। গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই পাঠাগারের সামনে অবস্থিত খোলা বারান্দায় বসে এইসব পত্রপত্রিকা রোজই পড়াশুনা করতেন। এই পাঠাগার পরিচালনা করতেন গ্রামের যুবকবৃন্দ।

ঐ একই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৫।১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাড়ুলী ড্রামেটিক ক্লাব। আচার্য-দেবের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিখ্যাত সাপের ওঝা যামিনীকান্ত রায়চৌধুরীর অকাল মৃত্যুর পর এই ক্লাবের নামকরণ হয় 'যামিনীকান্ত মেমোরিয়াল ড্রামেটিক ক্লাব'। এই ক্লাবের মঞ্চসজ্জা ব্যাপারে যাবতীয় অঙ্কনকার্য করেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কাটিপাড়ার স্বর্গত অরুণ মিত্র—যিনি তৎকালীন কলিকাতার ষ্টার থিয়েটারের 'সিন,' 'উইংস' ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অঙ্কন করতেন। ফলে গ্রামের এই ক্লাবের মঞ্চটি দেখলে 'ষ্টারের' সমকক্ষ মনে হত। এই ক্লাবের অভিনয়, গান, বাজনা ও নাচের মান ছিল অতি উচ্চাঙ্গের।

শিল্প, ললিতকলা ও লোকহিতৈষণায় এ গ্রামের কয়েকজনের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে সঙ্গীতে শৈলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও বিমল রায়চৌধুরী, বাঁশী, অঙ্কন ও মৃৎশিল্পে বিনোদবিহারী ঘোষ, অঙ্কনে চিত্তরঞ্জন মজুমদার, বাঁশীতে সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অভিনয়ে ভূপেন দাসগুপ্ত, সানাই বাদ্যযন্ত্রে বাঁশীরাম বাজাদার, কবিগানে গিরিজানাথ বিশ্বাস, গাজনের বালাদার সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও ললিত বিশ্বাস, মৃৎশিল্পে বৈদ্যনাথ অধিকারী ও শশীভূষণ রজক, যাত্রাভিনয়ে দেবেন বিশ্বাস, গুণিন হিসাবে পীতম্বর রজক ও হাবু বিশ্বাস, সাপের ওঝা যামিনীকান্ত রায়চৌধুরী ও তাঁর দুই শিষ্য কালুগাজী ও ওসমান কাহার, প্রাইমারী শিক্ষক বিনয় দে আর ব্রতচারী শিক্ষকতায় গুরুসদয় দত্তের ছাত্র চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী (আচার্যদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখেন।

খেলাধূলার ব্যাপারে সম্ভবতঃ ১৯১৫।১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নলিনীকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব'। বিশেষভাবে ফুটবল খেলায় এই ক্লাব ছিল অতি উচ্চমানের। এই ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড় শ্রীশম্ভুনাথ রায়চৌধুরী অনেক দিন যাবৎ কলিকাতার 'রাজস্থান' ও 'এরিয়ান্স' ক্লাবে খেলেছেন। ১৯৪০ সালে গ্রামে আরও একটি উচ্চমানের স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় 'ডি. এন. (ধীরেন্দ্রনাথ) স্পোর্টিং ক্লাব' নামে। বিরুদ্ধ দল হিসাবে যখন উভয় দলের খেলা চলত তখন দেখেছি কোন দলই অপরের কাছে হার মানতে

চাইত না। আবার কিশোরদের খেলাধূলার জন্য ছিল 'গোপাল বৈরাগীর মাঠ' ও 'ধোপাখোলার মাঠ'।

১৯৩০-৩১ সালে রাড়ুলীতে 'লবণ আইন অমান্য আন্দোলন' উত্তাল হয়ে ওঠে। আচার্য-দেবের প্রচেষ্টা ও উৎসাহে তখন রাড়ুলী, কাটিপাড়া, বাঁকা, খেশরা ও আশপাশের বহুগ্রামের অগণিত অধিবাসী এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। খুলনা নিবাসী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে আচার্যদেবের বাড়ীর সামনেই আইন অমান্য করে লবণ তৈয়ারী শুরু হয়। বেশ কিছু আন্দোলনকারী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করে। এই আন্দোলনে যাঁরা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন তাঁদের মধ্যে রাড়ুলীর অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অসীমকৃষ্ণ ঘোষ, সুনীল বসু, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল বসু কাটিপাড়ার বিভূতি ঘোষ, নির্মল দাস, সমর মিত্র, বাঁকার গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পাইকগাছা থানার 'সাবরেজিষ্ট্রী অফিস' বহুকাল পূর্ব হ'তে আচার্যদেবের বহির্বাটীতেই ছিল। এই লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের পরই সম্ভবতঃ ১৯৩২ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার এই সাবরেজিষ্ট্রী অফিস রাড়ুলী হ'তে পাইকগাছায় স্থানান্তরিত করে।

বৃটিশ সরকারকে দেশ থেকে হঠিয়ে দেওয়া ও পুলিশের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াবার পরোক্ষ হাতিয়ার হিসাবে ১৯৩০-৩১ সাল থেকে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা প্রশিক্ষণ স্মুরু হয়। এই ব্যাপারে তৎকালের যুবকগণ এতই সুনিপুণভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল যে ঐ লাঠি ঘোরাবার সময় সামান্য দূর থেকে সজোরে ঢিল ছুঁড়েও তাকে কেহ আহত করতে পারত না। বিভিন্ন প্রকারে শরীর চর্চ্চার নিয়মিত অনুশীলন এই সময় থেকে চলতে থাকে। ১৯৩৬-৩৭ সালে শরীর চর্চার ব্যাপারে একটি স্থায়ী ব্যায়ামাগার নিজ বাড়ীতেই প্রবর্তন করেন তুষারকান্তি মল্লিক। এখানে আধুনিকতম সব রকমের শরীর চর্চার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৩৯-৪০ সালে রাড়ুলীতে গড়ে ওঠে তৎকালীন যুবকদের 'আশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। শ্রীসুখেন্দু রায়চৌধুরীর ঠাকুমা ও ডাঃ কালীপদ রায়চৌধুরীর মাতা ধর্মপ্রাণা, উদার ও বুদ্ধিমতী শরৎ কুমারী রায়চৌধুরানী তাঁর বাড়ীতে একখানি বড় ঘর ছেড়ে দেন এই 'আশ্রমকে'। খেলাধূলা, অভিনয়, লাইব্রেরী পরিচালন, গ্রামে সার্বজনীন দুর্গাপূজা, গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করা ইত্যাদি সব কিছুই পরিচালন করতেন এই আশ্রমের যুবকবৃন্দ। দুইটি বিষয়ে এঁদের অবদান অতি প্রশংসনীয়। (১) গ্রামে ডিফেন্স পার্টি করে রাতে পাহারা দিয়ে গ্রামবাসীদের চোর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করা ও (২) রোগীর সেবা করা। এখানকার সেবকেরা ছিল নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ। কোনো রোগী কলেরা, বসন্ত বা টাইফয়েডে আক্রান্ত হলে রোগীকে পালা করে সেবা করতো। সংক্রামক রোগে মৃত শবের দাহ করতে এই যুবকগণ নির্দ্ধিধায় এগিয়ে আসত। চিকিৎসা ও সেবার ব্যাপারে সবার আগে মনে পড়ে গ্রামের চিকিৎসক ডাঃ বিষ্ণুপদ ঘোষ ও কালিদাস ঘোষের নাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ মিত্র 'যশোহর খুলনা সেবা সমিতি' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৪১ সালে রাড়ুলীর বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিষ্ণুপদ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে ও তৎকালীন গ্রামের যুবকদের সহযোগিতায় রাড়ুলীতে এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখাকেন্দ্র খোলা হয়। কলিকাতায় অবস্থিত হেড অফিস হতে রাড়ুলীর এই কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে ঔষধপত্র আসত। ডাঃ বিষ্ণুপদ ঘোষ বিনা পারিশ্রমিকেই রোগীদের দেখাশুনা করতেন। দরিদ্র রোগীরা বিনা পয়সায় এইভাবে সুচিকিৎসার সুযোগ পেতেন।

সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালে শুরু হয় রাড়ুলীতে সার্বজনীন দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও সার্বজনীন বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। এই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবনীকান্ত রায়চৌধুরী, কালিদাস ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। শিল্পী বিনোদ ঘোষের নির্দেশনায় প্রস্তুত প্রতিমা অতি উচ্চমানের হ'ত। গ্রামের সমসাময়িক সকলের প্রচেষ্টায় মহাষ্টমীর দিনে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দরিদ্রনারায়ণ সেবা, বস্ত্র, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ ও পংক্তি ভোজন হ'ত। একাদশীর সন্ধ্যায় সার্বজনীন বিজয়া সম্মিলনীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হ'ত। পৌরোহিত্য করার জন্য প্রতি বছর গ্রামের এক একজন বৃদ্ধকে তাঁর বাড়ী থেকে গ্রামের কিশোর ও কিশোরীগণ শঙ্খ বাজিয়ে ও শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে পাল্কিতে ক'রে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসত। সে এক বৈচিত্র্যময় শোভাযাত্রা। ঐ অনুষ্ঠানে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী ছাড়া গান, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, যাদু প্রদর্শনী প্রভৃতি হ'ত। পূজার ক'দিন ধরে কিশোর, যুবক এমনকি বৃদ্ধদেরও বিভিন্ন গ্রুপ ক'রে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা হ'ত। অনুষ্ঠানে কৃতিদের পুরস্কৃত করা হ'ত। ১৯৩৯-৪০ সালে এই সম্মিলনীর প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটা সম্মিলনী সৃষ্টি হয় 'পূর্ণিমা সম্মিলনী' নামে। উভয় সম্মিলনীর পরস্পরের প্রতি ছিল ভীষণ দ্বন্দ্ব ও বিরুদ্ধতা। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় (লক্ষ্মী পূজার দিন) আচার্যদেবের বাড়ীর দোতালায় বৈঠকখানা ঘরে চলত পূর্ণিমা সম্মিলনীর অনুষ্ঠান। দু'শ-আড়াইশ লোক বসতে পারত এখানে। কোন্ দলের অনুষ্ঠান কত সুন্দর ও উচ্চমানের হয়—এইটাই ছিল উভয় দলের একান্ত প্রচেষ্টা। পূর্ণিমা সম্মিলনীর সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন কালিদাস ঘোষ, অনিল গুপ্ত, ঘোষের বাড়ীর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি।

সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সালে গ্রামের যুবকগণ হাতে লিখে একখানি ত্রৈমাসিক উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশ করেন। নাম—'বার্তা'। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভূমিকায় শচীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী ও নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষের অবদান ছিল যথেষ্ট। আর শিল্পী বিনোদ ঘোষ এই পত্রিকার প্রচ্ছদপট ও ভিতরে বিভিন্ন ছবি আঁকতেন। অল্প কিছুদিন পরে সম্ভবতঃ ১৯৩৯ সালে নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 'আরতি' নামে আর একখানি উচ্চমানের ত্রৈমাসিক হাতে লেখা পত্রিকা গ্রামে প্রকাশ শুরু হয়। এই পত্রিকায় নৃপেনদার পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর (যিনি একজন অতি উচ্চমানের সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকার ছিলেন) বেশকিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে বের হ'ত। বিশেষ ক'রে কিছু অল্প বয়সের যুবক ও কিশোরদের

এই পত্রিকা। এর প্রচ্ছদপট ও ভিতরের বিভিন্ন ছবি আঁকতেন আর এক শিল্পী—চিত্তরঞ্জন মজুমদার। লেখা, ছবি ইত্যাদি সব রকমের উৎকর্ষতার দিক দিয়ে উভয় পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত। আচার্যদেবের স্নেহধন্য ছিল এই পত্রিকাগোষ্ঠী।

এডুকেশান সোসাইটি—আচার্যদেব বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার সময় ওখানে নিজে যে মূলধন বিনিয়োগ করেন তার ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার শেয়ার এই এডুকেশান সোসাইটিকে দিয়ে যান। আর ঐ মূলধন হইতে লব্ধ ডিভিডেণ্ডের টাকা গ্রামের হাইস্কুল আর. কে. বি. কে. হরিশ্চন্দ্র ইনষ্টিটিউশন, রাড়ুলী ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়, খেশরা মিড্‌ল ইংলিশ স্কুল, কাটিপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, বাঁকা বালিকা বিদ্যালয়, রাড়ুলী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লাইব্রেরী, রাড়ুলী ড্রামেটিক ক্লাব, রাড়ুলী এন. কে. স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে পেত। দেশে শিক্ষা বিস্তার ও নানারূপ উন্নতির জন্য আচার্যদেবের এইভাবে ত্যাগ ও বহুমুখী প্রচেষ্টা আজ আমরা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করি। ভারত সরকারের এই প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণের পর থেকে এই সোসাইটিকে আর ডিভিডেণ্ড দিচ্ছেন না। এটা খুবই দুঃখের বিষয়।

রাড়ুলী গ্রামের ইতিকথা আলোচনা করলে একথা প্রতীত হয় যে ১৯১০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর হল এই গ্রামের সমৃদ্ধির যুগ। এই যুগ সমৃদ্ধির মূলে ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ত্যাগ, নিষ্ঠা, উপদেশ, নির্দেশনা এবং সর্বোপরি দেশের দরিদ্র জনগণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম কর্তব্যবোধ ও ভালবাসা। তাঁরই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামের বিভিন্ন সময়ের বৃদ্ধ, যুবক ও তরুণগণ নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন দেশ ও গ্রামসেবায়। আমরা গর্বিত যে আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি রাড়ুলীর মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আচার্যের আদর্শ ও ধ্যানধারণাকে জয়যুক্ত করতে পারলে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন সার্থক হ'তে পারে।

তিন মনীষা বনাম বাঙালীর ব্যবসা-বিমুখতা

বারীন্দ্র মিত্র

আচার্য রায় তো সারাজীবন ধরে লক্ষ লক্ষ বার বলে গেলেন—বাঙালী যদি বাঁচতে চাও, বড় হতে চাও, তবে ব্যবসা কর—ব্যবসা কর। শুধু বলেই ক্ষান্ত থাকেননি—নিজে করেও দেখিয়েছেন। অজস্র যুবককে পথ দেখিয়েছেন—উৎসাহ দিয়েছেন এবং আর্থিক সাহায্যও করেছেন ব্যবসা করার জন্যে। এখনও কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান বেশ সুনামের সঙ্গে বেঁচে আছে প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ নিয়ে।

নানাদিকে আচার্য রায়ের দান ছিল—ছিল প্রচুর অর্থ ব্যয়। সকলেই এটা জানেন। এত টাকা আসতো কি সীমিত শিক্ষকতার আয় থেকে? আসতো ব্যবসা থেকে নিশ্চয়ই।

আচার্যদেবের এই প্রশস্তি গাইবার জন্যে আমার আজকের আসর নয়। ওঁর এত বলা—এত লেখা—এত উৎসাহদান ছিল বাঙালীর ব্যবসায়ের প্রতি মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজনে। এখনও বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে, বিশেষভাবে শিক্ষিত সমাজে, সব ঝোঁক চাকুরির দিকে। এবং বলা হয় ব্যবসায়ী মানেই অসৎ—ব্যবসায়ী হলেই চুরির আয়। এইতো দেখুন না—কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিয়ের বাজারে ছেলের দাম হোত সরকারী চাকুরিয়া হলে (এবং 'উপরি' আছে কিনা)! তারপর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল প্রভৃতি পেশাগতেরা। পেশা এবং চাকুরির বৃহত্তর রাজ্যে বাঙালীর এককালে প্রাধান্য ছিল। ছিল গর্ব। আজকে তাও গেছে। এখন শুধু একটা গর্ব নিয়েই আমরা গর্বিত—তা হল বাঙালীর শিল্প-কলা (পুরানো বাদ দিলে সাহিত্যেও বন্ধ্যাত্ব এসে গেছে)। তাই আজকে পি. সি. রায়কে আমাদের স্মরণ করতেই হবে।

বাঙালী শিক্ষিত সমাজের ব্যবসার প্রতি কি দুর্বল মানসিকতা তার একটু নমুনা দি।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মধ্যজীবনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে স্কুল-পরিদর্শকের বাঁধা মাইনেতে কি দানসাগর হতে পেরেছিলেন? নাহলে কি 'উপরি' ছিল? বিদ্যাসাগর কি জীবনে অসৎ ছিলেন? বাঙালী ভেবে দেখুন!

বিদ্যাসাগর ছিলেন ঢুঁদে ব্যবসায়ী। নিজের লেখা যাবতীয় বই (প্রধানতঃ স্কুলপাঠ্য) নিজেরই প্রকাশনা। অন্য গ্রন্থকারেরও বই ছাপতেন। বিশাল প্রকাশনা সংস্থা এবং মুদ্রণ-শিল্প। আমরা যতদূর জেনেছি গড়ে লাভ হোত বাৎসরিক প্রায় লক্ষ টাকা (বর্তমান টাকার মূল্যে ভাবুন)। প্রচুর ব্যয় করতেন শিক্ষা বিস্তারে, ছাত্রদের সাহায্যার্থে, ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিতে। শ্রীমধুসূদনকে মোটা মোটা অংকে কয়েকবার সাহায্যের কথা আমরা সবাই জানি। অথচ এই

মনীষীকে বড় ব্যবসায়ী হিসাবে মেনে নিতে এবং প্রচার করতে বাঙ্‌লা-সমাজ লজ্জা পায়।

নব-বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দেখতে চলুন আমরা মেঘালয়ের রাজধানী শিলংএ যাই। আর কি উপায় আছে বাঙালীর! শিলং-এর বুকের মাঝে—সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর ঠিক সামনে Meghalaya State Electricity Board-এর প্রধান অফিস এক প্রধান রাস্তার উপরে। ঢোকার পথের মুখে খুব বড় বড় হরফে লেখা Dr. Bidhan Chandra Bhaban। এত এত বাঙালী টুরিস্টকে যেতে দেখি ওখানে—কাউকে আজ পর্যন্ত প্রশ্ন করতে শুনলাম না কেন এই ভবনটি বিধানচন্দ্রের নামে এত প্রাধান্য দিয়ে ওদেশের লোক মনে রেখেছেন। শিলংকে বিজলী-আলো দিয়েছিলেন বাঙালী বিধানচন্দ্র। দানে নয়—ব্যবসায়ের সূত্রে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে বোম্বাই-এর কাছে জামসেদজী টাটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে বোম্বাইকে করেন। আলোকিতসেটাই প্রথম জলবিদ্যুৎ ভারতে। আর আমাদের বিধানচন্দ্র তার কয়েক বছর পরেই ভারতে দ্বিতীয় জলবিদ্যুতের ব্যবস্থা করেন পূর্ব প্রান্তে শিলং-এ একটি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে। একটি ঝরণার নিচে এখনও আছে সেই সব যন্ত্রপাতি সযত্নে। ঐ বিধানচন্দ্র ভবন তারই অফিস ছিল। ৫০-৬০ বছর পরেও ওঁরা স্মরণ করে স্মৃতিরক্ষা করেছেন ব্যবসায়ী বিধানচন্দ্রের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন প্রথম অসামরিক বিমান চলাচল শুরু হল ভারতে—তার উদ্যোগ ছিল ব্যবসায়ীদের হাতে। দমদম কেন্দ্রে প্রথম এগুলেন সেই আমাদের পুরুষসিংহ ব্যবসায়ী বিধানচন্দ্র। তারপর বিড়লারা। বিধানচন্দ্রের 'ভারত এয়ারওয়েজ' দমদম থেকে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম যেত প্রতিদিন। পরে ভারত সরকার 'ইণ্ডিয়ান এয়ারওয়েজ' প্রবর্তন করে সব অধিগ্রহণ করে।

বিধানচন্দ্র প্রথম ইনস্যুরেন্স কোম্পানী প্রবর্তন করার কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন—একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু জানেন না আজকের বৃদ্ধ এবং যুবক বাঙালীরা—এই মহামনীষীর আরও কত ব্যবসার উদ্যোগ ছিল। আমরা এমন করে ফেলেছি যেন বিধানচন্দ্রের এদিকের বিশাল প্রতিভা প্রচার করলে তাঁকে ছোট করে ফেলা হবে। হায় বাঙালী!

আমি পুরানো এবং আধুনিক কালের দুই প্রখ্যাত মনীষীর ব্যবসায় প্রতিভার যৎসামান্য উল্লেখ দিলাম মাত্র। এরূপ আরও অনেক দেওয়া যায়। আসুন নব যুবকেরা, নব গবেষকেরা আমরা খুঁজে বের করি তাঁদের—আর নব আন্দোলনে নামি বাঙালী সমাজের 'ব্যবসা-বিমুখতার' বিরুদ্ধে নব জগরণের জন্যে।

একটি অনন্য সাক্ষাৎকার

এলাহাবাদে গত ১২-৭-৮৬ তারিখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডঃ নীলরতন ধরের সাথে আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনীর সদস্য শ্রীরবীন্দ্রনাথ ধরের সাক্ষাৎকার।

শ্রদ্ধেয় ডঃ ধর, আমি আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী ও বিড়লা টেকনোলজিক্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়ামের তরফ থেকে এসেছি, আপনি আচার্যদেবের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং আপনি আচার্যদেবের একজন প্রিয় ছাত্র হিসাবে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করবেন—এই আশা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি।

● ● ●

প্রঃ ডঃ ধর, আপনি কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন ?

উঃ আমি ১৯০৭ সালে যশোর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করি। তারপর ১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত স্থুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অধীনে রিপন কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে (I. Sc.) পড়াশুনা করি। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্যদেবের অধীনে পড়াশুনা করি। তারপর ১৯১৫ সালে বিলেতে যাই।

প্রঃ আপনি কলিকাতায় যখন পড়াশুনা করতেন তখন কোথায় থাকতেন ?

উঃ প্রথমে হিন্দু হোষ্টেলে এবং পরে আচার্যদেবের সাথে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর উপরে থাকতাম।

প্রঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কিভাবে আচার্যদেবের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন ? কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ দিন।

উঃ আমাকে যে-সব কাজ করতে বলতেন তা যত্নসহকারে করতাম। আচার্যদেব Physical Chemistry করতে চেয়েছিলেন এবং আমিই প্রথম ভারতবর্ষে আচার্যদেবের প্রেরণায় Physical Chemistry চালু করি।

প্রঃ অন্যান্য ছাত্রদের গবেষণার কাজে আচার্যদেব কিভাবে সাহায্য ও প্রেরণা দিতেন ?

উঃ আচার্যদেব খুব আন্তরিকতার সাথে সব জিনিষ বুঝিয়ে দিতেন। শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী নামে একজন অসমীয়া ছাত্র ছিলেন। আচার্যদেব খুব যত্ন ও স্নেহের সাথে তাঁকে সব বুঝিয়ে দিতেন।

প্রঃ দুঃস্থ ছাত্রদের প্রতি আচার্যদেবের মনোভাব কেমন ছিল ? কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ দিলে ভাল হয়।

উঃ আচার্যদেব প্রতিমাসে ৪০০/৫০০ টাকা নিয়ে আসতেন। আচার্যদেবকে গরীব ছাত্ররা ঘিরে থাকতেন। উনি আমার উপর এই টাকা দুঃস্থ ছাত্রদের মধ্যে বিলি করবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি ছাত্রদের নাম, ঠিকানা ও কি পড়াশুনা করে তার একটা তালিকা তৈরী করে সবাইকে ঐ টাকা বিলি করতাম। পরে আচার্যদেবকে আমি হিসাব দিয়ে দিতাম।

প্রঃ এ কাজটা কি আচার্যদেব নিয়মিত করতেন ?

উঃ হ্যাঁ, নিয়মিত করতেন এবং ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আমার উপরই এই দায়িত্ব ছিল।

প্রঃ বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য আচার্যদেব ও তাঁর ছাত্রদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বলতে পারেন ?

উঃ আচার্যদেবকে এ ব্যাপারে রাজশেখর বসু, সতীশ দাসগুপ্ত প্রমুখরা সাহায্য করেছিলেন এবং বাংলাদেশে যাহাতে ঔষধ-পত্রের ব্যবসা ভালভাবে হয় তার জন্য আচার্যদেব আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

প্রঃ জনসেবামূলক কাজ তো উনি কিছু করেছেন, যেমন—দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে বা অন্যান্য কাজে কিভাবে আচার্যদেব সাহায্য করতেন ?

উঃ আচার্যদেব প্রয়োজনে এসব কাজ প্রচুর করেছিলেন।

প্রঃ আচার্যদেবের লেখা গ্রন্থ "The History of Hindu Chemistry" সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ? আজকের দিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এর ভূমিকা কতখানি ?

উঃ আচার্যদেব এটা ভালই লিখেছিলেন। ভারতবর্ষ সভ্য দেশ—রসায়নশাস্ত্রের সেরা হয়েছিল। আজকের দিনেও এর প্রয়োজন আছে।

প্রঃ আচার্যদেবের অধ্যাপনার বিশেষত্ব কি ছিল ?

উঃ আচার্যদেব খুব আন্তরিকতার সাথে ছাত্রদের বোঝাতেন এবং উনি যাহা বলতেন তার সব কিছুই Experiment-এর মাধ্যমে বোঝাতেন—এটাই আচার্যদেবের বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রঃ আপনার কর্মজীবন ও আবিষ্কার—এ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিতে পারেন?

উঃ খড়, ঘাস, পাতা, গোবর এগুলির সাথে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট মিশিয়ে চাষ করলে জমির উর্বরতা বাড়ে এবং তাতে অধিক ফসল হয়। এতে যে সার তৈরী হয় তারপর আর Commercial Fertilizer-এর দরকার হয় না। এটাই আমার আবিষ্কার। আমি এবং আমার স্ত্রী প্রয়াতা শীলাধর সুইডেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি জায়গায় যেয়ে এই আবিষ্কার দেখিয়েছিলাম এবং তার জন্য আমার নাম নোবেল প্রাইজ কমিটীতে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া থেকে প্রস্তাব যায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে-এর খুব সমাদর হয়েছিল। সে জন্য আমাকে French Academy of Agriculture ও French Academy of Science-এর সভ্য করা হয়।

প্রঃ ডঃ ধর, আজকে যে কৃত্রিম সার বাজারে চলছে—এটা তো খুব ব্যয় সাপেক্ষ। আপনি যে সার তৈরী করেছেন তাহা এখানে চালু হচ্ছে না কেন?

উঃ এখানে কিছু কিছু হচ্ছে—ফ্রান্সেও হচ্ছে। এখানকার সরকার শেতাঙ্গদের কথা শুনে চলে—তাছাড়া ব্যবসায়ীদেরও হাত আছে কৃত্রিম সার চালু করার ব্যাপারে।

প্রঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ছাত্ররা কিভাবে আচার্যদেবের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হোতেন এবং এই অনুপ্রেরণাদানের পিছনে আচার্যদেবের কি ইচ্ছা ছিল?

উঃ আচার্যদেব ছাত্রদের খুব ভালবাসতেন ও খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আচার্যদেবের ইচ্ছা ছিল যে ভাল ছাত্র তৈরী হোক, দেশের ও বিজ্ঞানের সেবা করুক ও দুনিয়ার ভালো হোক।

প্রঃ আচার্যদেবের সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

উঃ প্রত্যেকেই আচার্যদেবকে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো এবং মান্য করতো।

প্রঃ আগের দিনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও অস্পৃশ্যতা আমাদের দেশে ছিল—এর উপর আচার্যদেবের কিরূপ মনোভাব ছিল?

উঃ এ ব্যাপারে আচার্যদেবের খুব খেদ ছিল, দুঃখ ছিল—ভাগাভাগি পছন্দ করতেন না।

প্রঃ আচার্যদেবের সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কি রকম সম্পর্ক ছিল?

উঃ রবীন্দ্রনাথ আচার্যদেবকে মান্য করতেন—পছন্দ করতেন—কারণ আচার্যদেব ছাত্র তৈরী করতেন।

প্রঃ আচার্যদেবের বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যার উপর কি রকম মনোভাব ছিল?

উঃ আচার্যদেব সব সময় বাঙ্গালীদের ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য প্রেরণা দিতেন।

প্রঃ শিল্প বিকাশে আচার্যদেবের কি ভূমিকা ছিল?

উঃ শিল্প বিকাশে আচার্যদেবের দান তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল।

প্রঃ আচার্যদেবের জন্মস্থানের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিল ?

উঃ আচার্যদেব প্রতি বছর নিজের গ্রামে খুলনা জেলার রাড়ুলী কাটিপাড়ায় যেতেন এবং সেখানে প্রতিদিন ছাত্রদের নিয়ে নৌকা চড়তেন। আমিও কয়েকবার আচার্যদেবের সাথে ঐ গ্রামে গিয়েছিলাম। আচার্যদেব খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। উনি সব সময় বলতেন মায়ের আঁচোল ধরে চলো।

প্রঃ আচার্যদেব কি বাস্তবে আঁচোল ধরে চলতেন ?

উঃ না, তবে সবাইকে উনি ঐ কথা বলতেন।

প্রঃ আচার্যদেবের দানশীলতার কিছু ঘটনা মনে আছে ?

উঃ পূর্ব্বেই বলেছি—গরীব ছাত্রদের সর্বদা আর্থিক সাহায্য দিতেন আর Lady Jagadish Bose কে Brahmo Girls School পরিচালনার জন্য মাসে মাসে সাহায্য করতেন।

প্রঃ ডঃ ধর, আমরা যে সম্মিলনী করেছি তার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আচার্যদেবের স্মৃতি রক্ষা করা—এই স্মৃতি রক্ষা কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আপনার কিছু মতামত দিন।

উঃ আচার্যদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করো এবং আচার্যদেব যা বলতেন বা যা লিখেছেন—সেগুলি প্রচার করো।

প্রঃ আচার্যদেব সম্বন্ধে আরো কিছু ঘটনা যদি জানেন সেটা বলুন।

উঃ আমি যখন ১৯১৫ সালে বিলেতে যাই তখন আচার্যদেব হাওড়া স্টেশনে এসে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং যখন ১৯১৯ সালে দেশে ফিরলাম তখন আমি আচার্যদেবকে প্রণাম করেছিলাম।

প্রঃ আপনি কোন্ সালে বেনারস ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন ?

উঃ ১৯১৯ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গুরুদেবকে নিতে চেয়েছিলেন। তখন আচার্যদেব আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে Honorary Professor ছিলাম আর এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে Regular Professor ছিলাম। সেই অবধি এখানে আছি এবং আমার পয়সায় ও পরিচালনায় Sheila Dhar Institute of Soil Science—এই এলাহাবাদেই প্রতিষ্ঠা করি ও চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রঃ শীলাধর ইনষ্টিটিউটে—কিসের উপর গবেষণা হয় ?

উঃ এখানে মূলতঃ গবেষণা হয় Cheap Food Production-এর উপর।

প্রঃ এ ব্যাপারে কি ভারত সরকার কিছু সাহায্য করছেন ?

উঃ না—বিশেষ কিছু না।

প্রঃ আর কি প্রতিষ্ঠান আপনার আছে ?

উঃ এই এলাহাবাদেই ডঃ মেঘনাদ সাহার নির্দেশে ভারতবর্ষে প্রথম Science Academy করি। সেটা 1930। তার নাম National Academy of Sciences. আমি তার দ্বিতীয় সভাপতি এবং একাডেমি আজও ৫০ বছর পূর্তি করে সগৌরবে বিরাজ করছে।

প্রঃ আপনি কোন্ সালে জন্ম গ্রহণ করেন ?

উঃ ১৮৯১ সালে নভেম্বর মাসে জন্ম। এখন আমার বয়স ৯৫ বছর।

শ্রদ্ধেয় ডঃ ধর, আমরা আপনার দীর্ঘায়ু, সবল ও সুস্থ দেহ কামনা করি। আর আজ আচার্যদেব সম্বন্ধে যেটুকু আলোকপাত করলেন তার জন্য আমি আর. কে. বি. কে.—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী ও বিড়লা টেকনোলজিক্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়ামের তরফ থেকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাচ্ছি।

"সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।"

—আচার্য রায়

অধ্যাপক কে. আলী
২৫/এ, টিপু সুলতান রোড
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

ফোন : ২৩৬২৬৯ (বাসা)
২৫৭৪৫৭ (অফিস)

তারিখ : ১০-৭-৮৬

প্রিয় কুমারবাবু,

আপনার চিঠি ও 'কপোতাক্ষ' পেয়েছি। এজন্য ধন্যবাদ। সময়ের অভাবে উত্তর দিতে একটু দেরী হয়ে গেল। গত ৮-৭-৮৬ তারিখে আপনাদের জন্মভূমি ও স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক স্যার পি. সি. রায়ের জন্মভূমি রাড়ুলীতে গিয়েছিলাম স্বচক্ষে দেখার জন্য। অনেক কিছু দেখলাম ও জানলাম। আশা করি রাড়ুলীর উন্নয়নের জন্য কিছু করতে পারব। ওখানকার লোকজন আমাকে পেয়ে খুশী হয়েছে। তারা পি. সি. রায়ের জন্মবার্ষিকী ধুমধামের সঙ্গে পালন করবে। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। খুলনাতেও অনুষ্ঠান করার জন্য বলে গেলাম ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বালাকে।

আমি ঢাকাতে পি. সি. রায়ের জন্মবার্ষিকী পালন করব। জানি না কতদূর কৃতকার্য হব। পি. সি. রায়ের উপর একটি স্মরণিকা বের করতে যাচ্ছি। সময় খুব কম। তাই ভয় হচ্ছে। তাছাড়া বলতে গেলে একা। আপনারা এলে খুশী হব। আর না আসতে পারলে লেখা বা বাণী পাঠাবেন। আপনি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন।

আপনাদেরই
(স্বাক্ষর) কে. আলী

[পত্রলেখক ঢাকাস্থ 'খুলনা সমিতি'র সহ-সভাপতি]

আচার্যদেবের জন্মস্থান রাড়ুলীতে স্যার পি. সি. রায়ের বাসভবন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ পরিষদ আয়োজিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান সূচী

প্রথম অধিবেশন

সকাল ৭-০০ মিঃ—প্রধান অতিথি কর্তৃক জন্মজয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন।

সকাল ৭-১৫ মিঃ—প্রধান অতিথি কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ।

সকাল ৭-৪৫ মিঃ—জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্যার পি. সি. রায়ের জন্মস্থানে ও তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।

সকাল ৯-০০ মিঃ—শোভাযাত্রা সহকারে স্যার রায়ের বাসভবন থেকে ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় হয়ে রাড়ুলী হাই স্কুলে গমন ও সেখানে রক্ষিত প্রতিকৃতিতে মাল্যদান।

সকাল ১০-৩০ মিঃ—ক্রীড়ানুষ্ঠান।

দুপুর ১-১৫ মিঃ—মিষ্টান্ন বিতরণ।

দ্বিতীয় অধিবেশন

বৈকাল ৩-৩০ মিঃ—স্যার পি. সি. রায়ের জীবনের আলোকে আলোচনা সভা।

সন্ধ্যা ৬-০০ মিঃ—মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান।

রাত ৯-০০ মিঃ—পুরস্কার বিতরণ।

১৭-৭-৮৬

প্রিয় কুমারবাবু,

প্রিয় বলেই সম্বোধন করছি, কারণ এই স্বল্প পরিচয়ে আপনি নিজগুণে আমাদের বড়ই আপন করে নিয়েছেন। কয়েক মাস আগে যখন অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় আপনাদের পরিচয় দিয়ে লেখেন যে আপনারা আমাদের সংগ্রহালয়কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একটি মর্মর মূর্ত্তি উপহার দিতে চান তখন একটা দায়সারা চিঠি দিয়ে প্রস্তাবটিকে ধামাচাপা দিতে চাই। কারণ আচার্যের একটি মূর্ত্তি আমাদের আছে এবং মূর্ত্তির শিল্প উৎকর্ষ সম্বন্ধেও একটা প্রশ্ন মনে ছিল। কিন্তু তখনতো বুঝতে পারিনি যে আমি আচার্য **R. K. B. K.** সম্মিলনীর যে সমস্ত মানুষদের সংস্পর্শে এলাম তাঁদের আচার্যশ্রদ্ধা, কর্মে ঐকান্তিক একাগ্রতা এতখানি তীব্র। যেদিন আপনারা আমাকে শিল্পী কার্ত্তিকচন্দ্র পালের মূর্ত্তিটিকে দেখালেন তখন ভাস্কর্যটির মধ্যে যেন জীবন্ত আচার্যকে প্রত্যক্ষ করলাম। কি অপূর্ব মূর্ত্তি! আপনারা সবাই, আচার্য রায় পূর্ববাংলার, অধুনা বাংলাদেশের, যে গ্রামে জন্মেছিলেন সেখানকার লোক। আপনারা ওঁকে দেখেছিলেন। আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু মূর্ত্তিটিকে দেখে বুঝলাম যে ব্যক্তিত্বের কোন চুম্বকত্ব আপনাদের স্মৃতিতে তাঁকে অম্লান রেখেছে। আপনারা যাঁরা প্রায়ই আমার কাছে আসেন, তাঁদের সবারই বয়স ষাটের উর্দ্ধে। আজ যখন চারিদিকে 'কথায় ও কাজে ছায়া প্রলম্বিত হয়' তখন আপনাদের একটি মহৎ মানুষকে মনে রাখা এবং তাঁর কাজকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রবল ইচ্ছার সক্রিয় প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হই। আমি জানি, এর পেছনে পূর্ববঙ্গে আপনাদের ফেলে আসা জন্মভূমির মমত্বময় সুখস্মৃতি এবং প্রবল দেশাত্মবোধ, যা আজ এক বিস্মৃত গুণ, কাজ করছে। তাই আপনারা, সেই গ্রামে জন্ম নিয়েছেন যে মহৎ মানুষ তাঁকে স্মৃতিপটে ধরে রাখতে এবং আজকের ছাত্র-যুবদের মধ্যে তাঁর দেশপ্রেম ও কর্ম প্রচার করতে চান। চারিদিকে হতাশা এবং মূল্যবোধের অবনমনে যখন মন ক্লিষ্ট তখন আপনাদের সাথে পরিচয় চিত্তে বেগের সঞ্চার করেছে। ২রা আগষ্ট আচার্যের প্রদর্শনীর সাথে মূর্ত্তিটির উন্মোচন হবে। আপনাদের সম্মিলনীর এই উপহার আমাদের সংগ্রহালয় শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। আর আমি নিজে আপনাদের সাহচর্যে জীবনের এক নূতন অর্থের সন্ধান পেয়েছি। নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত

সমর বাগচী (অধিকর্ত্তা)

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা

১৯এ গুরুসদয় রোড, কলিকাতা ৭০০০১৯

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

খ্রীস্টাব্দ

১৮৬১—২রা আগস্ট, কপোতাক্ষ-তীরবর্তী যশোহর জেলার (পরে খুলনা জেলা) অন্তর্গত রাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা—বহু ভাষাবিদ্, সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী হরিশ্চন্দ্র রায় ; মাতা—ভুবনমোহিনী দেবী।

(১৮৬৬-৭০)—গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ।

১৮৭০—আগস্ট মাসে কলিকাতায় আগমন।

১৮৭১—হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন শুরু।

(১৮৭২-১৮৭৩)—আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে গ্রামের বাড়ীতে আগমন। পিতৃদেবের বিরাট পাঠাগারে নিজের উদ্যোগে নিরলস অধ্যয়ন।

১৮৭৪—কলিকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠিত এ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি।

১৮৭৮—এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৭৯—বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যয়ন শুরু।

১৮৮১—এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৮২—বি. এ. পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন।

(১৮৮২-৮৪)—এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর বি. এস-সি. ডিগ্রীলাভ।

১৮৮৫—'India before and after the Mutiny' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। বৃটিশ সরকারের সমালোচনার জন্য পুরস্কারলাভে বঞ্চিত কিন্তু গুণীজনের প্রশংসালাভ।

১৮৮৬—'Essays on India' প্রবন্ধ প্রকাশ ও খ্যাতিলাভ।

১৮৮৭—এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. উপাধিলাভ। 'Hope Prize' বৃত্তিলাভ।

১৮৮৮—স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন। ফ্রান্স ও ইতালি হয়ে রেলপথে ব্রিন্দিসি বন্দরে গমন। সেখান থেকে জাহাজযোগে আগস্ট মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৮৮৯—মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান।

১৮৯১—অনিদ্রারোগে আক্রান্ত। পূজার ছুটিতে দেওঘর গমন। রাজনারায়ণ বসু, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ মনীষীগণের সঙ্গলাভ। ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে বসবাস শুরু।

১৮৯২—দেশীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা। বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সূচনা।

১৮৯৩—স্বগ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্রের নিকট থেকে সালফিউরিক এসিড প্ল্যাণ্ট ক্রয়।

১৮৯৪—'Journal of the Asiatic Society of Bengal'-এ তৈল ও ঘৃতে ভেজাল সম্পর্কে রাসায়নিক প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮৯৬—'Mercurous Nitrite' আবিষ্কার। Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ প্রবন্ধ প্রকাশ। পিতা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু।

১৮৯৮—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশন—তাঁর প্রস্তুত দেশীয় ভেষজের কার্যকারিতার প্রশংসা—বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় স্থানলাভ।

১৯০১—বেঙ্গল কেমিক্যালকে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর।

১৯০১—গোখেল ও গান্ধীজির সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য।

১৯০২—আচার্যদেবের উদ্যোগে কলিকাতা টাউনহলে ভারতে গান্ধীজির প্রথম বক্তৃতাদানের আয়োজন।

১৯০২—'সরল প্রাণি-বিজ্ঞান' গ্রন্থ প্রকাশ।

—'History of Hindu Chemistry' Vol I গ্রন্থাকারে প্রকাশ। মসিয়েঁ বার্থেলো প্রমুখ মনীষীদের প্রশংসালাভ।

১৯০৩—স্বগ্রামে পিতা হরিশ্চন্দ্র রায়ের নামে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন।

১৯০৪—দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমন। ইউরোপের গবেষণাগারসমূহ পরিদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত। লণ্ডন, ডাণ্ডি, লিডস, ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম, বার্ণ, জেনেভা, জুরিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট ইত্যাদি স্থানের ল্যাবরেটরি পরিদর্শন শেষে ফ্রান্সে গমন। বড়দিনের ছুটিতে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণ কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা।

১৯০৯—'History of Hindu Chemistry—Vol II' গ্রন্থ প্রকাশ। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে উন্নীত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, মানিকলাল দে, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ছাত্রদের প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান এবং আচার্যদেবের বাসভবনে তাঁর সাথে একত্রে অবস্থানের সূত্রপাত।

১৯১০—রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯১১—The Congress of the Universities of the Empire-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তৃতীয়বার ইংলণ্ড গমন, সঙ্গে ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

—সি. আই. ই. উপাধিলাভ।

১৯১১—ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডি. এস-সি. উপাধিলাভ।

১৯১৪—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদান।

১৯১৬—প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালিত' অধ্যাপকরূপে যোগদান।

১৯১৭—ভারতীয় জাতীয় সমাজ-সংস্কার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯১৮—বাগেরহাট কলেজ স্থাপন। স্বগ্রামে 'Education Society'কে দুঃস্থ ছাত্র ও বিধবাদের সাহায্যকল্পে বেঙ্গল কেমিক্যালের নিজস্ব ১০ হাজার টাকার শেয়ার দান।

১৯১৯—'নাইট' উপাধিলাভ। রাউলাট বিলের প্রতিবাদ সভায় টাউনহলে বক্তৃতা দান।

১৯২০—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত। চতুর্থবার ইংলণ্ড গমন।

১৯২১—খুলনার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের অন্নদানে রিলিফ কমিটি স্থাপন ও আর্থিক সাহায্য দান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০,০০০ টাকা দান এবং 'নাগার্জুন' পুরস্কার স্থাপন।

(১৮৮৯ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দান।)

১৯২২—উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে আত্মনিয়োগ। কয়েক লক্ষ টাকা, প্রচুর অর্থ, ঔষধ ও খাদ্য সংগ্রহ এবং বন্যা পীড়িতদের মধ্যে বিতরণ। ডাঃ ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতা। চরকা প্রচলনে আত্মনিয়োগ। কাটিপাড়া সেবাশ্রমে চরকার উন্নতিকল্পে বেঙ্গল কেমিক্যালের এক হাজার টাকার শেয়ার দান। চরকা ও খাদি প্রচলনের জন্য খাদি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা দান।

১৯২৩—আমেদাবাদে আমেদাবাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত। 'Indian Chemical Society' স্থাপন। উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২৫—সিউড়ী মেলার উদ্বোধন; শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দান। কোকনদে কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান।

১৯২৬—পঞ্চমবার ইংলণ্ড গমন এবং বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন।

১৯৩১—উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে পুনরায় বন্যা। বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ সমিতি গঠন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে টাউনহলে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক সম্বর্ধিত। সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্বর্ধনার দিন ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯।

১৯৩২—'Life and Experiences of a Bengalee Chemist' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩২—Calcutta Review পত্রিকায় 'The Shakespearean Puzzle' নামে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ।

(১৯৩১-৩৪)—পরপর তিনবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৪—লণ্ডনের Chemical Society-এর অনারারি ফেলো নির্বাচিত।

১৯৩৬—৭৫ বছর বয়সে রসায়নের 'পালিত' অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দানের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

(১৮৯৪-১৯৩৬)—দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রসায়ন সম্পর্কিত তিন শতাধিক গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ।

১৯৩৭—প্রাণি-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য 'আশুতোষ প্রাইজ' খাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০ হাজার টাকা দান। পাটনার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৪০—বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক সমিতির সহিত মতভেদের ফলে সভাপতিত্ব ত্যাগ।

১৯৪১—সিনেটহলে অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসব।

১৯৪১—খুলনা শহরে খুলনাবাসীদের পক্ষ থেকে অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৪৩—রাড়ুলির অধিবাসীগণ কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৪৪—৮৩ বছর বয়সে ১৬ই জুন পরলোক গমন।

মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' পুস্তকের ভিত্তিতে সংকলিত।

PUBLICATIONS OF ACHARYA PRAFULLA CHANDRA RAY

A : English Books

1. India before and after the Mutiny—Edinburgh, 1885
2. Essay on India—Edinburgh, 1886
3. Chemical Research of the Presidency College—Calcutta Hare Press, 1895, 1897
4. A History of Hindu Chemistry—
   Vol. I. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd., Calcutta, 1902
   Vol. II. Bengal Chemical & Pharmaceutical Works Ltd., 1909
5. Elementary Inorganic Chemistry—Calcutta, 1909 ; 2nd Edition, 1910
6. Bengali Brain and Its Misuses—City Book Society, Calcutta, 1910
7. Essays and Discourses : G. A. Natesan & Co., Madras, 1918
8. Desi Rang—Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta, 1922
9. Makers of Modern Chemistry—Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta, 1925
10. The Discovery of Oxygen—Calcutta University, 1926
11. Radha Charan Pal—A Study, Calcutta, 1931
12. Life and Experiences of a Bengali Chemist Vol. I. (1932) & Vol. II. (1935) Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd., Calcutta

B : Bengali Books

১। সরল প্রাণিবিজ্ঞান। চেরী প্রেস, কলিকাতা, ১৯০২

২। নব্যরসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১০

৩। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১০

৪। রাসায়নিক পরিভাষা। সহ-গ্রন্থকার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৯

৫। সমাজ সংস্কার সমস্যা। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, ১৯১৯

৬। জাতিভেদ ও পাণ্ডিত্য-সমস্যা। বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টীম প্রেস, কলিকাতা, ১৯২০

৭। অন্নসমস্যা। কলিকাতা, ১৯২০, ১৯২২

৮। অধ্যয়ন ও সমস্যা। মডার্ন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯২০, ১৯৩৩

৯। জাতি গঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরে। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৯২১

১০। দেশী রঙ। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯২২

১১। বস্ত্রসমস্যা। বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টীম প্রেস, কলিকাতা, ১৯২২

১২। মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রয়। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, ১৯২৫

১৩। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, (১ম ভাগ—৩য় সংস্করণ)। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৮

১৪। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, (২য় ভাগ)। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা ১৯৩১

১৫। চা পান ও দেশের সর্বনাশ। কলিকাতা, ১৯৩২

১৬। অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৬, ১৯৪০

১৭। জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৬, ১৯৪০

১৮। খাদ্য-বিজ্ঞান। সহ-গ্রন্থকার শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৬

১৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভক্‌মা ও শিল্প ও ব্যবসায়ে কৃতিত্বলাভ। কলিকাতা, ১৯৩৭

২০। আত্মচরিত। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৭

২১। হিন্দুরসায়নী বিদ্যা। (শ্রীভবেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত), কলিকাতা, ১৯৩৭

২২। আচার্য-বাণী (৩ খণ্ডে সমাপ্ত—শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়, বি. এ. কর্তৃক সংকলিত)। বুক করপোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৫৩, ১৯৫৫

Pamphlets and Articles

১। বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতের স্থান নির্ণয়। সহ-লেখক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। প্রবাসী, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩২৯, পৃঃ ৩১৫

২। ভোগের অনাচার—প্রবাসী, কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ৪৭৫

৩। শুভমস্তু—প্রকৃতি (১ম বর্ষ), কলিকাতা, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ১-৪

৪। প্রাণীদের দংশন কাহাকে বলে? প্রকৃতি (১ম বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩১ বাং, পৃঃ ২৮৩-২৯০

৫। প্রকৃতির আহ্বান—প্রকৃতি (২য় বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ১-৩

৬। প্রার্থনা—প্রকৃতি (২য় বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ২৮৫-২৮৬

৭। খুলনা জেলা সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রেস, কলিকাতা, ১৯২৫

৮। অক্সিজেনের আবিষ্কার, প্রকৃতি (৪র্থ বর্ষ), কলিকাতা, ১৩৩৪ বাং, পৃঃ ১০৪-৮

৯। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা—ফরিদপুর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ, ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৫

১০। অন্নসমস্যা ও বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা—মাসিক বসুমতী (১ম বর্ষ), ফাল্গুন, পৃঃ ৫৪৯

১১। রসায়ন শাস্ত্র—নব্য ও প্রাচীন—মাসিক বসুমতী (২য় বর্ষ), অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৩৭

১২। কোকনদা কংগ্রেস—মাসিক বসুমতী (২য় বর্ষ, ২য় ভাগ), পৃঃ ৪৩৮

১৩। বর্তমান সমস্যা—মাসিক বসুমতী (৩য় বর্ষ), আষাঢ়, পৃঃ ৩২৫

১৪। সুরেন্দ্রনাথের তিরোধান—মাসিক বসুমতী (৪র্থ বর্ষ), ভাদ্র, পৃঃ ১

১৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—মাসিক বসুমতী, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৩৮১

১৬। কলিকাতা ও শহরতলী—মাসিক বসুমতী, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৩৬৭, ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ২৭

১৭। শ্রমের মর্যাদা—বাঙ্গালীর পরাজয়—মাসিক বসুমতী, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৫৩২

১৮। চরকা ও বস্ত্র সমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্তব্য—প্রবাসী, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ২৫৩

১৯। দেশের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুটো কথা—প্রবাসী ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ১২৭

২০। বাঙ্গালী কোথায় গেল?—প্রবাসী, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৮৩৮

২১। কোকনদা খদ্দর প্রদর্শনী—প্রবাসী, ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ৭১৫

২২। অন্নসমস্যা ও গো-পালন—প্রবাসী, ১৩৪২ বাং, পৃঃ ৬১০

২৩। ছুটির অবকাশে ছাত্রদের কর্তব্য—ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬ বাং, পৃঃ ৪৯৫

২৪। ডিগ্রির অভিশাপ—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বাং, পৃঃ ৮২৫

২৫। ভাইটামিন—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৪১ বাং, পৃঃ ৮২৩, ১

২৬। প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী (১ম ভাগ), সহ-লেখক শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—ভারতবর্ষ, ভাদ্র ও কার্তিক, ১৩৪০ বাং, পৃঃ ৩২৯, ৭৯

২৭। বাঙলার জমিদারবর্গ—ভারতবর্ষ, ১৩৪০ বাং, পৌষ হইতে, পৃঃ ২০, ৪৩২, ৮৩৩

২৮। বস্ত্র সমস্যা—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ৬৭৪

২৯। বন্যার শিক্ষা—বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৯ বাং, পৃঃ ১২৭

৩০। প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্ত্রচর্চা--বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ বাং, পৃঃ ৪২১

৩১। দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতিতে অভিভাষণ—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩১ বাং, পৃঃ ৬৬৯

৩২। বর্তমান যুগসমস্যা ও ছাত্রগণের কর্তব্য—বঙ্গবাণী, কার্তিক, ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৩৫১

৩৩। স্মৃতিতর্পণ—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৭০২

৩৪। বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা, সহ-লেখক শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ, বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩৩২ বাং, পৃঃ ৪১

৩৫। স্বদেশী—বাংলার বাণী (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা), পৃঃ ৯

৩৬। কলিকাতা ষাট বৎসর পূর্বে ও এখন—আনন্দবাজার পত্রিকা

৩৭। বাঙ্গালী কোথায় ? আনন্দবাজার পত্রিকা (পূজা সংখ্যা), ১৩৩৯ বাং, পৃঃ ৬

স্বীকৃতি : Acharya Prafulla Chandra Ray (Birth Centenary Souvenir Volume)
C. U. Calcutta, 1962

পরিবর্তনশীলতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আচার্য রায়

অতীতের মুনিঋষিদের আপ্তবাক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মপ্রয়াসকে অনমনীয় সূত্র দিয়ে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করেছে। ফলে সামাজিক জীবন-স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়েছে আর তাই হলো সমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এই সামাজিক অনুশাসনগুলোও তর্কাতীত হতে পারে না। পরিবর্তনশীল জগতে সময়ের প্রয়োজনে এগুলোও পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

["অন্বেষা", প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা থেকে]

আর. কে. বি. কে. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্মিলনী

পি-২২, সি. আই. টি. রোড, স্কীম-৭/এম, কলিকাতা-৭০০০৫৪

পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী

শ্রীসমর মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীমতী চারুলতা ঘোষ, শ্রীবারীন্দ্র মিত্র, শ্রীচন্দ্রশেখর বসু, শ্রীঅজয় মুখার্জী, ডঃ মৃণাল দাশগুপ্ত, শ্রীচিত্তরঞ্জন দে।

কার্যকরী সমিতি

সভাপতি : শ্রীকুমার মিত্র

সহ-সভাপতি : শ্রীরমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুবোধকুমার দে, শ্রীসৌমেন ঘোষ, শ্রীশম্ভু রায়চৌধুরী, ডাঃ সিদ্ধার্থ বসু, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী, শ্রীপরিমলকুমার বসু, শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীনিখিলেন্দ্র ঘোষ, শ্রীকমলাকান্ত বসু, শ্রীবিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী, শ্রীঅরুণ খাসনবিশ।

যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক : শ্রীবিভাবসু ঘোষ, শ্রীবিষ্ণুপদ ঘোষ।

সহ-সম্পাদক : সর্বশ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র, দুলাল বন্দোপাধ্যায়, অনিলকুমার দাস, কমল দে, সুধাংশু বিশ্বাস।

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীমতী অরুণা দে

সাংস্কৃতিক সম্পাদক : শ্রীঅনিল দাশ

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রীসুখেন্দু রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন ঘোষ, যামিনীকান্ত দাস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ ধর, তারকনাথ রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, গুরুপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শঙ্কর রায়চৌধুরী, হৃষীকেশ বিট, অমর মিত্র, বিভূতি রায়চৌধুরী, বিমল রক্ষিত, দিলীপ নাথ, সুবল রায়চৌধুরী, উমাপদ ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আশুতোষ মিত্র, প্রদীপ বসু, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, দুলাল চক্রবর্তী, নিমাই ঘোষ, সন্তোষকুমার বসু. সুনীল মিত্র, জ্যোতিষ মণ্ডল, সুব্রত বসু, অলোক ঘোষ, গৌরদাস বসু, উমাপদ মিত্র, অমিয় রায়চৌধুরী।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচার শক্তি, বোধ শক্তি। ………দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীর্ত্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।

—রবীন্দ্রনাথ